ডাক্তার

বিধান রায়ের জীবন-চরিত

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা জুলাই : ১৯৫৭
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
মহালয়া : ১৯৬২
প্রচ্ছদপট
শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট ও ছবি
মোহন প্রেস
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী-মুদ্রণ
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
মডার্ন বাইণ্ডার্স
কলিকাতা-৬

দাম : আট টাকা মাত্র

বাংলার যুবশক্তিকে—

"আজকের দিনে আমার প্রতিদান দেবার কিছুই নেই। আপনারা বলেছেন আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন, যাতে দেশের কাজ করতে পারেন। আমিও স্বীকার করি বেঁচে থাকার পক্ষে আমার কোন দাবি নেই। শুধু যেন দেশের কাজের জন্য বেঁচে থাকি। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' দেশের কাজেই আমি যেন বেঁচে থাকি।"

বিধানচন্দ্র রায়

একাশীতিতম জন্মদিনে বিধানচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত শেষ বাণী

চিকিৎসকদের নির্দেশ মত

[illegible]

বিধানচন্দ্র রায়

Tele : 'BIPISEESEE'

Phone : {47-3214 47-3214

West Bengal Pradesh Congress Committee

Sri Atulya Ghosh
President

'Congress Bhawan'
59-B, Chowringhee Road,
Calcutta-20

ডাঃ বিধানচন্দ্র একজন সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি। সমাজসেবা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। এইরূপ একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনীর বহুল প্রচার প্রয়োজন। শ্রীমান প্রহ্লাদ বাংলাভাষায় বাংলার এই সুসন্তানের জীবনী প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায় আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছে।

অতুল্য ঘোষ

আধেক ভাঙ্গা বাংলা মায়ের হে বীর কর্ণধার,
তোমায় নমস্কার।
সামলে নিয়ে ভগ্নতরী করছ পারাপার
অথৈ পারাবার।
জলের কুমীর বাড়ায় গলা, ডাঙ্গায় হাঁকে বাঘ
তোমার যারা যাত্রী যেন সবাই শিশু-ছাগ—
শুধুই জানে চ্যাঁচাতে আর করতে জানে রাগ,
কান্না জানে আর।
এদের দিয়ে কেমন করে টানাও তুমি দাঁড়,
ওগো কর্ণধার॥
লাখো-ফুটো বঙ্গনায়ের হে বীর কর্ণধার,
তোমায় নমস্কার।
পদে পদেই তোমায় দেখি বিপুল বাধা-ভার,
নিত্য হাহাকার।
হালটি তুমি ছেড়ো নাকো যতই আসুক ঝড়,
ভাঙ্গা তরীর চেয়ে হাঙর-কুমীর ভয়ঙ্কর.;
ওঠে উঠুক যতই কেন ব্যাকুল আর্তস্বর—
করবে তুমিই পার।
তুমি গেলে দিকে দিকে বাধবে মহামার
ওগো কর্ণধার॥
অবসাদের, নির্ভরসার নিবিড় অন্ধকার
ওগো কর্ণধার
সাতটি বছর কাটল ক্রমে, খুলছে উপর দ্বার—
আভাস মেলে তার।
হচ্ছে মধুকরের ডিঙ্গা ভগ্নতরী খান,
আশার ভাষায় উঠছে ভ'রে অভাগাদের প্রাণ,
তুমিই তাদের প্রতিষ্ঠা দাও, করলে যাদের ত্রাণ
করছ যাদের পার—
শতায়ু হও এই আশিসই মাগছি বিধাতার
জানিয়ে নমস্কার।

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

যেই পথে যাত্রা তব সেই পথ দুর্গম বন্ধুর
কুসুমে আস্তীর্ণ নয়, নয় তাহা ছায়ায় মেদুর।
যে আসনে বসিয়াছ নয় তাহা গজদন্তাসন,
সিংহদন্তাসন তুমি সাধ ক'রে করেছ বরণ।
খণ্ডিত বিক্ষত দুঃস্থ নিঃস্ব দেশে দায়িত্বের ভার
স্বহস্তে নিয়েছ তুমি, অসামান্য বীরত্ব তোমার।
মান, যশ, ধন, স্বস্তি কিছুরই তো ছিল না অভাব
স্বেচ্ছায় গোলাম হ'লে এ জাতির, হইয়া নবাব।

অনুর্বর উষরতা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, রোগ, শোক,
লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা কর্মহীন নিরাশ্রয় লোক,
তুষ্টিহীন পুষ্টিহীন জনারণ্যে জ্বলে দাবানল
বিদ্রোহী বিরোধিকণ্ঠ ছিদ্রান্বেষী করে কোলাহল,
প্রতিবেশী প্রতিযোগী, জনতার নিত্য নব দাবি—
হে পুরুষসিংহ, তাই অবাক হইয়া শুধু ভাবি,
শত বাধা বিঘ্ন সহ একা তুমি যুঝিছ কেমনে,
যৌবনের তেজ তুমি কোথা পেলে সায়াহ্ন-জীবনে?
কি অসীম ধৈর্য তব কী শক্তির জীবন্ত ভাণ্ডার,
খড়্গিচর্মবর্মাবৃত মহাশূর তোমা নমস্কার।
জীবনচরিতে তব র'বে দীপ্ত উৎসর্গের কথা
স্বাধীন ভারতে তুমি বিসর্জিলে নিজ স্বাধীনতা।
বাঙ্গালীর চির ধর্ম স্বজাতিরে ছোট ক'রে দেখা,
যথার্থ স্বরূপ তার আঁকে চিত্রে কবি শুধু একা।
লোকে তোমা দেখে রাষ্ট্রচালনার নানাবিধ কাজে,
আমি দেখিতেছি তোমা তব জ্যোতির্বলয়ের মাঝে
সমগ্র জীবন তব প্রতিভাত হয় নেত্রে মম,
দূর হতে দেখি তাহা নীলকান্ত-মহীধর সম।

যা দেখেছি লোকভয়ে করিব না তাহারে গোপন
শুনাইবে বহুকর্ণে হয়ত তা স্তুতির মতন।

প্রাণাচার্য, ব্যক্তি হতে বৃত্তি তব জাতিতে বিতত
আর্ত দেশ নিরাময় করিবার ধরিয়াছ ব্রত।
বহু দূরে রহ তুমি, আমি তব পরিচিত নহি।
কাণ্ডারী, তরীতে তব আমি দীন নগণ্য আরোহী।
আমি এ বঙ্গের কবি, এ বঙ্গেরে আমি ভালবাসি।
তার বরপুত্র তুমি তাই আমি তোমার উপাসী।

—শ্রীকালিদাস রায়

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক

গ্রন্থকারের নিবেদন

"শিক্ষাব্রতী" সম্পাদক এবং কলিকাতার বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীমান্ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক একদিন ডাঃ বিধান রায়ের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবিত কার্যের ভার আমি নিলাম। সাগরোপম বিরাট চরিত, ইহার সমস্ত মহিমা কেমন করিয়া সুষ্ঠুরূপে ফুটাইয়া তুলিব, এই চিন্তা হইল। বহু বান্ধব বহু ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, অনেকে বিধানচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াও পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে এত বড় কার্যভার সুসম্পন্ন করা আমার মত ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইত না। তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বিশেষ করিয়া শ্রীমান্ আলোকনাথ চক্রবর্তী আমার গ্রন্থের প্রুফ আদ্যোপান্ত দেখিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আজ ডাঃ রায়ের শুভদিন যট্‌সপ্ততিতম জন্মদিন। এই শুভদিনে তাঁহার কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহার হস্তে এই পুস্তকখানি অর্পণ করিতে পারিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি। ইতি

১লা জুলাই, ১৯৫৭ — **শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়**

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত' গ্রন্থখানি বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদর পাইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু পরিবর্ধন করা হইয়াছে এবং একটা নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করা হইল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জয়তিলক (রানাজী) আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাকে সস্নেহে আশীর্বাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে ভুল-ক্রমে লেখা হইয়াছে যে, দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ গান্ধীজীকে কলিকাতায় জানানো হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ওই শোকসংবাদ জানানো হয় খুলনায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে তিনি ওই মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়াছিলেন বরিশাল হইতে খুলনা শহরে পৌছিয়াই। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ভুলক্রমে 'Iron man' স্থলে man of iron মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বিধানচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ হইয়াছে তাঁহার একাশীতিতম জন্মদিনে। আমাদের শোকাতুর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশের ভাষা নাই।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

মহালয়া
১১ই আশ্বিন, ১৩৬৯
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্য আজ আমাদের উৎসাহ দেয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, জীবনী-সাহিত্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের আজ বিশেষ অভাব। সেই অভাববোধ হইতেই জীবনচরিত ও আত্মচরিত প্রকাশ করা আমার প্রকাশনা-বৃত্তির একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া আমি গ্রহণ করি। আমি প্রকাশনা-বৃত্তি গ্রহণের প্রথমেই বাংলা ভাষায় 'গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত' প্রকাশ করিয়া মহাত্মাজীকে উপহার দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার প্রকাশিত 'নোয়াখালিতে গান্ধীজী' পুস্তকে তিনি বাংলা ভাষায় 'আশীর্বাদ' মো. ক. গান্ধী লিখিয়া দিয়া আমাকে এবং আমার প্রকাশনাকে ধন্য করিয়াছেন।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠান হইতে আমরা মনীষী রোমাঁ রোলাঁর 'মহাত্মা গান্ধী', 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন', 'বিবেকানন্দের জীবন', ঋষি দাসের 'বার্নার্ড শ', 'শেকস্‌পীয়র, 'গান্ধী-চরিত', 'লোকমান্য তিলক', 'আবুল কালাম আজাদ', 'গিরিশচন্দ্র', 'নজরুল', সুকুমার রায়ের 'সীমান্ত গান্ধী', প্রভাত বসুর 'জওহরলাল' ধীরেন্দ্রলাল ধরের 'আমাদের গান্ধীজী', 'বন্দী-জীবন' সুশীল রায়ের 'মনীষী জীবন-কথা' ১ম ও ২য় খণ্ড, অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাসের 'ভক্ত কবীর', মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থের 'মহামতি বিদুর', এবং 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিত' ও 'ঋষি রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনচরিত ও আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া পাঠকদের হাতে দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছি।

জীবনী-পাঠে আমরা যেমন মানুষটিকে চিনিতে পারি, তদপেক্ষা বেশী ভালভাবে জানিতে পারি সেই যুগের এবং সেই সময়ের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও মানুষকে। জীবনই ইতিহাস সৃষ্টি করে। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ব-রচিত জীবনচরিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত, রামতনু লাহিড়ীর জীবনী, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্রের জীবনী পাঠে যেমন মানুষকে জানিতে পারি সেরূপ জানিতে পারি তখনকার সামাজিক অবস্থাকে।

আমি নিজে বিধানচন্দ্রের মতো পুরুষসিংহের নিকট খুব কমই গিয়াছি। একবার আর্তত্রাণের কাজে ইং ১৯৪৪ সালে গিয়াছিলাম। পরে যাই ইং ১৯৪৭ সালে আমার সাহিত্যিক বন্ধু ধীরেন বাবুকে সঙ্গে লইয়া 'আমাদের

গান্ধীজী' পুস্তক দিতে। পুস্তকখানি পাইয়া তিনি গান্ধীজীর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব দেখাইলেন, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ইং ১৯৫০ সালে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার লাউদহ গ্রামে তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করেন। সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া ওঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটে।

ইং ১৯৫২ সালে কোন একটি বিশেষ ব্যাপারে তাঁহাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিঠি দিই। সেই চিঠির বিষয় আলোচনার জন্য কয়েকদিন পরেই ইং ১৯৫২ সালের ২৯শে জুন রবিবার দ্বিপ্রহরে বিধানচন্দ্র আমাকে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠান।

ঐ দিনে পাকিস্তান হইতে আগত ইঞ্জিনীয়ার বলিয়া পরিচয় দিয়া একটি যুবক বলে, সে পূর্বদিন শিয়ালদহ স্টেশনে সারারাত্রি না খাইয়া কাটাইয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া ডাঃ রায় তাহাকে নিজ পকেট হইতে পঁচিশ টাকা সাহায্য করেন। ঐ যুবক একটি চাকুরির জন্য দরখাস্তে সবিশেষ লিখিয়া আবেদন জানাইলে তিনি তাহার চাকুরির ব্যবস্থাও করিয়া দেন। ডাক্তার রায় যে কত দয়ালু সেদিন তাহা জানিলাম।

দুইদিন পরে ১লা জুলাই ডাঃ রায়ের জন্মদিন। একটি দৈনিকের তরফ হইতেই একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নিজের জীবনী সম্পর্কে তিনি কিছু বলিতে চান না, জানিতে পারিলাম। আমি অনেকগুলি প্রশ্ন করিতে এই কর্মব্যস্ত মানুষ এমন সস্নেহে আমাকে উত্তর দিলেন যে শ্রদ্ধায় আমার মাথা অবনত হইল। আর আমাকে বলিলেন, "তুমি তো রবীন্দ্রভক্ত, শিক্ষাব্রতীর 'রবীন্দ্র সংখ্যা' প্রকাশ কর। আচ্ছা দেখ, তুমি রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতা বেছে দিতে পার যাতে বোঝায়, আমার জীবনও ফুরিয়ে আসছে আর কাজও ফুরিয়ে আসছে।" শুনিলাম কিছুদিন পরে উনি চক্ষু-চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাইতেছেন। সেইসময়ে দমদম বিমানঘাঁটিতে বহু গণ্যমান্য শুভানুধ্যায়ী ফুলের তোড়া ইত্যাদি লইয়া শুভকামনা ও বিদায় দিতে গিয়াছিলেন, আর আমি গিয়াছিলাম ওঁর আদিষ্ট কবিগুরুর কয়েকটি কবিতা লইয়া। কর্মনিষ্ঠ মানুষটি যখন প্লেনে উঠিতে যাইতেছেন সেই সময়ে হাত বাড়াইয়া আমার নিকট হইতে কবিগুরুর সেই কবিতাগুলি পকেটে লইয়া প্লেনে উঠিলেন। তাহার সঙ্গে আমার একটি ছোট চিঠিও ছিল। আমার সেই ক্ষুদ্র চিঠির উত্তর পাইলাম—"প্রিয় প্রহ্লাদ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" আমার মনপ্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

আর একদিনের ঘটনা বলি, একটি গ্রামের মহিলাকে চিকিৎসার জন্য দেখিতে লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে পূর্বে ইং ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময়ে দেখাইয়াছিলাম। প্রায় ১২ বৎসর পরে পুনরায় দেখাইতে যাওয়ায় তিনি মহিলাটির নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং কোথায় বাড়ী তাহাও বলিলেন। শুনিয়া আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। ডাঃ রায়ের নিকট কত রোগীই না প্রতিদিন আসে। অথচ এই নগণ্য রোগীর নাম ইত্যাদি কি করিয়া মনে রাখিলেন। এই বয়সেও কিরূপ আশ্চর্য স্মরণশক্তি!

এইভাবে দিনে দিনে তাঁহার এবং তাঁহার কর্মশক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে।

আমার ইচ্ছা হইল ডাঃ রায়ের মত বহুগুণশালী বিরাট পুরুষের জীবনী প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে পাঠের সুযোগ দিতে।

সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের ডাঃ রায় সম্পর্কে প্রবন্ধ সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। নগেনদা আমার পূর্বপরিচিত। আমরা ওঁর লিখিত 'ফরাসী বীরাঙ্গনা'র প্রকাশক। ওঁকে ডাঃ বিধানচন্দ্রের জীবনী লিখিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই। নগেনদা আমার অনুরোধে এই বয়সে প্রায় এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই জীবনচরিত লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আজ শ্রদ্ধেয় বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে এই পুস্তক শ্রীভগবানের অনুগ্রহে প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ সমস্যাসঙ্কুল প্রদেশ। প্রার্থনা করি, এই প্রদেশের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান ও উন্নতির জন্য পরমেশ্বর বিধানচন্দ্রকে দীর্ঘজীবী করুন!

১লা জুলাই, ১৯৫৭। **শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক**

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আজ আর 'কর্মযোগী বিধানচন্দ্র' ইহজগতে নাই। তাঁহার জীবন, কর্ম ও বাণী আমাদের পাথেয়-স্বরূপ রেখে গেছেন। আমরা যেন তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলতে পারি। তাঁহার অমর আত্মা শান্তিলাভ করুন এই প্রার্থনা।

মহালয়া, ১৩৬৯। শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

প্রথম অধ্যায়

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিবরণ

রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির অবদান ; হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মাতাপিতা অঘোরকামিনী এবং প্রকাশচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম। তরুণ বয়সে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। পতি-পত্নী উভয়ে একান্ত নিষ্ঠার সহিত মৃত্যু পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের পদানুবর্তন করিয়া ধর্মসাধনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তানেরাও সেই ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্মজীবনে পুণ্যাত্মা মাতাপিতার অনুসৃত পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। বিধানচন্দ্রের জীবনের উপর মাতাপিতার প্রভাব যথেষ্ট। সুতরাং বিধানচন্দ্রকে জানিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের বিবরণ অবগত হওয়া আবশ্যক।

রামমোহন রায়ের অবদান

ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্ব আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতকের ষষ্ঠ দশকে। কোন দেশ কখনও পরবশ্যতা স্বীকার করিয়া দাস-জাতিতে পরিণত হইতে পারে না, যদি সে দেশের অধিবাসীরা নানা দিক দিয়া অধঃপতিত হইয়া না পড়ে। এক জাতির অধঃপতনের সুযোগে অপর জাতির অভ্যুত্থান সহজেই ঘটিয়া থাকে। তৎকালে ভারতবাসী গৃহ-বিবাদের ফলে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, জাতীয় সংহতির অস্তিত্ব ছিল না, সমগ্র জাতি আত্মপরায়ণ হওয়ার দরুন জাতীয় স্বার্থবোধ লোপ পায় এবং ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ অতীতের মহিমময় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। দেশ ও জাতির সেই চরম দুর্গতির দিনে অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকে ইংরেজ-শাসনের প্রথম ভাগে আবির্ভাব হয় রাজা রামমোহন রায়ের। তখন সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল হিন্দু জাতি। বিরাট হিন্দু সমাজে সতী-দাহ, জাতি-ভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্য-বিবাহ, তথা-কথিত নিম্ন বর্ণের প্রতি অন্যায় আচরণ, নারী জাতির ন্যায্য অধিকার হরণ এবং ওই প্রকারের আরও নানা সামাজিক অবিচার ও কুসংস্কারের আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ওই সমুদয় অপসারণের পথ সুগম করেন। কিন্তু এইজন্য তাঁহাকে প্রবল ও বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। সতী-দাহের মতো একটা বর্বরোচিত নৃশংস প্রথার কলঙ্ক ও কুফল হইতে তিনি মুক্ত করিলেন হিন্দুসমাজকে। তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতী-দাহ নিবারক আইন পাস হইল। ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে এক শ্রেণীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু ইহার মাসাধিক কাল পরেই (১৮৩০ খ্রীঃ ১৭ই জানুআরি) পূর্বোক্ত আইনের প্রতিবাদে 'ধর্মসভা' নামে একটা সমিতি স্থাপন করেন। আইনপাসের পূর্ব বৎসরে (১৮২৮ খ্রীঃ ২০শে আগস্ট—১৭৫০ শক, ৬ই ভাদ্র) রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর বিরোধী প্রতিষ্ঠান রূপে দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল ওই 'ধর্মসভা'। রামমোহন রায়কে যে কিরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা পূর্বোল্লিখিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াও অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। সেকালের হিন্দুসমাজের অধঃপতিত অবস্থার একটা বাস্তব চিত্র উহাতে পাওয়া যাইবে।

একেশ্বরবাদী এবং সমাজ-সংস্কারার্থী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে এক নবযুগের প্রবর্তন হইল। অদূর ভবিষ্যতে রামমোহন রায় যুগ-প্রবর্তক বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া হিন্দুধর্মের নবরূপ প্রকাশ পাইল। তাঁহার আয়ুষ্কাল (১৭৭৪ খ্রী:—১৮৩৩ খ্রীঃ) ছিল মাত্র ৫৯ বৎসর। জীবদ্দশায়ই তিনি হিন্দুজাতির সমাজ-জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গোড়াপত্তন করিয়া যান।

দেবেন্দ্রনাথের অবদান

মহামানব রামমোহনের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে উত্তর কালে যাঁহারা সশ্রদ্ধ-সমাদরে বরণ করিয়া নিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণে আসিবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। তিনি রামমোহনের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং রামমোহনের যুগোপযোগী আদর্শ ও ভাবধারাকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কলিকাতার অভিজাত বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও দেবেন্দ্র-নাথ ভোগের পথ ছাড়িয়া ত্যাগের পথ ধরিলেন। দ্বারকানাথ আভিজাত্যের তাগিদে যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন, তেমনই দেশ, ধর্ম, জাতি, সমাজ এবং অন্যান্য কল্যাণ-কর্মেও দান করিতেন মুক্ত হস্তে। বিলাত-প্রবাস-

কালে তাঁহার মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা। কলিকাতার লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান "ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি"কে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই দানশীলতায় তৎকালে তাঁহার প্রশংসা দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দ্বারকানাথ তাঁহার উইলে দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করার ব্যবস্থা করিয়া যান।

সে-কালে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবহমান তরঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবন প্লাবিত হইতেছিল। ইহাতে সুফলের সঙ্গে কুফলও কম হয় নাই। ভদ্র সমাজে মদ্যপান, পতিতা নারীর নৃত্য-গীতাদি দূষণীয় আমোদ-প্রমোদ সামাজিক রীতির মতোই প্রচলিত হইয়াছিল। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে পিতাপুত্র একসঙ্গে বসিয়া মদ্যপান করা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজাত কিংবা ভদ্র পরিবারের সন্তানদের চরিত্র যৌবনেই কলুষিত হইয়া পড়িত। দেবেন্দ্রনাথকেও কলুষের আবর্তে পড়িতে হইয়াছিল। তৎসম্পর্কে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী"র পরিশিষ্ট (সতীশচন্দ্র কর্তৃক লিখিত) হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে লিখিয়াছেন, 'এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম।' ইহা কোন্ সময়? এবং 'এত দিন' বলিতে কত দিন বুঝিতে হইবে?

"আমাদের ধারণা, ১৮৩৪ সালের শেষ ভাগ হইতে ১৮৩৫ সালে পিতামহীর মৃত্যু পর্য্যন্ত, ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথের বিলাসের আমোদে মগ্ন থাকিবার সম্ভাবনা।

"এই অবস্থায় বিলাসের আবর্তে পতিত হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথকে দোষী করা যায় না, বরং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এমন অবস্থা হইতেও ঈশ্বর তাঁহাকে এত শীঘ্র ধর্মের দিকে টানিয়া লইলেন।"

এই সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন :—

"...আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই, এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন, ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন; এবং তাহার পরে সেই আনন্দময়, স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নতুন

জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।”

মহর্ষি পাইয়াছিলেন দীর্ঘ জীবন (১৮১৭ খ্রীঃ—১৯০৫ খ্রীঃ); সেই জীবনকে তিনি সার্থক করিয়াছিলেন ধর্মসাধনায়, একেশ্বরবাদ প্রচারে, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবায় এবং জাতি ও সমাজের নানাবিধ কল্যাণ-কর্মের অনুষ্ঠানে। তাঁহারই সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ—যাঁহার লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষার অবদান নিখিল বিশ্বে ভারতের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে এবং জাতীয় অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হইয়াছে। পিতার যত্ন ও শিক্ষা-গুণে পুত্রের প্রতিভা ও মনীষা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে শতদল পদ্মের মতো রূপে রসে ও গন্ধে। রামমোহন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল, বিধিবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া যাইতে পারেন নাই। সেই অসম্পূর্ণ দুঃসাধ্য কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম সমাজের পুনর্গঠনের সঙ্গে তিনি কালোপযোগী সংস্কারও করিয়াছিলেন। এই সমুদয় কারণে ওই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই।

মহর্ষি ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র পক্ষ হইতে একখানি পত্রিকা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে (১৭৬৫ শক, ভাদ্র) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু নিজে সমস্ত লেখা দেখিয়া দিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজে পত্রিকাখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিল। এই সম্বন্ধে মহর্ষি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

“…আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।

"প্রত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যাদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম।...

"ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।..."

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতকটা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"...তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে, যে মানুষ যে কার্যের উপযোগী, যেন তাঁহার হস্তে সেই কার্যই আসিল। তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গ-সাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্রসকলের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।..."

অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বারো বৎসর কাল কৃতিত্ব ও সুনামের সহিত ওই পত্রিকার সম্পাদকতা করেন।

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উত্থানের যুগে বাংলাদেশে ফিরিঙ্গী মিশনারীদের কর্মতৎপরতাও বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য যে সকল পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করিতেন, তাহা ধর্মের আদর্শ ও নীতির বিরোধী তো ছিলই, বেআইনীও ছিল অনেক স্থলে। কিন্তু রাজার জাতি বলিয়া শাসকগণ, এমন কি আদালতের বিচারকগণ পর্যন্ত, তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন। এই কারণে বিদেশী মিশনারীরা দণ্ডিত হইতেন না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হইল যে, সকলে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিলে মিশনারীদের মতো অবৈতনিক বিদ্যালয় হিন্দু বালকদিগের জন্য সহজেই স্থাপিত হইতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার হিন্দুদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া হিন্দুবালকগণের

বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলিকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে,—পাদরিদের বিদ্যালয়ে হিন্দু বালকদের পড়িতে দেওয়া উচিত নহে এবং হিন্দুদের অগৌণে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সময় আগত। তাঁহার আহ্বানে সকলেই সাড়া দিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুপ্রধানগণও দেবেন্দ্রনাথের মহান চেষ্টাকে সফল করার জন্য তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে মহানগরীর বিশিষ্ট ও মান্যগণ্য হিন্দুদিগের একটি সভায় অধিবেশন হইল। তাহাতে প্রায় এক সহস্র হিন্দু উপস্থিত হইলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী হইতে শুনাইতেছি :—

"স্থির হইল যে, পাদরিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া, তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল।

"এই সভা হইতে 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

রাজনারায়ণ বসুর অবদান

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আশ্রয় করিয়া যে সকল ব্রাহ্ম প্রথম জীবনেই নিজ নিজ অধ্যাত্ম জীবন গড়িয়াছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের উন্নয়নে মহর্ষির সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু এবং কেশবচন্দ্র

সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র রাজনারায়ণের বয়ঃকনিষ্ঠ। দুইজনেই উনিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। উভয়েই মহর্ষির প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সহাধ্যায়ীরা আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রন্থ সংকলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোকসকল থাকিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সংকলনের অনেক দিন পূর্বে লিখি। দেবেন-বাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থা-দর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তর্জমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। শ্যামাচরণ বাবু যেদিন সমাজে বক্তৃতা করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন হইত।···

"ব্রাহ্মসমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্গাচরণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাঁহাদের কার্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস, এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। ঐ কার্য ছয় মাস করিলে তৎপর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্যে নিযুক্ত হই।···উপনিষদের অনুবাদকের কার্য করিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। সন্ধ্যায় উপনিষদ্ তর্জমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইতাম। দেবেন্দ্রবাবু আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। সে সকল বন্ধুত্বের কার্য কখনই ভুলিবার নয়।

রাজনারায়ণবাবু পরে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কার্যে নিযুক্ত হন। মেদিনীপুর জেলা-স্কুলে তিনি পনর বৎসরের কিছু অধিক কাল প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তৎপূর্বে তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে

কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনের গতি ছিল বহুমুখী। ব্রাহ্ম-ধর্ম-সাধনা ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা তাঁহার যে প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের জন্যও তিনি কম কাজ করেন নাই। গোঁড়া হিন্দুদিগের মধ্যে সেকালে এমন হিন্দুও ছিলেন—যাঁহারা ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। উদার ও প্রগতিশীল হিন্দুগণ সেই ভ্রান্ত মতের সমর্থন করিতেন না। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মগণও ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। রাজনারায়ণ তৎকালের বাংলা দেশের অন্যতম আদর্শ শিক্ষাব্রতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। মেদিনীপুরে তিনি যে সকল কার্য করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জাতীয় প্রগতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। দুরারোগ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রধান শিক্ষকের পদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমি পনেরো বৎসর কয় মাস ঐ কর্ম করি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের যে সকল কার্য করি তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :—(১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতিসাধন। (২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতিসাধন। (৩) জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা সংস্থাপন। (৪) সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন। (৫) বক্তৃতা, ধর্ম-তত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্ম সাধনা। (৬) **Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj** নামক লেকচর প্রণয়ন।"

রাজনারায়ণ তাঁহার সম্পাদিত কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন নাই। মেদিনীপুরের জনসাধারণের পক্ষে অবসর গ্রহণের কিছু কাল পূর্বে তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিক বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান নিবারণী সভাও আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন। সে সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।”

পূর্বোক্ত অভিনন্দন-পত্রে রাজনারায়ণের অনুষ্ঠিত আরও সৎকর্মাবলীর বিবরণ আছে। তাঁহার স্থাপিত ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা, বঙ্গীয় যুবসমাজের মধ্যে স্বাজাতিকতার ভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই সভার দেশপ্রেমিক সদস্যগণ ‘good night’ না বলিয়া ‘সু-রজনী’ বলিতেন। পয়লা জানুআরি দিবসে পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা না জানাইয়া পয়লা বৈশাখ জানাইতেন; ইংরাজী বাংলা না মিশাইয়া কেবল বাংলাতে কথাবার্তা বলিতেন। স্বদেশীয় সঙ্গীত, ব্যায়াম, খেলাধুলা, বাংলা ভাষার অনুশীলন, সামাজিক কুপ্রথা পরিহার ও সুপ্রথাগুলির রক্ষা, বিদেশীয় আচার ও বেশ-ভূষা বর্জন ইত্যাদির প্রতি সভা দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বনামখ্যাত দেশভক্ত ও সমাজ-সেবক নবগোপাল মিত্র যে হিন্দু-মেলা (চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলা নামেও পরিচিত) স্থাপন করিয়া স্বদেশীয় নর-নারীকে স্বাজাতিকতার ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, উহার প্রেরণা আসিয়াছিল ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার’ বিবরণী ও অনুষ্ঠান-পত্র হইতে। ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। বাঙালীর জাতীয় জীবন গঠনে রাজনারায়ণ ও নবগোপালের অবদান স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ভারতের অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পুনরায় একটা আদর্শ জাতি-রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য রাজনারায়ণ যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার ‘বৃদ্ধ হিন্দু আশা’ নামক পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। তিনি কেবল চিন্তানায়ক, সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন না, একজন উচ্চশ্রেণীর সংগঠন-কর্মীও ছিলেন। তাঁহার সংগঠনী প্রতিভার নিদর্শন রহিয়াছে মেদিনীপুরে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর মধ্যে। ওই সমুদয় কার্য জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক ছিল। ইংরাজী বাংলা উভয় ভাষায়ই তিনি লিখিতে ও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যা এগারখানা; তন্মধ্যে ‘Old Man’s Hope’ ব্যতীত অপরগুলি ধর্ম সম্বন্ধে লেখা। বাংলা ভাষায় বিবিধ বিষয়ে রচনা ও ভাষণের দ্বারা তিনি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা তেরখানা। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় হইল :—‘রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত’, ‘সেকাল আর একাল’, ‘বৃদ্ধ হিন্দুর আশা’, ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’, ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা’।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। সেই সমাজের মুখপত্র তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত লেখক। মহর্ষির তিরোভাবের পরে রাজনারায়ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারত-বিশ্রুত বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র এবং 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক নির্বাসিত নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার অন্যতম জামাতা।

ধর্ম, দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় রাজনারায়ণের অবদান স্মরণীয় হইয়া আছে। জীবিতকালেই (১৮২৬ খ্রীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর—১৯০০ খ্রীঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর) তিনি তাঁহার কর্মাবদানের ফল—জাতীয় অগ্রগতি দেখিয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র সেনের অবদান

কলিকাতা মহানগরীর কলুটোলা অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী বৈদ্যবংশের শিক্ষিত প্রগতিশীল যুবক কেশবচন্দ্র উনিশ বৎসর বয়সে (১৮৫৭ খ্রীঃ) আদি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া উহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহার ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের গোড়াপত্তন হইল এইখানেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন, উদার মনোভাব, সুদূরপ্রসারী মননশীলতা, গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি এবং ব্রাহ্মধর্মে অবিচলিত বিশ্বাস কেশবচিত্তে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। কেশব ছিলেন মহর্ষির অন্যতম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী। নবীন সাধক, চরিত্রবান ও প্রতিভা-শালী যুবক কেশবচন্দ্রের মধ্যে মহর্ষি দেখিতে পাইলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ লক্ষণ। অল্পকাল মধ্যেই নবদীক্ষিত তরুণ মহর্ষির স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এক বৎসর পরেই তাঁহার কলেজের শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। তৎকালে তিনি হিন্দু-কলেজে পড়িতেন। প্রায় দুই বৎসর কাল কেশব কলেজের পাঠাগারে বসিয়া দর্শন, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ করেন। তাঁহার ধর্মানুরাগ ও ভক্তি-বিশ্বাস মহর্ষিকে এমনই মুগ্ধ করিল যে, তিনি তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়া বসাইয়া দিলেন আচার্যের আসনে। তখন কেশবচন্দ্রের বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। তৎপূর্বে যাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের আসনে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ ছিল ছয় বৎসরের জন্য।

তিনি অধিকতর সংস্কার সাধন এবং দ্রুত অগ্রগমনের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে মহর্ষির সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের মতভেদ হয়। তিনি সেই সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তিভাজন আচার্যের সহিত স্নেহাস্পদ শিষ্যের মতানৈক্য ঘটিলেও মতান্তরে কিছুমাত্র মনান্তর ঘটে নাই; পারস্পরিক স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত সমাজের মধ্য দিয়া কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল দেশদেশান্তরে। বিদ্যার্থী জীবনের সমাপ্তির পরে তাঁহার কর্মবহুল জীবনের স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সকল সমাজ-সংস্কারমূলক ও জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে জাতীয় অগ্রগতির পথে পূর্বাবধি সৃষ্ট বিঘ্ন-বিপদ অনেকাংশে অপসারিত হইয়া যায়। তাঁহার নিঃস্বার্থ নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টার ফলে নবভারত ও নূতন জাতিগঠনের যে সমস্ত উপাদান সঞ্চিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি আশানুরূপ কাজে লাগাইয়া যাইতে পারেন নাই; কেন না, তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর—১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুআরি পর্যন্ত। কিন্তু জাতি গঠনের পুণ্যকর্মে নিরত উত্তরসাধকগণ সেই সকল উপকরণের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে নব্যভারত ও নবজাতি গড়িয়া তোলার সুকঠিন কার্য যে ত্বরান্বিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অধঃপতিত ভারতে আদর্শ মানুষ গড়িতে হইলে প্রথমেই যে সমাজ-দেহকে কুসংস্কার-ব্যাধি হইতে মুক্ত করা আবশ্যক, তাহা কেশবচন্দ্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণে তিনি বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদসাধন ইত্যাদি কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহার সফলতা কম হয় নাই। পুরুষ জাতির মতো নারী জাতিকে শিক্ষাদানের সফল কর্মপ্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে জাতিগঠনের কার্য যে প্রচুর গতিবেগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কেশবচন্দ্রের বহুমুখী লোকহিতকর কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) অল্প-বয়স্কের জন্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন; (২) কলুটোলায় সান্ধ্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; বিধবা বিবাহ নাটক রচনা ও অভিনয়; (৪) পাঞ্জাব দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠন ও সাহায্য দান; (৫) বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া নিবারণ কেন্দ্র স্থাপন; (৬) কলুটোলায় শিশু

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ; (৭) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ; (৮) প্রথম অসবর্ণ বিবাহ এবং প্রথম অসবর্ণ বিধবা বিবাহ সম্পাদন ; (৯) দরিদ্র ও অসহায়দিগের জন্য শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ; (১০) প্রথম মদ্যপান নিবারণ অভিযান ; (১১) দাতব্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; (১২) গণ-শিক্ষার জন্য এক পয়সা মূল্যের সরল ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ ; (১৩) শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন।

এই সকল কার্যাবলী সম্পন্ন হইয়াছিল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মাত্র উনিশ বৎসরের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা এবং প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া যিনি এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মশক্তি ও সংগঠনী প্রতিভা যে অসাধারণ,—ইহা সহজেই বুঝা যায়। ওই সমুদয় কার্যের ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্রের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, স্বদেশানুরাগ এবং স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় মিলিবে। তিনি ধর্মপ্রচারকরূপে যখন গ্রেট ব্রিটেনে যান, তখন তাঁহার বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর। তথায় আট মাস থাকিয়া ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের প্রধান প্রধান চৌদ্দটি নগরে তিনি প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করিয়া শিক্ষিত সমাজ ও বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁহার বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইত। কেশবচন্দ্রের প্রচারের ফলে গ্রেট বৃটেনের মতো প্রগতিশীল স্বাধীন দেশেও ভারতের মর্যাদা স্বীকৃতি পাইল। জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে তাহা কম সহায়ক হয় নাই। সেণ্ট্ জেমস্ হলে অন্যূন পাঁচ সহস্র ইংরাজ নরনারীর সমাবেশে তিনি সুরাপান নিবারণ বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বৃটিশ রাজের সুরা ব্যবসায়ের উপর তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছিল। 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য' বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি ভারত-প্রবাসী নীচ শ্রেণীর ইংরাজদের নিরীহ ভারতবাসীর উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করেন, এবং উহারা যে সুসভ্য ইংরাজজাতির কলঙ্ক, সে মন্তব্য তিনি নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া বোম্বাই নগরে অবতরণ করিলে তথাকার অধিবাসীরা কেশবচন্দ্রকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই মহা-নগরীতে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-সভায় তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিতার সহিত ঘোষণা করেন :—

"ইংলণ্ড যদি ভারতীয়গণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ম্যানচেস্টার এবং ইংরাজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ভারতে শাসন করিবে বলিয়া স্থির করে, তাহা হইলে আমি বলি—এই মুহূর্তেই বৃটিশ-শাসন বিনাশ করিয়া দিন।"

তৎকালীন কোন রাজনীতিক নেতাও ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জনসভায় ওইরূপ স্পষ্ট, তেজোদীপ্ত ও নির্ভীক উক্তি করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। ওই ঘোষণার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে—স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত কেশবের মর্মবেদনা এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহাত্মক মনোভাব। তাঁহার বক্তৃতাবলীতে অনুরূপ উক্তি আরও কত রহিয়াছে। বিলাতে প্রচার-কালে তিনি এক সভায় ইংরাজ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"আমি আপনাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, আমার স্বদেশবাসীগণকে বিজাতীয়করণের দুরভিসন্ধি যেন আপনারা পোষণ না করেন।"

স্বদেশ ও স্বজাতির হিতচিন্তায় কেশবচন্দ্র কিভাবে মগ্ন থাকিতেন, উহার নিদর্শন তাঁহার রচনামালায়ও মিলিবে। নব্য ভারত ও নব্য জাতি গঠন করিতে হইলে সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে যে একতার প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। বাঞ্ছিত ঐক্য সাধনের জন্য কি পন্থা অনুসরণ করা সমীচীন, সেই চিন্তা তাঁহার মনে ও মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছিল। কেশবচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' সংবাদপত্রের ১২৮০ সালের (১৮৭৪ খ্রীঃ মার্চ) ৫ই চৈত্রের সংখ্যায় 'ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা লাভের উপায় কি?' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেন। তাহা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"যদি ভাষা এক না হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয়, তবে তাহার উপায় কি? সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হিন্দী ভাষা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দী ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে একতা অনায়াসে শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে।"

আজ স্বাধীন ভারতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতালাভের প্রায় তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে দূরদর্শী কেশবচন্দ্র হিন্দীকে ভারতের সর্বজনীন ভাষা বা Lingua franca-রূপে গ্রহণ করার জন্য স্বদেশবাসীর নিকট প্রস্তাব করেন। আরও যে দুইজন সমসাময়িক বাঙ্গালী মনীষী একই সময়ে একই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ রচনার মাধ্যমে অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন হইলেন ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু এবং অন্য জন হিন্দু ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরের কৃপা, মাতৃভূমি এবং ব্রাহ্মসমাজ—এই তিন জায়গায় আমাদের স্বাধীনতা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।" এই স্বতঃস্ফূর্ত বাণীর মধ্য দিয়া মাতৃভক্ত সন্তানের যে আলেখ্যখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেশমাতৃকার সেবকমাত্রের চিত্তকেই আকর্ষণ করিবে। ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবের প্রস্তুতি-স্বরূপ তিনি যে কয়েকটি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন, তন্মধ্যে 'মাতৃভূমি দিবস' পালন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

কুচবিহারের নাবালক মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ হওয়ায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। কেশব-বিরোধী ব্রাহ্মদের অভিযোগ এই যে, কেশবচন্দ্র স্বয়ং আচার্য হইয়াও তাঁহারই রচিত বিবাহ-বিধি ভঙ্গ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের পক্ষের কথা এই যে,—ওই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদন "প্রজাপতির নির্বন্ধ, বিধাতার অভিপ্রায় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল"।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

পূর্বোক্ত বিবাহের মাসচারেক পরে (১৮৭৮ খ্রীঃ মে) কেশব-বিরোধী ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন নূতন সমাজ—যাহার নাম হইল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম যোগদান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি: শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ, শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, গুরুচরণ মহলানবিশ, কালীশঙ্কর সুকুল, নবদ্বীপচন্দ্র দাশ। এই নবগঠিত সমাজ নূতন উদ্যমে ও উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। কেশবচন্দ্র যেমন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি মন্দির (কেশব সেন স্ট্রীটে) নির্মাণ করাইয়াছেন এবং তৎসংলগ্ন একটা পাঠাগারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও তেমনই একটি মন্দির (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) নির্মাণ করাইয়াছে; সেই সঙ্গে একই প্রাঙ্গণের মধ্যে পাঠাগার, প্রচারক-মণ্ডলীর জন্য আশ্রম ইত্যাদিও স্থাপিত হইয়াছে। সু-সাহিত্যিক সুবক্তা মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ধর্মচর্চার সঙ্গে সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, নরনারীকে সমান অধিকার দান, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, ছাত্রগণের নৈতিক চরিত্র গঠন, সুরাপান নিবারণ ইত্যাদি

জনহিতকর কার্যও এই সমাজের সেবকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিয়া সুলভ মূল্যে বাংলা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রতিষ্ঠার সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত উহার সম্পাদনা করিয়াছেন। 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'—এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক ত্রিবাণী লইয়া পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইত। উহার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও নীতি প্রচারের ব্যবস্থা ছিল ; এবং দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দেওয়া হইত মদ, আফিং, গাঁজা, চরস ইত্যাদি খাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে। 'সঞ্জীবনী' বিদেশী শাসকবর্গের অত্যাচার, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতেন এবং দেশবাসীকে প্রেরণা দিতেন স্বদেশ ও স্বজাতির নিঃস্বার্থ সেবায়। জাতীয় অগ্রগতি সাধনে পত্রিকাখানির দান যথেষ্ট। ওই কার্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী স্থাপিত ও সম্পাদিত 'নব্য ভারত' মাসিক পত্রিকার অবদান এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্থাপিত ও সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' মাসিক পত্রিকার অবদান উল্লেখযোগ্য। সরলা দেবীর 'ভারতী' এবং কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রিকার অবদানকেও আমরা ভুলিতে পারি না।

বাংলার প্রাচীন জন-প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন' (ভারত সভা) স্থাপন ও গঠনের কার্যে অগ্রণী ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কালীশঙ্কর সুকুল প্রমুখ স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মগণ। প্রধানতঃ ইঁহাদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহাকে এক শক্তিশালী রাজনীতিক সংস্থারূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের যে নয়জন নেতা নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইজনই (কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু) ব্রাহ্ম। জাতিগঠনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবদানও যে কম নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বংশ-পরিচয়

৺বিধানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশে। সুতরাং বংশ-পরিচয় প্রসঙ্গে বাংলা দেশের সেই স্মরণীয় বীর-পুরুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্জয় অধিনায়ক প্রতাপাদিত্যের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

অমিতবল মহাপরাক্রমশালী সম্রাট আকবরের (১৫৪২খ্রীঃ—১৬০৫খ্রীঃ) রাজত্বকালে যুগল-প্রতাপের অভ্যুদয়ে পরাধীন ভারতের মুমূর্ষু অধিবাসিগণের মধ্যে কিছুকালের জন্য প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল। উত্তর ভারতে রাজপুতানার পার্বত্য অঞ্চল হইতে ভারতবাসী শুনিতে পাইল—বীরকেশরী মহারানা প্রতাপের সিংহ-গর্জন; আর পূর্ব ভারতে বঙ্গ-গগনে দেখিতে পাইল—বঙ্গ-সূর্য মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উদয়। প্রতাপাদিত্য ছিলেন বাংলার বার ভুঁইঞা বা দ্বাদশ ভৌমিক রাজগণের অন্যতম। বার ভুঁইঞার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ছিলেন। তাঁহাদিগের ভিতরে পারস্পরিক সহানুভূতি বা মনের মিল তেমন ছিল না; কিন্তু মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করা ছিল তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁহারা প্রয়োজন মতে ঐক্যবদ্ধ হইতেন। মোগলের আক্রমণে বঙ্গদেশে পাঠানেরা হীনবল হইয়া পড়িতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে শাসনক্ষমতাও তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছিল। তৎকারণে পাঠান রাজগণকে নির্ভর করিতে হইত ভৌমিক রাজগণের সাহায্যের উপর। এইভাবে দুইটি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদে একটা স্বার্থের সম্বন্ধও গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঠান ভূপতিগণের বিপৎকালে ভুঁইঞা-রাজগণ তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ সসৈন্যে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। তৎকালে বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিত—তাঁহাদিগের সাধারণ শত্রু মোগল, আরাকানী মগ, পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে।

বঙ্গদেশের উপর প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে (১১৯৮ খ্রীঃ) এবং তৎকালে পাঠান-রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়। আক্রমণকারী মুসলমানেরা অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারে নাই। নিখিল বঙ্গ তো দূরের কথা, কেবল পূর্ববঙ্গের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রায় দেড়শত বৎসর লাগিয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার পরে চতুর্দশ শতাব্দীর চতুর্থ

দশকে একদা তদানীন্তন পাঠান শাসনকর্তা দিল্লীর সুলতানের (মুহম্মদ বিন্ তুঘলকের) প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একই সময়ে অনুরূপ ঘোষণা করিলেন অযোধ্যা, মালব, গুজরাট, মথুরা ও বিদর প্রভৃতি অঞ্চলের শাসনকর্তারাও। সেই সময় হইতে বাদশাহ্ আকবরের বঙ্গবিজয় পর্যন্ত (১৫৭৬ খ্রীঃ) প্রায় ২৩৬ বৎসর বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব-মুক্ত স্বতন্ত্র শাসনের যুগ বলিলে ভুল হইবে না। তৎকালে সুশাসনের অভাব এবং নানাবিধ বিশৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বীর্য ও শক্তিহীন হইয়া যায় নাই। বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংগ্রামশীলতার অভাব ছিল না। তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনায় যেমন দক্ষ ছিলেন, রণক্ষেত্রেও সৈনিক এবং সেনাধিনায়করূপে তেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

যে বার ভুঁইঞার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে শাসন-দক্ষতা, শক্তি, সাহস ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এই ছয় জন—(১) ঈশা খাঁ মসনদ আলি (খিজিরপুর বা কত্রাভূ), (২) প্রতাপাদিত্য (যশোহর বা চ্যাণ্ডিকান), (৩) চাঁদ রায় ও কেদার রায় (শ্রীপুর বা বিক্রমপুর), (৪) কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় (বাক্‌লা বা চন্দ্রদ্বীপ) (৫) লক্ষ্মণমাণিক্য (ভুলুয়া), (৬) মুকুন্দরাম (ভূষণা বা ফতেহাবাদ) ইঁহারা মোগলদিগের দিগ্‌বিজয়ের প্রধান ও প্রবল অন্তরায় ছিলেন। এই ভৌমিক রাজগণের মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য উত্তরকালে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—তাঁহার শাসন-সুব্যবস্থা, সংগঠনী প্রতিভা, স্বদেশ-প্রেম, রণনৈপুণ্য, ক্ষাত্রতেজ, বিদ্যানুরাগ, দানশীলতা ইত্যাদি নানাবিধ গুণের জন্য।

মহারাজ আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এবং যে পাঁচজন কায়স্থকে বঙ্গদেশে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিরাট গুহ অন্যতম। ইনি বঙ্গীয় গুহবংশীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বিরাট গুহের নবম পর্যায়ে আশ্ বা অশ্বপতি গুহ। যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ (বসু) রায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমাজ সমীকরণ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থগণের 'বাক্‌লা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আশ্ গুহকে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই আশ্ গুহের এক প্রপৌত্র রামচন্দ্র। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, কিন্তু আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে থাকায় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কোন কাজেই লাগিতেছিল না। এইজন্য তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণা লাভের আশায় বাক্‌লা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী নগর সপ্তগ্রামে। ইহা

২

গৌড়ের অধীন একটি শাসন-কেন্দ্র এবং সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। তথায় তিনি আশ্রয় পাইলেন পূর্ববঙ্গবাসী, বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শ্রীকান্ত ঘোষের গৃহে। সুদর্শন, সুশ্রী, উদ্যমশীল, কৃতবিদ্য ও ধীমান যুবক অল্পকাল মধ্যেই ঘোষ মহাশয়ের স্নেহানুগ্রহ পাইলেন। তিনি যুবককে রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন। কর্মদক্ষতার জন্য কিছুকাল পরেই তাঁহার পদোন্নতি হইল। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দেশত্যাগী যুবকের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যসত্যই প্রসন্না হইলেন!

শ্রীকান্ত ঘোষের এক কন্যার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ হইল। তৎপূর্বে বাক্‌লাতে ষষ্ঠীবর বসুর কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। সেই স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ, ও শিবানন্দ। মাতৃভাষা ব্যতীত সংস্কৃত এবং পারসীক ভাষায়ও ভ্রাতৃত্রয় কৃতবিদ্য হইয়া আসিলেন সপ্তগ্রামে। তিন জনই রাজকীয় দপ্তরে উচ্চপদে নিযুক্ত হইলেন। যথাসময়ে তিন সহোদরেরই বিবাহ হইল। ভবানন্দের এক পুত্র—শ্রীহরি, গুণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র—জানকীবল্লভ। শিবানন্দের তিন পুত্র। তৃতীয় ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহই যশোহর আসেন নাই। তাঁহারা পূর্ব বাসস্থান বাক্‌লাতে চলিয়া যান এবং তথায় বসবাস করেন। শ্রীহরি পরবর্তীকালে 'বিক্রমাদিত্য' নামে যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং জানকীবল্লভ 'রাজা বসন্ত রায়' নামে খ্যাত হন। শ্রীহরি ছিলেন জানকীবল্লভ অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। উভয়ে সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সৌভ্রাত্র এমন গভীর ছিল যে, তৎকালে অনেকেই সেইজন্য তাঁহাদিগকে তুলনা করিতেন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে।

সপ্তগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তা গৌড়ের অধীন থাকিতে সম্মত ছিলেন না বলিয়া শিবানন্দের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটে। তখন রামচন্দ্রকে ৬৫ বৎসর বয়সে আত্মরক্ষার জন্য গৌড়ে চলিয়া যাইতে হয়। তিনি সঙ্গে নিলেন কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানন্দকে, আর পরিবারের অন্যান্যেরা রহিয়া গেলেন সপ্তগ্রামেই। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্‌র সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্র বিগত ৪০ বৎসরকাল সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত রাজসেবা করিয়া আসিয়াছেন। পিতার মত শিবানন্দের কর্মদক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার খ্যাতিও রাজধানী গৌড়ে সুবিদিত ছিল। নবীন সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ সেই সমুদয় বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্রের পুত্রগণকে পুনরায় রাজ-সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হইল। যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন তিনিই।

পরবর্তী কয়েক বৎসর চলিল রাষ্ট্র-বিপ্লব। যুদ্ধের পর যুদ্ধ ঘটিতে লাগিল এবং রাজার পর রাজা বসিতে লাগিলেন রাজতক্তে। সুদক্ষ কৌশলী ও গুণগ্রাহী শাসনকর্তা সুলেমান রাজ্যে অরাজকতা দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। বিদ্রোহী পক্ষে যোগদান না করায় ভবানন্দ, গুণানন্দ এবং শিবানন্দকে পুরস্কৃত করিলেন সুলেমান। ভবানন্দ মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। অপর দুই ভ্রাতাও রাজকীয় দপ্তরে উচ্চপদ পাইলেন। সুলেমানের দুই পুত্র ছিল—একজনের নাম বয়াজিদ এবং অপর জনের নাম দাযুদ। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি এবং ভ্রাতস্পুত্র জানকীবল্লভ তখন তরুণ যুবক, রাজপুত্রদ্বয়ও তাঁহাদের সমবয়স্ক।• মন্ত্রী ভবানন্দের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত রাজবাড়ীতে একত্রে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেন, এক সঙ্গে বেড়াইতেন এবং খেলা করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির ভাব জন্মে। ইহার ফলে যশোহর-রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল। সুলেমানের মৃত্যুর পরে দাযুদ যখন সিংহাসনে আসীন হইলেন, তখন বাল্যবন্ধু শ্রীহরি এবং জানকীবল্লভকে রাজকীয় দপ্তরে উচ্চপদ দিলেন। নবীন সুলতান শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' এবং জানকীবল্লভকে 'বসন্ত রায়' উপাধি দিয়া ভূষিত করিলেন। বিক্রমাদিত্য পাইলেন প্রধান মন্ত্রীর পদ।

শ্রেষ্ঠ কুলীন উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যার সহিত শ্রীহরির বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ভবানন্দ যখন সপরিবারে গৌড়ে বাস করিতেছিলেন, তখন ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা ইহার সামান্য পরেই অল্প বয়সে শ্রীহরির ঔরসে উল্লিখিত বসু-দুহিতার গর্ভে একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়। ইনিই বিশ্ববিশ্রুত প্রতাপাদিত্য—যিনি ভাবীকালে যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং যাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপ মোগল সম্রাটকেও বিচলিত করিয়াছিল।

দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ ভবানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, মোগলের সঙ্গে দাযুদের যুদ্ধ অনিবার্য। সুতরাং তিনি গৌড় হইতে দূরবর্তী কোন নিরাপদ অঞ্চল বাছিয়া লইয়া তথায় বাস-সংস্থান করা স্থির করিলেন। নির্বাচিত হইল দক্ষিণ বঙ্গে এক নদীবহুল আরণ্য অঞ্চল।

মোগলের সহিত দাযুদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পলায়নের পূর্বে দাযুদ গৌড়ের অপরিমিত ধনরত্নাদি বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইয়া দেন। তিনি এবং বসন্ত রায় ওই সমুদয় নৌকায় করিয়া যশোহরে লইয়া আসিলেন। দেবানুগ্রহে যশোহর রাজ্যের ধনভাণ্ডার ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মোগল সম্রাট আকবর তাঁহার রাজস্ব-সচিব ও অন্যতম সেনাপতি

টোডরমল্লকে বঙ্গবিজয়ে সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে পাঠাইয়াছিলেন। দায়ুদের পতনের পরে তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির জন্য বিক্রমাদিত্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহা কোন সূত্রে অবগত হইয়া বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশ ছাড়িয়া টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহের রাজস্ব-সচিব বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিলেন। রাজকীয় দপ্তরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তিনি টোডরমল্লকে বুঝাইয়া দেন এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদিতে সাহায্য করেন। সম্ভবতঃ টোডরমল্লেরই সুপারিশে সম্রাট আকবর বিক্রমাদিত্যকে সামন্ত-রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ হইল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব এবং তিনি বাদশাহ্‌কে যথারীতি রাজস্ব প্রদান করিতে থাকেন। বিক্রমাদিত্য ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রায় সহ যশোহরে ফিরিয়া আসেন এবং কালোপযোগী সমারোহ ও উৎসবানুষ্ঠান সহকারে যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হইলেন। দীর্ঘ-কাল পরে দক্ষিণ বঙ্গ অরাজকতা হইতে অব্যাহতি পাইল এবং প্রজাগণ শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে শাসনকার্য চালাইতেন রাজা বসন্ত রায়।

মহারাজ-কুমার প্রতাপাদিত্য কিরূপ পরিবেশে বাল্য হইতে কৈশোরে ও কৈশোর হইতে যৌবনে পৌছিলেন এবং তাঁহার জীবন কিভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তৎসম্পর্কে সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"প্রতাপাদিত্য পরম রূপবান ছিলেন বলিয়া কথিত হন। তিনি বাল্য-কাল গৌড়নগরে অতিবাহিত করিয়া, যে সময় পুরস্ত্রীগণ যশোহরে গমন করেন, সেই সময় তাঁহাদিগের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। গৌড়-নগরে অবস্থানকালেই বালক প্রতাপাদিত্য পারস্যভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। তিনি অল্পকালের মধ্যে পারস্যভাষা যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যাস করেন। প্রতাপাদিত্য, যশোহর নগরে উপনীত হইয়া, উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পৌরুষজনক বিদ্যাতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হন। তিনি শরচালনা ও অশ্বারোহণে এরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে এ বিষয়ে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না।"

প্রতাপের জন্মপত্রিকায় লিখিত ছিল যে, তিনি পিতৃদ্রোহী হইবেন। ইহাতে তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত প্রভৃতির মনে অশান্তি ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। প্রতাপের সহিত ব্যবহারে ও কথাবার্তায় গুরুজনদের সেই প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ পাইত। তাঁহার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁহারা তিরস্কার করার কালে তাঁহাকে পিতৃদ্রোহী বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ

করিতেন না। গুরুজনদের এইরূপ আচরণে প্রতাপের মনে প্রতিক্রিয়া হইল। বিক্রমাদিত্য এবং বসন্ত রায় তাঁহার মতিগতি ও কার্যাদি হইতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে রাজদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। আকবরের মতো মহাপরাক্রমশালী ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলে যে সুনিশ্চিত সর্বনাশের মুখোমুখী হইতে হইবে, ইহাও তাঁহারা জানিতেন। পিতা ও পিতৃব্য পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রাজ্যশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের অজুহাতে প্রতাপকে মোগল সম্রাটের তৎকালীন রাজধানী আগ্রায় পাঠানো হইবে। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া সম্রাটের অসীম শক্তি ও প্রতাপের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলে যুবক প্রতাপাদিত্যের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এই প্রকার ধারণা তাঁহাদের জন্মিল।

পিতার আদেশে প্রতাপ কয়েকজন বন্ধু এবং অনুচরবর্গকে লইয়া আগ্রায় গেলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি সম্রাটের এবং আমির-ওমরাহ্, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী প্রভৃতির প্রীতিভাজন হইলেন। ঘন ঘন বাদশাহের দরবারে যাইয়া এবং উজিরদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মুষ্টিমেয় মুসলমান বিদেশ হইতে আসিয়া এই দেশেরই হিন্দু মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীগণের সাহায্যে ও সহযোগিতায় বিরাট ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বিদেশীর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য হিন্দুজাতির ঐক্য, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির অভাবই যে দায়ী, এই ধারণাও তাঁহার মনের মধ্যে জাগিল। রাজপুতনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত মিশিয়া তিনি শুনিলেন মহারানা প্রতাপ সিংহের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কাহিনী। অপূর্ব ত্যাগ, দুঃখবরণ, মহান সংকল্প ও বীরত্বের কাহিনী তাঁহাকে নূতন প্রেরণা দিল। রাজভক্ত পিতা যে উদ্দেশ্যে পুত্রকে আগ্রায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

পিতার হাত হইতে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে আনিতে না পারিলে স্বাধীনতা লাভের পথ যে সুগম হইবে না, তাহা প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারিলেন। সেইজন্য তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করেন। আগ্রায় অবস্থানকালে রাজকীয় দপ্তরে জমা দিবার জন্য যশোহর হইতে তাঁহার নামে যে রাজস্ব প্রেরিত হইত, তাহা তিনি জমা দিতেন না। রাজস্ব অনাদায়ের কথা প্রতাপ কৌশলে সম্রাটের কানে লাগাইলেন। সম্রাট তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বসন্ত

রায়ের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিলেন। সম্রাট প্রতাপকে বলিয়া দিলেন যে, যদি তিনি বাকী রাজস্ব শোধ করার ব্যবস্থা অল্পদিনের ভিতর করিতে পারেন, তবে যশোহর রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার উপর প্রদত্ত হইবে। প্রতাপ সম্রাটের আদেশ পালন করিয়া রাজ্যশাসনের ফরমান পাইলেন। সম্রাটের আদেশে বিশ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া তিনি যশোহর নগরে প্রবেশ করেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় অবস্থা বিবেচনায় প্রতাপের কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

প্রতাপাদিত্যের সিংহাসনে আসীন হইবার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। প্রতাপ মোগলের প্রভুত্ব-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সমস্ত চিন্তা ও শক্তি নিয়োগ করিলেন। রাজ্যের বহু স্থানে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত হইল। সমর্থ অধিবাসীগণকে সাহসী ও রণকুশল সৈনিকরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি ব্যাপক সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। সেই সঙ্গে সময়োপযোগী প্রচারের দ্বারা জনগণকে সংগ্রামশীল ও স্বাধীনতা-প্রিয় করিয়া তোলা হইল। ইতোমধ্যে ঘটিয়া গেল এমন একটা ঘটনা—যাহার ফলে প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হইয়া রহিল। পিতৃব্য ও পিতৃব্যের পরিবারের সহিত প্রতাপের শত্রুতা চলিতেছিল। সেই অবস্থায় বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধে প্রতাপ নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলে বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায়ের সহিত প্রথমে প্রতাপের সংঘর্ষ ঘটে। গোবিন্দ প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করেন; লক্ষ্যচ্যুত হওয়ায় প্রতাপের প্রাণ রক্ষা পায়। প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে তরবারির দ্বারা গোবিন্দের শিরশ্ছেদ করেন। পরে সেই সংঘর্ষে বসন্ত রায় এবং তাঁহার আরও সাতটি পুত্র নিহত হন। বসন্ত রায়ের সহধর্মিণী অবশিষ্ট পুত্র বালক রাঘবকে কচু-বনে লুকাইয়া রাখিয়া আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। সেই পুত্রটি উত্তরকালে কচু রায় বলিয়া অভিহিত হন।

পূর্বোক্ত শোচনীয় ঘটনার পরে বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসু এবং প্রধান প্রধান কর্মচারী প্রতিশোধ লইবার আশায় হিজলীপতি বসন্ত রায়ের পরম বন্ধু ঈশা খাঁ মসনদ আলির শরণাপন্ন হইলেন। ইহার অল্পকাল পরেই ঈশা খাঁর সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঈশা খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। প্রতাপ সঙ্গে-সঙ্গেই হিজলী অধিকার করিয়া তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে কেদার রায়, চাঁদ রায় প্রতাপের সহিত সম্পাদিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া স্বাধীন হইবার জন্য

উদ্যোগী হন। প্রতাপ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান করেন। তাঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট ক্ষমা-প্রার্থী হইলেন; এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভবিষ্যতে ওইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বদেশের অনিষ্ট সাধন করিবেন না। প্রতাপ অধিকৃত রাজ্য তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। সিংহাসনে আসীন হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধুমধামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

মহারাজের সুশাসনে বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি আরাকান-নৃপতির সহিত সন্ধি করিয়া পর্তুগীজ জলদস্যুগণের উপদ্রব বন্ধ করিলেন। প্রতাপের রাজ্যের মধ্যে যে সকল সামন্ত নৃপতি জমিদার ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে কেবল অধীনতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গীয় জমিদারগণের প্রায় সকলেই প্রতাপের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এদিকে রূপরাম বসু কচু রায়কে সঙ্গে লইয়া গেলেন আগ্রায় মোগল বাদশাহের শরণ লইতে। তাঁহাদিগের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন স্থানীয় চতুর লোকও গেলেন। বাদশাহের দরবারে রূপরাম প্রতাপের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ আনিলেন। প্রতাপ যে সম্রাটের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও তিনি জানাইলেন।

প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রথম মোগল অভিযান হইল রাজমহলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শের খাঁর অধিনায়কত্বে। তুমুল যুদ্ধের পর প্রতাপের সৈন্যের হস্তে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল।

প্রতাপাদিত্যের হস্তে শের খাঁর পরাজয়-বার্তা মোগল সম্রাটের নিকট পৌছিলে, তিনি ইব্রাহিম খাঁকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া পুনরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর এইবারেও মোগল-বাহিনীর পরাজয় ঘটিল।

সম্রাট আকবর প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান এবং মোগল-বাহিনীর পরাজয় সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হন। পরবর্তী অভিযান পরিচালনার্থ তিনি মনোনীত করিলেন আজিম খাঁ নামে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতিকে। তিনি বিপুল বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া প্রতাপ-বিজয়ের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতাপের গোপনীয় উপদেশ মতে তাঁহার অধীনস্থ পাটনার এবং রাজমহলের কর্মচারীগণ আজিম খাঁকে কোন প্রকার বাধা না দিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মোগল

সেনাপতি মনে করিলেন যে, এতদূর পর্যন্ত যখন তিনি বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তখন প্রতাপের রাজ্য জয় করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইবে না; আজিম বঙ্গদেশে পৌঁছিয়া বর্তমান কলিকাতার নিকটে শিবির সংস্থাপন করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে-ছিলেন। প্রতাপ দুর্ধর্ষ বাহিনী লইয়া রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন শত্রু-শিবির। ভয়াবহ সংগ্রামের পর মোগল বাহিনী পরাজিত হইল। অনুমান বিশ হাজার মোগল সৈন্যকে নিধন ও বন্দী করা হয়। সেনাপতি আজিম খাঁও নিহত হইলেন সেই যুদ্ধে।

মোগল সম্রাট এইরূপ পরিস্থিতিতে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি সাম্রাজ্যের বাইশ জন আমিরকে রাজদরবারে আহ্বান করিলেন। ইঁহারা সকলেই অভিজ্ঞ সাহসী যোদ্ধা। সম্রাটের মুখে উপর্যুপরি মোগল বাহিনীর বিপর্যয়ের কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই প্রতাপ-দমনের জন্য বঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সহস্র সহস্র সৈন্য লইয়া পূর্বোক্ত বাইশ জন আমির বঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছেন। মহারাজের বাহিনীর সঙ্গে মোগল বাহিনীর কয়েক দিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিল। এবারেও মোগল বাহিনীর পরাজয় হইল। ইতোমধ্যে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হইল (১৬০৬ খ্রীঃ), তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর বসিলেন মসনদে। তিনি সেনাপত মানসিংহকে বিপুল বাহিনী সহ বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। রাজপুত সেনাপতি রূপরাম বসু এবং কচু রায়কে সঙ্গে আনিলেন। সেই সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন দেশদ্রোহীও যোগ দিলেন। তাঁহারা নানা প্রকার গোপনীয় সংবাদাদি দানে মানসিংহকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রতাপাদিত্যের বাহিনীর সহিত মোগল বাহিনীর ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কখনও প্রতাপের পক্ষে জয়, কখনও মানসিংহের পক্ষে জয়; এইভাবে জয়-পরাজয়ের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া চলিল ভয়াবহ যুদ্ধ। ভাগ্য-লক্ষ্মী প্রতাপের প্রতি বিমুখ হইলেন। বীরত্ব ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রতাপের প্রধান প্রধান সেনানীরা মৃত্যু বরণ করেন। প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊনবিংশ-বর্ষীয় উদয়াদিত্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিলেন। প্রতাপাদিত্য বন্দী হইলেন শত্রু-হস্তে। সেই সঙ্গে অস্তমিত হইল বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য! ওই সমুদয় দুঃসংবাদ যখন দুর্গ-মধ্যে পৌঁছিল, তখন প্রতাপের মহিষী শরৎকুমারী আপন কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পূর্বের অভিসন্ধি অনুসারে বিপৎকালে কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। দুর্গের ভিতরে পরিখায় পূর্ব হইতে একখানি আবৃত নৌকা প্রস্তুত ছিল। মহারানী অন্যান্য স্ত্রী-পরিবার ও শিশু-সন্তানসহ সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে ঐ খাল বাহির হইয়া গিয়াছিল, তথায় একটি গুপ্ত দ্বার ছিল। উহা খুলিয়া দিলে নৌকা-পথে পলায়ন করা যাইত। পূর্বেই বলিয়াছি ঐ ভিতরের খাল গিয়া বাহিরের যে বিস্তীর্ণ পরিখায় মিশিয়াছিল, তাহার নাম কামারখালি, উহা অল্প দূরে গিয়া যমুনায় মিশিয়াছিল। যমুনা-প্রবাহের প্রবল উচ্ছ্বাসে কামারখালি তখন প্রশস্ত নদীতে পরিণত হইয়াছিল। এখনও তাহার খাত বর্তমান যমুনার খাত অপেক্ষাও প্রশস্ত আছে।

অবিলম্বে গুপ্তদ্বার উন্মোচিত হইল। রাজ-পরিবারের জীবনবাহিনী তরণী সেই পথে বাহিত হইয়া বাহিরে কামারখালিতে পড়িল। সেইখানে তরণীর তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইল। পরিবারবর্গ ও শিশু-সন্তানসহ যশোহরের মহারানী জাতি মান রক্ষা করিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মোগলের হস্তে সতীত্ব-ধর্ম জলাঞ্জলি না দিয়া, প্রকৃত রাজপুত ললনার মত যশোহর-পুরীর কুললক্ষ্মীগণ যমুনা-জলে জীবনাঞ্জলি দিলেন। এইবার যশোহর-রাজলক্ষ্মী প্রকৃতভাবে অন্তর্হিত হইলেন। ধুমঘাট দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে জহর-ব্রতের চিতাচুল্লীর মত সেই স্থান এখনও প্রদর্শিত হয়। মহারানী শরৎকুমারীর নামে এখনও তাহার নাম 'শরৎখানার দহ।'"

কবি ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' কাব্য হইতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও বন্দী হইবার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পাতসাহী ঠাটে কেবা কবে আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে ॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ-আদিত্যে লৈল ॥"

মানসিংহ বন্দী প্রতাপাদিত্যকে মোগল বাদশাহের নিকট নিতে পারেন নাই। পথিমধ্যে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হইল। কাহারও মতে বিষ-পানে প্রতাপ মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ মনে করেন যে অনশনে

তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। কবি ভারতচন্দ্রের মতে—"প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।" কচু রায় মানসিংহকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়া পিতৃহত্যা ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলেন। বাদশাহে্র নিকট হইতে 'যশোহরজিৎ' উপাধি পাইয়া তিনি যশোহর রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। স্বজাতিদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার পাইলেন জমিদারি।

বিধানচন্দ্রের বংশ-পরিচয় 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় 'রায়' উপাধি বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন; তাহারা এখনও স্থানিক রাজোপাধি ভূষিত হইয়া নূরনগর, কাটুনিয়া, মানিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪ পরগনার মধ্যবর্তী পুঁড়া-খোড়গাছিতে বাস করিতেছেন, উৎকুলের রায়গণের রাজোপাধি নাই।...উক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় আশ-গুহ বংশীয় অন্য শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুরে বাস করিতেন; অপরাংশ টাকী প্রভৃতি স্থানের মুন্সী বংশীয়। খুলনার ভূতপূর্ব বিখ্যাত উকিল বেণীভূষণ রায়, হাইকোর্টের উকিল শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, কলিকাতার প্রখ্যাতনামা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (L. R. C. P. London) এবং সুপণ্ডিত ও সুবক্তা গীষ্পতি কাব্যতীর্থ এই বংশীয় এবং শ্রীপুরের অধিবাসী।"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন বঙ্গভূমিকে মোগল বাদশাহের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য। সেই বংশেরই সন্তান বিধানচন্দ্র সংগ্রাম করিয়াছেন বৃটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে ভারতভূমির মুক্তি-কল্পে মহাত্মা গান্ধীর অধিনায়কত্বে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিধানচন্দ্রের পিতামাতা

বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বহরমপুর শহরে—পিতার কর্মস্থলে। প্রকাশচন্দ্রের পিতা প্রাণকালী রায় সেখানে কালেক্টারীতে কাজ করিতেন। "পরোপকার ও শুদ্ধাচারের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।" প্রকাশচন্দ্রের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের বাড়ী ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে। পূর্বপুরুষের জমিদারির বেশির ভাগই হস্তচ্যুত হইয়া যায়; প্রাণকালী রায়ের সময়েও কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল।

পিতার মৃত্যুর পরে প্রকাশচন্দ্রের সেজ দাদা পূর্ণচন্দ্র বদলী হইয়া গেলেন যশোহরে। বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রকাশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পড়িবার জন্য তিনি আবার বহরমপুরে গেলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুআরি কিংবা মার্চ মাসে তাঁহার বিবাহ হইল স্বগ্রামের কুলীন জমিদার বিপিনচন্দ্র বসুর কন্যা অঘোর-কামিনীর সঙ্গে। বরের বয়স আঠারো বৎসর এবং কনের বয়স দশ বৎসর। তখন ছিল বাল্য বিবাহের যুগ। এফ. এ. পরীক্ষায় (বর্তমানের আই. এ.) উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাশচন্দ্র বি. এ. পড়িতে থাকেন; কিন্তু সংসারে বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ চলিতে থাকায় তাঁহার পক্ষে আর বি. এ. পাশ করা সম্ভব হয় নাই। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার বড় দাদা ভারতচন্দ্র ও সেজ দাদার মধ্যে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না। সাংসারিক বিবাদ, অশান্তি, অভাবাদির মধ্য দিয়া অঘোরকামিনীকে পরমেশ্বর যেন নিজ হাতে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল কিংবা মে মাসে অর্থাৎ ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে। সুতরাং তৎকালে তাঁহাকে বালিকা বধূ বলা যাইতে পারে। তাঁহার পিতৃকুল এবং স্বামীকুল—উভয় কুলই ছিল বিত্তবান ও সুখী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভাগ্যদোষে বালিকা বধূকে পড়িতে হইল দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অগ্নিকুণ্ডে। সুবর্ণ যেমন অনলে দগ্ধ হইয়া শ্যামিকা-মুক্ত হয়, অঘোরকামিনীও তেমনই খাঁটি সোনা হইয়া অর্থাৎ হিন্দু পরিবারের আদর্শ গৃহিণীরূপে নিজেকে গড়িয়া লইয়া বাহির

হইলেন। করুণাময় পরমেশ্বর যেন নিজ হাতে তাঁহাকে সেই অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাঁহার ঈশ্বর-নির্ভরতা, শ্রমশীলতা, ধৈর্য, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা ইত্যাদি আদর্শ গৃহিণীর উপযোগী গুণাবলী পরিস্ফুট করিয়া দিলেন। উত্তরকালে এই সমুদয় গুণই তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনায়, সমাজ-সেবায় ও পরোপকার-ব্রত পালনে সহায়ক হইয়াছিল। বালিকা বধূ থাকা কালে একবার অঘোরকামিনী স্বগ্রামের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। আহারের সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, যাহারা উৎকৃষ্ট সাড়ী অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের আদর-যত্ন হইতেছে যথেষ্ট। আর যাঁহাদের বেশ-ভূষা সাধারণ, তাঁহাদের কোন প্রকার সমাদর হইতেছে না। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র বলিয়া ব্যবহারের বৈষম্যে তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, দরিদ্র বলিয়া ওইরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি কখনও করিবেন না। সেই সংকল্প তিনি জীবনে কোনদিন ভঙ্গ করেন নাই।

প্রকাশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই Tom Payne-এর 'Age of Reason' নামক পুস্তক পাঠ করেন। তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার সন্দেহ জন্মে। যখন দর্শনশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন, তখন সেই সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। ওই ভাবের পরিবর্তন হইল বহরমপুর কলেজে অধ্যয়নকালে। স্থানীয় পাদরি রেভাঃ এ. জে. হিল সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি বাইবেল এবং খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক অন্যান্য পুস্তক পড়িয়া এবং হিল সাহেবের সহিত ধর্মালোচনা করিয়া সেই ধর্মের অনুরাগী হইলেন। একদিন রাত্রি এগারটার সময় পাঠ সমাপনান্তে প্রকাশচন্দ্র স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবেন। ছাত্রাবাসে যে বন্ধুটি তাঁহার সঙ্গে একই প্রকোষ্ঠে থাকিয়া পড়িতেন, তাঁহাকে জানাইলেন সে-কথা। তিনি ওই কার্য হইতে প্রকাশচন্দ্রকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। তাহাতে ফল হইল না। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাঁহার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অমূল্য উপদেশের কথাটি—"কোন গুরুতর কার্য করিবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা সময় লইও।" তিনি ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিলেন। পরদিন তাঁহার একটি খ্রীষ্টান সহাধ্যায়ী পরীক্ষা দিবার কালে অসৎ উপায় অবলম্বন করায় পরীক্ষা-গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। তখন প্রকাশচন্দ্রের মনে ভাবান্তর উদয় হইল এই কারণে যে, খ্রীষ্টান হইলেই তো অসৎ কার্য করার প্রবৃত্তি লোপ পায় না এবং নবজীবনও লাভ হয় না। ওই সমুদয় চিন্তা তাঁহাকে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিল।

তৎকালে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মেরও বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে স্বগ্রামের কয়েকটি সমবয়সী নব-দীক্ষিত ব্রাহ্ম বন্ধুর সংসর্গে আসার ফলে তাঁহার সেই বিরোধিতার ভাব দূর হইল এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মিল। ভাবী কালের সেই ধর্মবন্ধুদের মধ্যে ছিলেন—হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ভাবী শিক্ষক কেদারনাথ রায়, মিটিওরোলজিক্যাল্ অফিসের ভাবী প্রধান কেরানী (পরে রায়সাহেব) ফণীন্দ্রমোহন বসু ও পটলডাঙ্গার কবিরাজ পঞ্চানন ঘোষ কবিরত্ন। ওই বন্ধুদের সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"ধর্ম বিষয়ে আমার মনে যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের গ্রামের সেই বন্ধুদের সঙ্গে আমার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যতবার দেশে যাইতাম, ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। এই সময়ে কেদার প্রচারক হইবেন বলিয়া শ্রীপুর গমন করেন। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, ব্যাকুলতা, ফণীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পঞ্চাননের সরলতা আমার অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। পঞ্চানন আমার সঙ্গ প্রায় ছাড়িতেন না। দুইজনে প্রায়ই নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম। তিনি গান করিতেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিত। আমাকে ফিরাইবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কোথা হইতে দেবতা যেন ইঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।"

মানব-জীবনের উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে দেখা যায় যে, সঙ্গ-গুণে কিংবা সঙ্গ-দোষে মানুষের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সৎসঙ্গ লাভ করা মানুষের পরম সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে প্রকাশচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন, সহধর্মিণীর জীবন এবং পুত্রকন্যাগণের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ব্রাহ্ম সমাজে এবং অপর সমাজেও পাইয়াছিলেন শ্রদ্ধার আসন। এই পরিবার 'অঘোর পরিবার' নামে খ্যাত ছিল।

পতি-পত্নী দুইজনের জীবনই গঠিত হইয়াছে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটন এবং নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া। প্রকাশচন্দ্র ওকালতি পড়িয়া উকিল হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিবেন, এইরূপ আশা মনে-মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু স্বগ্রামবাসী উকিল হরি দত্ত মহাশয় যখন বলিলেন "আইন ব্যবসায়ে বিবেক ঠিক রাখা যায় না", তখন তিনি সে আশা ছাড়িয়া দিলেন। ডাকঘরে দুই মাস শিক্ষানবিস থাকিয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং বর্ধমানের অস্থায়ী পোস্টমাস্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া সেই কার্যে যোগ দিলেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল। কয়েক মাস পরে অস্থায়ী চাকরির মেয়াদ ফুরাইল। বর্ধমানে থাকা কালে অঘোরকামিনীও

সেখানে তাঁহাদের প্রথম সন্তান সুসারবাসিনীকে লইয়া স্বামীর সহিত বাস করেন। ইহার পর জন্ম হইল দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনীর তাঁহার মাতুলালয়ে। দুইটি কন্যা সহ অঘোরকামিনীকে বাস করিতে হইল শ্বশুরালয়ে বৎসরাধিক কাল। তৎকালে দুইটি সন্তান পালন ব্যতীতও "কুলবধূর সমুদয় কাজ, চিড়ে কোটা, গরুর জাব কাটা, এ সকলই" তাঁহাকে করিতে হইত। "সকালে উঠিয়া বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, গোবর দেওয়া, এ সকল নিত্যকর্ম ছিল।" প্রকাশচন্দ্র তখন তাঁহার এক বন্ধুর ছাপাখানা চালাইবার ভার নিলেন অংশীদার হিসাবে। কিন্তু লাভের টাকা মূলধনে রাখা হইত বলিয়া তিনি বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীকে কন্যা দুইটি সহ থাকিতে হইয়াছিল সেজ দাদার উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ওইরূপ অবস্থায় কুলবধূকে পরিবারের সংকীর্ণমনা মহিলাদের মুখে যে সকল অপ্রিয় মন্তব্য দিবা-রাত্রি শুনিতে হয়, অঘোরকামিনীকেও তাহা শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহজাত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। প্রকাশচন্দ্র সহধর্মিণীর ওই দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বন্ধুর সম্মতি লইয়া কলিকাতায় ছাপাখানার কাজ ছাড়িয়া দেন এবং অগৌণে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। বগুড়ায় পোস্টমাস্টারের কাজ পাইলেন, কিন্তু ভাল না লাগায় তাহাও ছাড়িয়া দেন।

সেকালে উচ্চশ্রেণীর ভদ্রবংশীয় মেয়েদেরও লেখাপড়া শিখানো হইত না। হিন্দুসমাজ এতটা অনগ্রসর ছিল যে, স্ত্রী-শিক্ষা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত। অঘোরকামিনীও নিরক্ষরা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর চেষ্টায় এবং নিজের আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ভবিষ্যতে কালোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হইতে নিজে শয়নের পূর্বে প্রায় প্রতিদিনই সহধর্মিণীকে লেখাপড়া শিখাইতেন। উভয়েরই লেখাপড়ার কাজটি নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। অঘোরকামিনী আরও ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখিতে এবং বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পরিণত বয়সে (৩৬) মিস থোবর্ন নামক একজন মহীয়সী খ্রীষ্টান মহিলার পরিচালিত লক্ষ্ণৌ নগরের উইমেন্‌স্ কলেজে ভর্তি হইলেন। একই উদ্দেশ্যে সঙ্গে লইয়া গেলেন তাঁহার যুবতী কন্যা দুইটিকে। সেখানে কলেজের ছাত্রাবাসে নয় মাস (১৮৯১ খ্রীঃ) থাকিয়া তাঁহারা শিক্ষা লাভ করেন। বিহারে ফিরিয়া আসিয়া অঘোরকামিনী তাঁহার কন্যা দুইটির এবং স্বামীর সহযোগিতায় বাঁকিপুরে একটি ছাত্রীনিবাস-সমন্বিত বালিকা

বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি বাংলা শিখিয়াছিলেন ভালো করিয়া এবং হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা মোটামুটি শিখিয়াছিলেন।

সেকালে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেন, হিন্দুসমাজ এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে তাঁহারা লাঞ্ছনা পাইতেন যথেষ্ট। অঘোরকামিনী ধর্ম-সাধনার পথে স্বামীর পদানুবর্তন করিয়া প্রকৃত সহধর্মিণী হইলেন। সেইজন্য স্বামীর অপেক্ষা তাঁহাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হইলেন না। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবারের সহিত একত্রে বাস করিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটিল। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর কিছুকাল হরিনাভি (২৪ পরগনা) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বগুড়ার পোস্টমাস্টারের কাজ ছাড়িয়া দিবার কিছুকাল পরে (১৮৭৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর) প্রকাশচন্দ্র সেই বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তিনি সপরিবারে তাঁহার ধর্মবন্ধু শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিবারের সহিত হরিনাভি গ্রামে একত্রে বাস করিতেন। উভয় পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতা ও প্রীতির ভাব জন্মিল। এই সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"১৮৭৪ সালের মার্চ মাসে তোমাকে ও কন্যা দুইটিকে সেখানে লইয়া গেলাম। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তুমি মিশিতে লাগিলে। ব্রাহ্ম পরিবার যে কত উন্নত হয়, একত্র উপাসনার যে কত সুফল, তাহা অনুভব করিবার সুযোগ পাইলে। স্বামীর সঙ্গে ও স্বামীর ধর্মবন্ধুদের সঙ্গে একত্র বাস করিবে, স্বাধীনভাবে নিজের সংসার করিবে, ও সেই সংসারে নিজের প্রাণের ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিবে, এই সকল আশা অনেক দিন হইতে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলে। এতদিন আমি বিদেশে ছিলাম, আমার জন্যও কত ব্যাকুল হইয়াছিলে। এইবার তোমার এসকল বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল। তাই এখানে আসিয়া তুমি অতিশয় সুখী হইলে। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তোমার বন্ধুতা হইল। তাঁহার কন্যার আবদার রক্ষার জন্য স্বহস্তে একদিন আপন কন্যা সুসারের বড় চুল কাটিলে।··· আমি মতিহারীতে দুর্ভিক্ষের রিলিফ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ পাইলাম। এ কাজে বেতন অধিক, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও অধিক, তা ছাড়া গবর্নমেণ্টের কাজ, সকল কারণে তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। বন্ধু শিবনাথও বলিলেন, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আসিবার সময় তুমি ও তোমার কন্যাগুলি এবং শিবনাথের পত্নী ও কন্যা এত ক্রন্দন করিয়াছিলে যে সে কান্নার রোল আমি ভুলিতে পারিব না।"···

ওই উদ্ধৃতি দিয়াছি প্রকাশচন্দ্রের রচিত "অঘোরপ্রকাশ" নামক গ্রন্থ হইতে। বাংলা ভাষায় রচিত ইহা একখানি জীবনী-গ্রন্থ। সাধু পতি সাধ্বী পত্নীর দেহাবসানের পরে, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সেই পুণ্য জীবন-কাহিনী—যাহাতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে চরিতকারেরও পূত আত্মকথা। প্রকাশচন্দ্র গ্রন্থের 'উদ্বোধন'-এর আরম্ভেই লিখিয়াছেন ঃ—

"তোমার দেহত্যাগের পর ত্রিশ দিনের দিনে তোমার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তুমি বলিয়াছিলে, শুদ্ধাচার, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ ব্যবহার না হইলে তোমার সঙ্গে আর অধিক মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। আরও বলিয়াছিলে, তোমার মত না হইলে উন্নত মিলনের ভূমিতে উপনীত হইতে পারিব না।

"সেই দিন হইতে তোমার মত হইবার জন্য আরও ব্যাকুল হইলাম। আবার সেই দিন হইতে, কি জানি কেন, তোমার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই জীবনীর সূত্রপাত। কত সময়ে তোমার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি। দেশে থাকিতে তুমি মিলিত জীবনের এই কাহিনী শুনিতে কত ভালবাসিতে। কতবার পত্রে সে কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছি। আজ তুমি আমার কত নিকটে। এস দুজনে আবার চিরপরিচিত সেই পবিত্র কাহিনীর আলোচনা করি।"

প্রকাশচন্দ্র মতিহারীতে কাজ পাইবার কিছুকাল পরেই তাঁহার সেজ দাদা পূর্ণচন্দ্র আসামে একটা বড় কাজ পাইয়া গেলেন। তিনি প্রকাশ-চন্দ্রকেও তথায় যাইয়া তাঁহার অধীনে কাজ করিতে লিখিলেন। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র যাইতে সম্মত হন নাই। তাঁহার অসম্মতির হেতু সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"এই সময়ে সেজ দাদা মহাশয় আসামের একজন বড় জমিদারের দেওয়ান হইয়া গৌহাটী গেলেন। আমাকেও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া কাজ লইতে বলিলেন। আমার ভাল লাগিল না। হাজার কেন টাকা হউক না, যেখানে ধর্ম রক্ষা করিয়া কাজ করিবার সম্ভাবনা নাই সেখানে আমার প্রাণ থাকিতে চাহিল না। দাদাকে লিখিলাম, আমার আসাম যাওয়া হইবে না। ইহাতে বাটীর সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ভগবানের ইচ্ছায় এই সময় আমার মতিহারীর কাজটি পাকা হইল।"

প্রকাশচন্দ্রের সমগ্র জীবনকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি "ধর্ম রক্ষা করিয়া কাজ করিবার" আদর্শ হইতে কোন দিন বিচ্যুত হন নাই। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণার সেই আদর্শ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ

না করিয়া তিনি কর্মজীবনে উন্নতি-শিখরে উঠিতে পারিয়াছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই। দুর্ভিক্ষের রিলিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজে তাঁহার মাসিক আয় ছিল মাত্র ৮০৲ টাকা। ইহা হইতে তিনি প্রতি মাসে মাকে ৩০৲ টাকা পাঠাইতেন; বাকী ৫০৲ টাকা দিয়া দূরদেশে অঘোরকামিনী বেশ গুছাইয়া একটা বড় সংসার চালাইতেন। অতঃপর প্রকাশচন্দ্রের পদোন্নতি হইল, তিনি আবগারী ইনস্পেক্টরের পদ পাইলেন। সরকারী চাকরিতে প্রথমে পূর্বোক্ত দুইটি কাজে তাঁহার কাটিয়া গেল প্রায় নয় বৎসর। ওই দুইটি পদেই তাঁহার অসৎ ও অবৈধ উপায়ে নিরাপদে প্রচুর অর্থোপার্জনের সুযোগ-সুবিধা ছিল। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের মতো ধর্মপ্রাণ, সমাজহিতৈষী, লোকসেবক ও আদর্শবাদী যুবকের মনে ওইরূপ লালসা ক্ষণেকের জন্যও স্থান পায় নাই। কর্মদক্ষতা ও সততার জন্য কর্তৃপক্ষমহলে তাঁহার সুনাম ছিল যথেষ্ট। কার্যকালের নয় বৎসর অতীত না হইতেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া (১৮৮৪ খ্রীঃ, জুলাই) পুরস্কৃত হইলেন। সেই উচ্চপদে বহাল থাকিয়া প্রায় ষোল বৎসর কৃতিত্ব ও সুখ্যাতির সহিত তিনি দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর রাজসেবা করিয়া তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টারের পদ পাইলেও অঘোর-পরিবারে ধন সঞ্চয় হয় নাই। কেননা স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই জন্মিয়াছিলেন প্রশস্ত হৃদয় লইয়া। তাঁহাদের পরিবার দুইটি কন্যা এবং তিনটি পুত্রকে নিয়া সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিস্তৃত ও প্রসারিত ছিল অঘোর-পরিবারের পরিধি—যেখানে আত্মীয়-অনাত্মীয়ে স্বজনে-পরজনে কোন প্রভেদ কখনও দেখা যায় নাই, এবং যাহার মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে বহু রুগ্‌ণ, বিপন্ন, শোকার্ত, দীন-দুঃখী ও অনাথ নরনারী। "অঘোর প্রকাশ" গ্রন্থ হইতে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনীর বয়স যখন এগার বৎসর, তখন (১৮৮৩ খ্রীঃ আগস্ট মাসে) তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশা একেবারেই কম ছিল। যাহা হউক পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহার দিন কয়েক পরেই তাঁহাদের ধর্মবন্ধু পরেশ-বাবুর একটি সন্তানের কলেরা হইল। সন্তানটির সেবা-চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই বিষয়ে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"ইহার কয়েক দিন পরে ভাই পরেশের দ্বিতীয় সন্তান কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। যে গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন সেখানে

থাকিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম, তাই তুমি তাঁকে নিজবাটীতে বাহিরের ঘরে আনিলে ও সেবা করিতে লাগিলে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বড় কন্যাটিরও কলেরা হইল। তখন তুমি বড় কন্যাটিকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলে; নিজের শিশু-সন্তানটিকে অন্য বাড়িতে পাঠাইয়া দিলে। সমুদয় সেবার ভার আপনার স্কন্ধে লইলে। অনেক পরিশ্রম ও যত্নের পরে দুটি সন্তানই ভাল হইয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, তুমি কিরূপ স্থিরভাবে এরূপ বিপদের সময় সমুদয় কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পার। এই সকল কার্য করিবার সময় আমাকে কিছু বলিয়া দিতে হইত না। তুমি নিজেই সমুদয় মীমাংসা করিতে, ও যাহা যাহা প্রয়োজন, করিয়া যাইতে। ভাই পরেশ এবং ভগিনী মহালক্ষ্মী এই সূত্রে চিরদিনের জন্য আমাদের আপনার হইয়া গেলেন।

"এইরূপে তুমি সকলকে আপনার করিয়া লইয়া চলিলে। তোমার দ্রুত গতি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। এই তো সবে তপস্যার আরম্ভ হইল। এই ব্রত পালন, এই পরসেবার কাজ, ক্রমশঃ জীবনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সংগ্রাম ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই আবার পরসেবার জন্য নিত্য নব নব আহ্বান আসিতে লাগিল, বিশ্বাসের পরীক্ষাও কঠিন হইতে কঠিন হইতে লাগিল। পরে তোমার সকল সুখ ছাড়িতে হইল, বেশভূষা চলিয়া গেল, মস্তকের কেশ পর্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইল; অর্থ, গৃহ কিছুই আপনার রহিল না।"

ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাব্রত পালনের ঘটনা অঘোরকামিনীর জীবনে অনেক রহিয়াছে। আর একটি ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই:—

৫৭নং ল্যান্স্‌ডাউন রোডে নিজেদের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার বর্তমান বয়স ৮১ বৎসর; তিনি অদ্যাবধি সুস্থ ও কর্মক্ষম আছেন। সাধনচন্দ্র পাটনা কলেজ হইতে আই. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া বোম্বের ভিক্টরিয়া টেক্‌নিকেল্ ইন্‌স্টিটিউটে ইলেকট্রিক্যাল বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভর্তি হন। শিক্ষা-সমাপনান্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তিনি উচ্চ শিক্ষা পাইবার জন্য ম্যানচেস্টারে যান। তথায় "ব্রিটিশ ওয়েষ্টিং হাউস্ ইলেকট্রিক্ কোম্পানি" নামক বিশ্ব-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিজে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। [১৯৫১ **খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে সাধনচন্দ্র পরলোক গমন**

করেন। [তাঁহার একমাত্র সন্তান শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী লোকসভার সদস্যা। অঘোর-প্রকাশের জীবিত তিন সন্তানের মধ্যে সরোজিনী দেবী অন্যতম।]

অঘোর-পরিবারে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইত, ওই সমুদয় নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ সত্ত্বেও কখনও ভঙ্গ করা হইত না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জুন হইতে এই প্রকার একটি নিয়মের প্রবর্তন হইল যে, "স্বামীর বেতনের টাকা অগ্রে গৃহ-দেবালয়ে ঈশ্বর-চরণে নিবেদন করিয়া তাহার পরে ব্যয় করিতে হইবে।" "বালক-বালিকা সকলেই বুঝিতে লাগিল যে, ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত একটি পয়সাও ব্যয় করিতে নাই।" এই ব্রতরক্ষার জন্য পরে অঘোরকামিনীকে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। পুণ্যশীলা ধর্মনিষ্ঠ গৃহকর্ত্রী এই পরীক্ষায় কিভাবে উত্তীর্ণ হইলেন, তাহার বর্ণনা শুনুন প্রকাশচন্দ্রের নিকট হইতে:—

"মতিহারীতে আসিয়াই এক পরীক্ষা দিতে হইল। বাঁকিপুরে ও দেশে টাকা পাঠাইতে হইল। মাসের শেষে টাকা কম হইয়া আসিল। কিন্তু বাজারে ঋণ করা অনুচিত। সুতরাং আহারের বরাদ্দ কমাইয়া আনিতে হইল। এ হিসাবে চলিয়া আগস্ট মাস তো শেষ হইতেই, সেপ্টেম্বরের ১লা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কাটিয়া যাইত। কিন্তু দৈবাৎ ১লা সেপ্টেম্বর ছুটির দিন পড়িল, তাই সেদিন বেতন পাওয়া গেল না। ২রা সেপ্টেম্বর এক বেলার আহার কোনওরূপে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় টাকা আসিল, কিন্তু তাহা তো তখনো দেবালয়ে উৎসর্গ করা হয় নাই; তাই স্পর্শ করা যাইতে পারে না। ৪টি সন্তান, আপনারা দু'জন। আহারের সামগ্রীর মধ্যে ৵২ সের দুধ, ২টি ভুট্টা ও কয়েকটি পদ্মচাকা। ছোট ছেলে বিধান যখন ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পদ্মচাকা আহার করিতে দিলে। দেবি, তুমি অনশনে কাটাইলে; স্বামীকে আধখানি ভুট্টা খাইতে দিলে; অন্য ছেলেমেয়েদের একটু একটু দুধ দিয়া কোনওরূপে রাত্রি অতিবাহিত করাইলে। তোমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম সকালে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া পদ্মফুলে ঘর সাজাইয়া উপাসনা করা গেল। তারপর বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনা হইল। ঈশ্বরের জয়কীর্তি বর্ধিত হইল। তাঁহার উপরে যে প্রাণ-মন দিয়া নির্ভর করে তাহার সকল দুঃখ দূরে যায়, তিনি তাহাকে সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ করেন।"

পূর্বোল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, যখন প্রকাশচন্দ্র দ্বিতীয়বার মতিহারীতে গিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় কার্যে যোগদান করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ, প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ, সান্ন্যাল, উড়িষ্যার মধুসূদন রাও প্রমুখ বিশিষ্ট নায়কগণের স্নেহাশিস লাভে ধন্য হইয়াছিলেন অঘোর-প্রকাশ। কেশবচন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য সজ্জনেরা পাটনায় তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র যখন সাত মাসের শিশু, তখন তাঁহার মাতা ও পিতা ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। অঘোরকামিনীর উপাসনায় অনুরাগ কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"স্বীয় শৃঙ্খলাগুণে তুমি সন্তানাদির আহার সমাপন করিয়া প্রতিদিন সকালে ৮টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া আচার্য মহাশয়ের গৃহে দৈনিক উপাসনাস্থানে চলিয়া যাইতে। অনেক দিন তোমাকে চেষ্টা করিয়া প্রবেশ-দ্বার খোলাইয়া লইতে হইত; অনেক দিন ভাল স্থান পাইতে না; তবু তোমার উপাসনার অনুরাগ কমে নাই। তোমার অনুরাগ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইতেন। আচার্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "নূতন যে মেয়েটি আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমরা উপাসনার অনুরাগ শিক্ষা কর।" তুমি উপাসনার প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত থাকিতে। কেহ কেহ উপাসনা প্রায় শেষ হইবার সময় (নাম পাঠের সময়) আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইহা দেখিয়া তুমি আশ্চর্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।···

"উৎসবান্তে বিদায়ের সময় আচার্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে। প্রণাম করিয়া তুমি বলিলে, "ভুলিবেন না।" আচার্য বলিলেন, "আর কি ভোলা যায়?" নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে ভোলেন নাই। কেন না তাঁহার ভাবে, তাঁহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কাজ করিয়াছিলে। তাঁহার মত তোমারও কাজ করিতে করিতেই মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল।"

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ওই সাধ্বী মহিলা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও "অঘোর-প্রকাশ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"একদিকে যেমন সেবা চলিতে লাগিল, অপর দিকে সাধন ও উপাসনাও পূর্ণ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। তোমার বাড়ির উপাসনা ও উপাসনালয়ের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তোমার নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমাকে মৈত্রেয়ী নাম দিয়াছিলেন। যখন তোমার বিষয়ে কিছু বলিতে হইত, তোমাকে ঐ নামে উল্লেখ

করিতেন। সংসারের কোন কার্যের জন্য কোন দিন তোমার উপাসনা বন্ধ হইত না। কেবল মাত্র আচার্যের প্রার্থনা শ্রবণ করা তোমার ধর্ম ছিল না। জীবনের শেষ দশ বৎসর প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে ভুল নাই।"

উড়িষ্যার মধুসূদন রাও একবার অঘোর-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"রাজগৃহ হইতে বাঁকিপুর ফিরিবার কিছুকাল পরেই উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তোমার গৃহখানি দেখিয়া বলিলেন, "ওই তো তীর্থ। গয়া কাশী ঘুরিয়া আসিলাম, এমন তীর্থ তো আর কোথাও দেখি নাই।" রাওজী প্রাতঃকালে উপাসনায় বসিয়াছেন, উপাসনার পরেই গয়া যাত্রা করিবেন। যাত্রার সময় প্রাতঃকাল ৭টা। এই সময়ের মধ্যে উপাসনার পূবে তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া রান্না আরম্ভ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলে, যে আহার প্রস্তুত হইলে তৎপ্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যেমন উপাসনা হইল, অমনি আহারের স্থান প্রস্তুত হইল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়িতে দ্রব্যাদি উঠিতে লাগিল। বন্ধু রাওজী আশীর্বাদ করিতে করিতে আহার করিলেন। তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমরা কত কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার আতিথ্যে সরলতা ও আদর মিশান থাকিত বলিয়া সে আতিথ্য গ্রহণে কাহারও সঙ্কোচ হইত না।"

অঘোর-প্রকাশ একসঙ্গে ভারতবর্ষের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। একবার উভয়ে কার্সিয়ং পর্বতে যাইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। প্রকাশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—
"মহর্ষির উজ্জ্বল ভাব, তাঁহার উৎসাহ ও আমাদের প্রতিজনের প্রতি সম্ভাষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলে।"

অঘোরকামিনীর কর্মবহুল জীবনে একটা বৈশিষ্ট্য এই—তাঁহার দৈনন্দিন কার্যক্রমে এত অধিক কাজ থাকিত যে, একজনের পক্ষে সেই সমুদয় সুসম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কর্তব্যবোধের সঙ্গে তাঁহার শৃঙ্খলা-জ্ঞান ও নিয়মানুবর্তিতা সমতালে চলিত বলিয়া একটি কাজও অসম্পন্ন থাকিত না। কর্তব্য-পালনে তাঁহার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং বহুমুখী। প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"দেবি, এই সময়ে আমাদের দৈনিক জীবন কিরূপ তপস্যাময় ছিল, তাহা কি তুমি স্মরণ কর না? প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পূর্বে তুমি আমার সহিত সমস্বরে মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে। তারপর তুমি স্বহস্তে উপাসনার ঘর প্রস্তুত করিতে। এ কাজ অন্যের উপর ফেলিয়া রাখিতে না। নিষ্ঠার

সহিত আসন পাতিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে। উপাসনার পর প্রতিদিন একটি ছোট প্রার্থনা করিতে। তারপরেই রন্ধনশালার কাজে যাইতে। ছেলেদের আহার করাইতে ও পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। নিজেকেই রন্ধন করিতে হইত; পাচক-ব্রাহ্মণের জন্য সকল সময় অর্থে কুলাইয়া উঠিতে পারিতে না। ইহারই মধ্যে কোনও সময়ে প্রতিবেশী দুই তিনটি গৃহস্থের সংবাদ লইতে এবং সাধ্যমতে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে। বৈকালে কিছু পাঠ করিতে, ও কোথাও যাইবার হইলে যাইতে। সন্তানদের আহার পরিচ্ছদ সর্বদা তুমি নিজেই দেখিতে। সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির আহারের আয়োজন হইত এবং পূর্বেই ছোটদের আহার করাইয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। তারপর আমরা দুজনে নাম-গান করিতাম। নূতন যে সাধন করিবার থাকিত, করিতাম। আহারাদির পর আবার প্রসঙ্গ হইত।”...

প্রাত্যহিক কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইহা হইল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা—যখন সেই ধর্মশীলা নারীর পুণ্যপূত জীবনের ২৮ বৎসর চলিতেছিল। তাঁহার জীবনের শেষ দিকে কাজের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। ইহার আট বৎসর পরের অর্থাৎ (১৮৯২ খ্রীঃ) দৈনিক কার্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাঁহার সতীর্থ, সহকর্মী ও জীবনসঙ্গী প্রকাশচন্দ্র, উহার আংশিক উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ—

“তোমার দৈনিক পড়িলে বুঝা যায়, এই সময়ে তোমার কাজ কত বাড়িয়া চলিল। একদিনের কতগুলি কাজের তালিকা এই। (১) ছেলেদের আহার দেখা, (২) পাঠ, (৩) উপাসনা, (৪) রোগীর সেবা, (৫) স্কুলে যাওয়া, (৬) ধোপার বস্ত্র লওয়া ও দেওয়া, (৭) দেখা করা, (৮) লেপ প্রস্তুত করা, (৯) নূতন বন্ধুর বাটীর সংবাদ লওয়া, (১০) পূজার বন্দোবস্ত করা, (১১) এষ্টিমেট করা এবং বেতন দেওয়া। দেখিতে ও শুনিতে হয়তো সহজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের পক্ষে এ অনেক কাজ। ইহার মধ্যে দেখা করাটা একটা বিশেষ কাজ ছিল। নূতন কোন বন্ধু আসিলে একবার যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিত। কেননা নূতন স্থানে কেহ আসিলে তাঁহাকে কত অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহা তুমি বিলক্ষণ বুঝিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে ও সাহায্য করিতে।

“পাছে বাহিরের বড় বড় কাজে মন গেলে সংসারের কর্তব্য ভাল করিয়া করা না হয়, তাই সদাই তুমি চিন্তিত হইতে। ছেলেরা কি

খাইল কি না খাইল, তার তত্ত্বাবধান করিতে তুমি সদাই সযত্ন হইতে। সেইজন্য ছেলেদের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে ভালবাসিতে।”

সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করাকে পতি-পত্নী উভয়ই ধর্মসাধনার সমতুল্য অবশ্য-করণীয় ও পবিত্র কর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেই কারণে তাঁহারা কোন দিনই কর্ম হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে চাহেন নাই। দেবারাধনায় ধ্যানমগ্ন থাকার ন্যায় লোকহিতার্থ কর্মমগ্ন থাকার মধ্যেও তাঁহারা অপূর্ব আনন্দ পাইতেন।

ওই মহীয়সী মহিলা তাঁহার স্বামীর মতোই নির্ভীক ছিলেন। অতি সাংঘাতিক বিপদ আসন্ন দেখিয়াও তাঁহারা কখনও হতবুদ্ধি হইতেন না কিংবা ভয় পাইতেন না। স্বামী-স্ত্রীকে জীবনে সেইরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল একাধিকবার। একটি ঘটনা “অঘোর-প্রকাশ” গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“নয়াটোলার বাটীতে থাকিতে একবার তোমার পার্শ্বের খোলার ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। তখন তোমার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ঈশ্বর-স্মৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিবা মাত্র তুমি উপরের ঘরে আসিলে, একখানা বড় সতরঞ্চি ছিল, সেখানাকে স্নানের ঘরের জলে ভিজাইয়া, জানালা দিয়া সেই জ্বলন্ত চালে নিক্ষেপ করিলে, তার উপর বালতি করিয়া জল দিতে দিতে অগ্নি নির্বাণ হইল। যখন সতরঞ্চি নিক্ষেপ কর, তখন মুখে কেবল ‘মা’ ‘মা’ বলিতেছিলে।”

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রকাশচন্দ্র ঘটনাটির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই :—

“১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাই পরেশনাথের* সঙ্গে তুমি ও আমি সিমলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আগ্রার তাজমহল দর্শন করিলাম ও যমুনাতে স্নান করিলাম। অম্বালা হইতে দুখানা এক্কা করিয়া যাত্রা করিলাম। একখানিতে ভাই পরেশ ও আর একখানিতে আমরা দুজন। আমাদের এক্কা চালক গিয়া পরেশের এক্কাতে উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সারথির কার্য করিতেন ও অর্জুনের সঙ্গে সদালাপ করিতেন। যখন কালকার কাছে আসিলাম, তখন পরেশের

* শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে জানিলাম, কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার কর্নেল করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় ইঁহার পুত্র।

ঘোড়া ক্লান্ত হইয়া কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের একাখানি তখন উচ্চে উঠিতেছিল। এমন সময়ে একটি বৃহৎ চামড়া-বোঝাই গর্দভ এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যাইতেছিল। গর্দভের আকার দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা বৃহৎ বাঘ যাইতেছে। যেমন দেখা, অমনি আমাদের একার ঘোড়া ভয় পাইয়া দ্রুতবেগে পশ্চাৎ ফিরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। দুই দিকে গভীর খাদ, সম্মুখে নিম্নভূমি, অশ্বের অদম্য গতি সামলায় কে? আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাশ টানিয়া রাখিয়াও অশ্বের গতি রোধ করিতে পারিলাম না। রজ্জুহস্তে একার উপর শুইয়া পড়িলাম, তবু অশ্ব অদম্য বেগে চলিতে লাগিল। তুমি তখন ভয় না পাইয়া আমার সাহায্য করিতে লাগিলে, তুমিও রাশ টানিতে লাগিলে; অশ্বের গতি দমন হয় না। এই ভাবে কয়েক মিনিট চলিল। আমরা মুখে "মা! মা!" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল, মৃত্যু নিকবর্তী। এমন সময় একা-ওয়ালা আমাদের সাহায্য করিতে আসিল। অশ্বের গতি রোধ হইল, আবার আস্তে আস্তে ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম।"

সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বিধানচন্দ্রের জন্মের পরেই পতি-পত্নী উভয়েই সংকল্প গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহাদের আর সন্তান হইবে না। সংকল্প গ্রহণের হেতু সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্মসাধনে ব্যাঘাত হয় তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর নিকট রাখিয়া যাইতে হয়; কিন্তু অতি শিশু-সন্তানকে তো রাখিয়া যাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে গর্ভস্থ সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, একথা সদাই বলিতে। এইবার তাই আমরা সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না।"...

প্রতিজ্ঞা-রক্ষা-কল্পে প্রথমে তাঁহারা "দুজনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ" করিলেন। স্থির হইল যে, "ছয় মাস শরীরের সম্পর্ক থাকিবে না।" পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রতচারী দম্পতি সেই দুঃসাধ্য ব্রত পালন করিলেন। নির্দিষ্ট কাল অতীত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ব্রত গ্রহণ করিলেন তাঁহারা চিরজীবনের জন্য। তখনও তাঁহারা যৌবন-সীমান্ত অতিক্রম করেন নাই। তৎকালে পতির বয়স ছিল ৩৪ বৎসর, আর পত্নীর বয়স ছিল ২৬ বৎসর। পরমেশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভরকে সম্বল করিয়া, পুণ্যাত্মা সাধক-সাধিকা ধর্মার্থ সেই মহাব্রত পালন করিয়াছেন

মৃত্যুকাল অবধি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত। একালে দুইটি গৃহীর ওই সার্থক মহাব্রত পালন আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে—সেকালে প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষি ও ঋষি-পত্নীর ব্রত-পূত সংযম নিয়মিত জীবনের কথা। সাধিকা দেবলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন ৪০ বৎসর বয়সে। ইহার প্রায় পনর বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর) ৬৪ বৎসর বয়সে সাধকের জীবনাবসান হইয়াছে পাটনায় নয়াটোলা অঞ্চলে নিজ বাস-ভবনে। গৃহের যে প্রকোষ্ঠ প্রকাশচন্দ্রের সাধ্বী পত্নীর পুণ্য-স্মৃতিতে পবিত্র, সেখানেই তাঁহার অন্তিম শয্যা রচিত হইয়াছিল। রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে যে এগার বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাহা বিশ্রাম-সুখের মধ্য দিয়া কাটান নাই। নিজের সাধনা ব্যতীত তিনি ধর্মবন্ধুদের আধ্যাত্মিক জীবনের তত্ত্ব লইতেন এবং কখনও কখনও তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া অল্পকালের জন্য থাকিতেন; আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিতেন এবং অভাবগ্রস্ত ও দুর্গত প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। পাটনাতেই তিনি স্থায়িভাবে থাকিতেন এবং তথা হইতে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্যটন করিতেন। সেই এগার বৎসর কাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিধানমতে যে সকল প্রার্থনা করিতেন এবং প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিতেন, তৎসমুদয় অনুলিখিত হইত। "সাধনা" নামে সেইগুলি পুস্তিকাকারে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সাধনায় আছে ভক্ত সাধকের ভক্তি উচ্ছ্বসিত অন্তর্বাণীর প্রকাশ। পুণ্যবতী ভার্যার চিতাভস্মাধার তাঁহাদের নয়াটোলার বাড়ীতে প্রোথিত আছে, পুণ্যবান স্বামীর অন্তিমকালীন বাসনা পূরণার্থ তাঁহার চিতাভস্মও ওই আধারে রাখিয়াই প্রোথিত হইয়াছে। অঘোরকামিনীর স্থাপিত ও পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনার ভার নিয়াছেন বিহার সরকার। এই শিক্ষায়তনে এখন স্কুল ও কলেজ দুই-ই চলিতেছে।

অঘোর-প্রকাশের মতো দম্পতি বর্তমান যুগে দুর্লভ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না; তাঁহাদের হৃদয়, মত ও পথের এমনিই মিল ছিল যে, দুইজনকে অভিন্ন-হৃদয় অভিন্ন-মত এবং অভিন্ন-পন্থী বলিয়া নিঃসঙ্কোচে বিশেষিত করা যাইতে পারে। গৌরীশঙ্কর বা সীতারামের ন্যায় অঘোর-প্রকাশের পারস্পরিক অনুরাগ ছিল অনাবিল ও গভীর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটি প্রাণী একাত্ম হইয়া যেন জীবন-নাট্য-মঞ্চে বাজিতেন একতন্ত্রী-রূপে। সেই একতন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইত একই তান, গীত হইত একই গান।

চতুর্থ অধ্যায়

বিধানচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর

বিধানচন্দ্রের, তাঁহার বড় দাদা সুবোধচন্দ্রের এবং মেজ দাদা সাধনচন্দ্রের পাঠশালা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষালাভ হইয়াছিল পাটনাতেই, পাঠশালার শিক্ষা শেষ হওয়ার পরে তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন প্রথমে টি. কে. ঘোষ ইনষ্টিটিউসনে এবং তৎপর পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে ও কলেজে। নিজপরিবারে থাকিয়াই তাঁহারা লেখাপড়া করিয়াছেন। ছেলেদের শিক্ষার জন্য কোন দিন গৃহশিক্ষক রাখা হয় নাই; কারণ প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেঃ কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হওয়ার পরেও তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা এমন হয় নাই যে, গৃহশিক্ষক বা টিউটারের অতিরিক্ত ব্যয় তিনি বহন করিতে পারেন। বিশেষতঃ অঘোর-পরিবারের নিয়ম ও শিক্ষা এরূপ ছিল যে, আয় অনুসারে ব্যয়ের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কোন অবস্থায়ই ধার করিয়া খরচ করা হইবে না। বাল্যকাল হইতেই সন্তানেরা দেখিতেন—মাতাপিতার শুদ্ধ, সংযত, নিয়মিত, সরল, অনাড়ম্বর, মিতাচারী ও সুশৃঙ্খল জীবন। তাহা সন্তানদের নিজ নিজ জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

গুরু-দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজকার্য সম্পন্ন করিতে হইত বলিয়া প্রকাশচন্দ্রের উপর কাজের চাপ পড়িত বেশী। স্বামীর কর্মভার লাঘব করিবার জন্য অঘোরকামিনী নিজে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কাজটাও দেখাশুনা করিতেন। মাতাপিতার প্রভাব এবং পারিবারিক পরিবেশ এমনই ছিল যে, ছাত্র-জীবনের দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের জন্য ছেলেদের শাসাইবার কিংবা তিরস্কার করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। আপনা হইতেই তাঁহারা প্রতিদিন নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন। এইভাবে শিক্ষা পাইয়া বিধানচন্দ্র প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স (বর্তমানের ম্যাট্রিকুলেসন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, এবং পাটনা কলেজ হইতে এফ. এ. (বর্তমানের আই. এ.) ও বি. এ. পাস করিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি অনার্স পাইলেন অঙ্ক-শাস্ত্রে। পাটনায় ছাত্রজীবনে বিধানচন্দ্র উচ্চাঙ্গের মেধাবী বলিয়া খ্যাত না হইলেও, সাধারণ ছাত্রের অপেক্ষা তাঁহার মেধা যে উচ্চতর ছিল, তাহা তৎকালেই প্রকাশ পাইয়াছে।

অঘোর-পরিবারে প্রত্যুষে পরিবারের ছোট-বড় সকলকেই গৃহ-দেবালয়ে

বসিয়া উপাসনা করিতে হইত। বাড়ীর একটি কক্ষ উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিধানচন্দ্রের বড় দাদা সুবোধচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের পিতা ও মাতা প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপর বসিয়াই গার্হস্থ্য বিষয় লইয়া কথাবার্তা বলিতেন, তখনই উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় সেই দিনের কার্যক্রম স্থির করা হইত। তারপরে ঘণ্টা বাজানো হইত সকলকে জাগাইবার জন্য। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এবং পরিবারে আশ্রিত বালক-বালিকারা সকলে অনতিবিলম্বে উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিতেন। প্রথমে সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করিতেন একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃত শ্লোক। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে গীত হইত একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত এবং তারপর উপাসনা হইত। ইহা ছিল অঘোর-পরিবারের অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন কায। পূর্বোক্ত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্বঃ কার্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্॥
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।
যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতম্॥"

বঙ্গানুবাদ এই :—আগামী দিবসের কার্য অদ্যই সম্পন্ন করা উচিত এবং অপরাহ্ণের কার্য পূর্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা কর্তব্য। মানুষের কোন কার্যটি সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কোন্ কাযটি সম্পন্ন করা হয় নাই, তাহা বিচার করিয়া মৃত্যু অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে। কাহার যে অদ্য মৃত্যু ঘটিবে, তাহা কে জানে। সুতরাং যৌবনেই মানুষের ধর্মশীল হওয়া বিধেয়, যেহেতু মানব-জীবন অনিত্য।

ওই শ্লোকগুলি আচার্য কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত "শ্লোক-সংগ্রহ" নামক পুস্তক হইতে প্রাত্যহিক আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হইয়াছিল। "শ্লোক-সংগ্রহ" পুস্তকে বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে যে শ্লোকাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয় আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সাধনে এবং নৈতিক চরিত্রগঠনে সহায়ক। সেইজন্য অধিকাংশ ব্রাহ্ম-পরিবারে ওই পুস্তকখানি ধর্মগ্রন্থের আসন পাইয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি গৃহীত হইয়াছে মহাভারতের শান্তি পর্ব হইতে। সকলেই শ্লোকের মর্ম অবগত ছিলেন; যেহেতু অঘোর-পরিবারে বালক-বালিকাদের কোন শ্লোক বা স্তোত্র মুখস্থ করিতে উপদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে উহার মর্মও বুঝাইয়া দেওয়া

হইত। ওই সারগর্ভ শ্লোক দুইটির মধ্যে নিহিত আছে বিধানচন্দ্রের জীবন-দর্শনের মূল-তত্ত্ব। তিনি শ্লোক-ধৃত নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার জীবন গঠনে এবং কর্মধারা নিয়ন্ত্রণে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবোধচন্দ্র মনে করেন, বিধান যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাশি-রাশি কাজের মধ্যে পড়িয়া তৎসমুদয় সুসম্পন্ন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, উহার প্রধান কারণ উল্লিখিত নীতির অনুসরণ। এই বিষয়ে আমরাও তাঁহার সঙ্গে একমত। সুবোধচন্দ্র বলেন :—

"সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে খোঁজ, নিন, দেখবেন বিধানের কোন কাজ মুলতবী রাখা হয় নি। ফাইলের পর ফাইল এসে জমেছে, কিন্তু একটিও পড়ে থাকবে না কালকের জন্যে। যে সময়ের ভেতর ওগুলো ডিস্‌পোজ্‌ অব্‌ করা দরকার, তার আগেই কাজ শেষ করে রেখেছে। কালকের জন্যে একটা ফাইলও সময় নেই অজুহাতে কখনও পড়ে থাকবে না। কলকাতার মতো একটা বড় সিটিতে বিধানের ডাক্তারিতে খুব বেশী পসার যখন, তখনও সেই একই নীতি ছিল তার কাজ করার। তিন জন ডাক্তার-অ্যাসিস্টেণ্ট্‌ বিধানের কাজে সাহায্য করতেন, ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তাঁরা। কিন্তু বিধানকে রোগীর পর রোগী দেখে ক্লান্ত হতে কেউ কোন দিন দেখেন নি। আজ বড় ক্লান্ত বা সময় নেই, এসব কথা বলে কোন রোগীকে কাল আসতে বলা হত না। যেসব রোগী এসে গেছেন, কিংবা যাঁদের আসবার জন্যে বলে দেওয়া হয়েছে, যত সময়ই লাগুক, তাঁদের সেদিনই দেখা চাই।"

সুবোধচন্দ্র এবং বিধানচন্দ্র—দুই ভাইয়েরই আজ পর্যন্ত মুখস্থ আছে ওই শ্লোক দুইটি। সুবোধচন্দ্র আমাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বঝাইয়া দিলেন। আমি লিখিয়া নিলাম। পরে তিনি সেল্‌ফ্‌ হইতে "শ্লোক-সংগ্রহ" পুস্তকখানা টানিয়া লইয়া শ্লোকের পৃষ্ঠাটি খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন।

বাল্যকালে জ্ঞান সঞ্চার হওয়া অবধি বিধানচন্দ্র দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মাতা কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে, রুগ্‌ণ আর্ত ও দুর্গত জনের সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার পিতাও সেই কার্যে মাতাকে কত প্রকারে সাহায্য করিতেছেন। জাতি, ধর্ম কিংবা শ্রেণী বিচার না করিয়া মাতা-পিতা প্রতিবেশী গরীব-দুঃখীর কষ্ট ও দুর্গতি দূর করিবার জন্য কত রকমে সাহায্য করিয়াছেন দিনের পর দিন, তাহাও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। কৈশোরে জ্ঞানবৃদ্ধির এবং বিচার-বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিলেন—

তাঁহার জনক-জননীর হৃদয় কত প্রশস্ত, করুণায় পরিপূর্ণ ও পরদুঃখে কাতর। ধর্মপ্রাণ, লোক-হিতব্রত ও দানশীল মাতা-পিতা সন্তানদের জন্য ভোগ করিবার মতো কোন সঞ্চিত ধন রাখিয়া যান নাই; কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন ওই অমূল্য ধন—হৃদয়ের মহৎ গুণগ্রাম—যাহার কতক সবকনিষ্ঠ সন্তান বিধানও পাইয়াছেন যেন উত্তরাধিকারসূত্রে। পরিণত বার্ধক্যেও তিনি যে দেশবাসীর সেবায় নিমগ্ন হইয়া আছেন ধ্যান-সমাহিত যোগীর মতো, ইহার মূলে রহিয়াছে অঘোর-প্রকাশের চরিত্র-প্রভাব। অঘোর-পরিবারে বিধানচন্দ্রেরা পাঁচটি ভাই-ভগিনী ব্যতীত আরও কয়েকটি আত্মীয়-অনাত্মীয় বালক-বালিকা থাকিতেন। সকলের জন্য খাওয়াপরার সমান ব্যবস্থা ছিল। পরিবারের কর্তা ও গৃহিণীর ব্যবহারও ছিল সকলের প্রতি একই রকমের, কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। বিধানচন্দ্র উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সন্তান বটে, কিন্তু ওইভাবে সকলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করার দরুন এবং মাতা-পিতার নিকট হইতে সমান ব্যবহার পাওয়ার ফলে তাঁহার মনে কোন প্রকার অহংকারের ভাব স্থান পায় নাই। এই অহংকারশূন্যতা ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাঁহার সমগ্র জীবনে। ইহা তাঁহার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কলিকাতার মতো মহানগরীর প্রতিযোগিতাপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, পরাধীন ভারতে বিপদ-সঙ্কুল রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং স্বাধীন ভারতে সমস্যা-কণ্টকিত রাজ্যশাসন-ক্ষেত্রে—সর্বত্রই বিধানচন্দ্র অধিষ্ঠিত হইয়াছেন যশ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে। তথাপি তাঁহার আবাল্য-সঞ্জাত সেই নিরহংকার বা নিরভিমান ভাবের লোপ পায় নাই।

অঘোর-পরিবারে বিধান সবকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার জন্মের পরে সাধ্বী জননী স্তন্যপায়ী শিশুটিকে কোলে লইয়া শিশু-শিরে হাত রাখিয়া স্বামী-স্ত্রীর 'আত্মিক মিলন-ব্রত' অর্থাৎ ভোগ-মুক্ত দেহে জীবনযাপনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন; সাধু জনকও একই ব্রতে ব্রতী হন। পরমেশ্বরের করুণায় সাধু-সাধ্বী সেই কঠোর দুঃসাধ্য ব্রত পরম নিষ্ঠার সহিত আজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিধানের জীবনের সঙ্গে ব্রতচারী মাতা-পিতার জীবনের পুণ্য-স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। মাতৃদেবীর মহাপ্রয়াণ-কালে বিধান ছিলেন চৌদ্দ বৎসরের কিশোর। প্রকাশচন্দ্র মাতৃহীন কিশোর পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে বিধানের বিদ্যার্থিজীবনে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি দেখিতে পাইয়া তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মেডিকেল কলেজে বিদ্যার্থী

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিধানচন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এবং বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে ভর্তি হইবার জন্য দরখাস্ত পাঠাইলেন। একই দিনে বিভিন্ন সময়ে পূর্বোক্ত কলেজ দুইটিতে ভর্তি হইবার অনুমতি-পত্র আসিল। মেডিকেল কলেজের অনুমতি-পত্র প্রথমে পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তথায় ভর্তি হইলেন। হয়তো ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন, সেইজন্য ওইরূপ ঘটিয়াছিল। কেননা ভাবীকালে বিধানচন্দ্র ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এমন কি পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান ও পারদর্শিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুবিদিত। বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহার জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হইল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন-কালে। এতকাল তিনি বাস করিয়াছেন পাটনা (বাঁকিপুর), মতিহারী, গয়া প্রভৃতি শহরে আপন পরিবারের ভিতরে। এখন আসিলেন পারিবারিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতার নাগরিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ নবাগতের মনে যে অসহায় ভাবের সৃষ্টি হয়, যুবক বিধানের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল। সেই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি ওয়াই এম. সি. এ. পরিচালিত ছাত্রাবাসে (কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মিলনস্থলের পার্শ্বে) থাকিয়া পড়িতেন। মেডিকেল কলেজে পড়া তখনও ব্যয়সাধ্য ছিল। তাঁহার পিতা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে পিতাকে অন্য দুই পুত্রের (সুবোধ ও সাধনের) বিলাতে পড়ার খরচ চালাইতে হইত। সুতরাং বিধান পড়ার খরচ বাবত যে টাকা প্রতি মাসে পিতার নিকট হইতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার চলিত কষ্টেসৃষ্টে। পিতার আর্থিক অনটনের অবস্থা জানা ছিল বলিয়া পিতৃভক্ত পুত্র ক্লেশ-ভোগ সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনও টাকা-পয়সার জন্য চাপ দিতেন না। বিশেষতঃ মিতাচার এবং নির্বিলাস, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল অঘোর-পরিবারের শিক্ষা। তিনি জীবনে কোন দিন ভুলেন নাই সেই শিক্ষা। উত্তরকালে স্বোপার্জিত অর্থের প্রাচুর্যও ওই

শিক্ষার প্রভাবকে কিছুমাত্র ব্যাহত করিতে পারে নাই। ইহার ফলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিধানচন্দ্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলেন।

তখনকার দিনে মেডিকেল কলেজে এল্. এম্. এস্. কিংবা এম্. বি. ডিগ্রি পাইতে হইলে পাঁচ বৎসর পড়িতে হইত। বিধানচন্দ্র ওই পাঁচ বৎসরের ভিতর পাঁচ টাকা মূল্য দিয়া কেবল একখানা পাঠ্য-পুস্তক কিনিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, কতটা আর্থিক অনটনের মধ্যে তাঁহাকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল পড়াশুনা করিতে হইয়াছিল। কখনও কখনও তিনি অবস্থাপন্ন সহাধ্যায়ী বন্ধুদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক চাহিয়া লইয়া তাহা হইতে টুকিয়া নিতেন এবং কলেজ-লাইব্রেরীর পুস্তক নিয়া পড়িতেন। জীবন-যুদ্ধের আরম্ভেই প্রথম যৌবনে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইল দারিদ্র্য এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে। যুবক বিধান আশা ও উৎসাহে বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন স্বীয় লক্ষ্যের দিকে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বিধানচন্দ্রের শিক্ষানুরাগ, একাগ্রতা, মেধা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী দুইজন অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইঁহাদের মধ্যে একজন শস্ত্র-চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক কর্নেল চার্লস এবং অন্যজন বরিষ্ঠ শারীর-স্থান প্রদর্শক দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল বসু। এই সহৃদয় ও স্নেহশীল অধ্যাপকদ্বয় অবগত হইলেন তাঁহার আর্থিক অভাব-অনটনের বিষয়। শস্ত্র-চিকিৎসার্থ কোন রোগীর বাড়ীতে যাইয়া অস্ত্রোপচার করার কালে তাঁহারা বিধানকে পুরুষ-সেবক (male nurse) কিংবা ছাত্র-সহকারী (student assistant) স্বরূপ কাজ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেই কাজ করিয়া তিনি যে ফী বা পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতে তাঁহার অর্থাভাব-জনিত কষ্ট ও অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইল। এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। সকাল আটটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা খাটিয়া তিনি আট টাকা উপার্জন করিতেন। শীতকালে এইরূপ উপার্জন হইত বেশী, কেননা শস্ত্র-চিকিৎসার উহা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়। যদিও বিধান দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতেই চার বৎসরের জন্য একটা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তথাপি এইভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন না করিলে তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের ব্যয় বহন করিতে পারিতেন না।

শিক্ষক এবং ছাত্র সকলেই বিধানকে ভালোবাসিতেন। কোন কোন শিক্ষক তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। তাঁহারা সেই সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন।

তরুণ বিদ্যার্থীর মধ্যে যে প্রতিভা এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো প্রচ্ছন্ন ছিল, উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অনুকূল আবহাওয়া পাইয়া তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে একদিন বিধান ও তাঁহার কয়েকজন সহাধ্যায়ী শারীর-স্থান গৃহে (Anatomy Hall-এ) শব-ব্যবচ্ছেদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তদানীন্তন অধ্যক্ষ বোমফোর্ড শারীর-স্থান প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া পরিদর্শনার্থ তথায় প্রবেশ করিলেন। সুদক্ষ চিকিৎসক এবং বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহাকে গৃহমধ্যে দেখিবামাত্র শব-ব্যবচ্ছেদ-রত বিদ্যার্থিগণ সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রত্যেকেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তন্মধ্যে কেবল বিধানই ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি পূর্ববৎ ধীর-স্থির থাকিয়া একাগ্রচিত্তে আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। অধ্যক্ষের দৃষ্টি পড়িল সেই দিকেই। তিনি লক্ষ্য করিলেন শিক্ষার্থী যুবকটির কর্তব্যানুরাগ ও একাগ্রতা। তৎক্ষণাৎ বোমফোর্ড বিধানের টেবিলের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন মুখোমুখী হইয়া। বিধান মাথা তুলিয়া চাহিতেই তিনি সস্নেহ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি একজন ভালো ছাত্র ?—"Are you a good student ?" প্রশ্নটির কি উত্তর দিতে হইবে ঠিক করিতে না পারিয়া বিধান রহিলেন চুপ করিয়া। তখন শারীর-স্থান প্রদর্শক (Demonstrator of Anatomy) বিধান সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা অধ্যক্ষকে বলেন। শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিধানকে কহিলেন :—আমরা তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি, বাবু।—"We expect many things from you, Babu." বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সেই স্বতঃ-ব্যক্ত আশা ছাত্রটিকে অভীষ্ট লাভে উৎসাহ দিল এবং তাঁহার আত্মবিশ্বাস ও সংকল্প দৃঢ় করিল। শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী অধ্যক্ষের সেই আশা নিষ্ফল হয় নাই।

সেই বৎসরেই আর একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয়, প্রভাবশালী ও হৃদয়বান ইংরেজ অধ্যাপকের সস্নেহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ওই তরুণ বিদ্যার্থীর প্রতি। তিনি হইলেন মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ (Principal) কর্নেল লিউকিস্—যিনি বিধানের সমগ্র জীবনের উপর অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন, এবং যাঁহার স্নেহ, গুণগ্রাহিতা, উপদেশ, সাহায্য ও সহযোগিতা হইল বিধানের অগ্রগতির পথে অমূল্য পাথেয়। উদার-চরিত স্বাধীন ব্রিটিশ জাতির বহুগুণের সমাবেশ ছিল সেই অধ্যাপকের চরিত্রে। জাতি-বিদ্বেষে কখনও তাঁহার মন কলুষিত হয় নাই। তৎকালে

পরাধীন ভারতে কিছুকাল বাস করার পরেই অনেক নবাগত ব্রিটেনবাসীর মনস্তত্ত্ব বদলাইয়া যাইত। অধিকাংশ ভারত-প্রবাসী ইংরেজ আপনাদিগকে রাজার জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন এবং ভারতীয়গণকে দাস-জাতি বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহাদের কথাবার্তায়, চাল-চলনে এবং বিশেষ করিয়া ভারতবাসীর সহিত আচার-ব্যবহারে সেই প্রভু-মনোভাব প্রকাশ পাইত পূর্ণমাত্রায়। ওইরূপ মনোভাবাপন্ন ইংরেজদের ধারণা ছিল যে, ভারতের অধিবাসিগণকে ব্রিটিশ প্রভুত্বের নিকট মাথা নত করিয়া থাকিতে হইবে চিরকাল। কিন্তু কর্নেল লিউকিস্ ছিলেন সেই শ্রেণীর ইংরেজের ব্যতিক্রম। ছাত্র-জীবনে এবং রাজ-কর্মচারীরূপে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গেই বিধানের পরিচয় ও সংযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি যদি কর্নেল লিউকিসের মতো ব্যক্তির সস্নেহ দৃষ্টিতে না পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হইত প্রতি পদক্ষেপে।

বিধানচন্দ্রের জীবনে উন্নতির মূলে রহিয়াছেন তাঁহার ওই সদাশয়, গুণগ্রাহী, লোকহিতৈষী ও উদারচরিত শিক্ষাগুরু মনীষী কর্নেল লিউকিস, এ-কথা তিনি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ভক্ত ছাত্র-শিষ্য শিক্ষা-গুরু কর্নেল লিউকিসের প্রসঙ্গে বলেন :—"তিনি ছিলেন আমার জীবনের চালক ও প্রেরণা-দাতা, আমার মধ্যে তিনি মনুষ্যত্বের বিকাশ করিয়াছেন, আমার আত্মসম্মান-জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহাকে দিয়া, আমার ভিতরের সুপ্ত শক্তিগুলিকে তিনি সজাগ করিয়া দিয়াছেন, এবং স্বদেশের হিতার্থে সেবা-ব্রত গ্রহণে তিনি আমাকে দীক্ষিত করিয়াছেন ; সেইজন্য আমার পরামর্শ-গৃহে (consultation room-এ) বসিবার আসনের সম্মুখে আমি তাঁহার প্রতিকৃতি রাখি।" ইহা হইতে বিধানের শিক্ষা-গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যে কত গভীর ছিল, তাহার কিছুটা পরিচয় মিলিবে। তাঁহার মধ্যে স্বাজাতিকতার (ন্যাশনালিজমের) ভাবও সঞ্চারিত করিয়া দিলেন ওই মহামতি ইংরেজ শিক্ষাব্রতী। স্বদেশী আন্দোলন উহার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করিল। বিধান যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তখন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আরম্ভ হয় ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদে ওই আন্দোলন। ইহাকে বাংলার নব-জাগৃতির (Renaissance-এর) আন্দোলনও বলা হয়। বাঙ্গালীর রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আসিল এক বিস্ময়কর দ্রুত পরিবর্তন! স্বদেশী আন্দোলন বাংলার ছাত্র ও যুবসমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। তাহা বিধানকেও

আকৃষ্ট করিল সত্য, কিন্তু তিনি অন্য এক শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের মতো মাতিয়া যান নাই। কেননা তিনি ইহা ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তিনি দেশ, সমাজ ও জাতির যথেষ্ট সেবা করিতে পারিবেন। তাঁহার পরমহিতৈষী শিক্ষা-গুরু কর্নেল লিউকিসের মতে,—ভারতের ন্যায় দারিদ্র্য-পীড়িত বিরাট দেশে হৃদয়বান ও স্বজাতি-বৎসর ভারতীয় সুচিকিৎসকের প্রচুর অভাব আছে। বিধানের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, দেশের সেই অভাব পূরণে তিনি তো কতকটা সাহায্য করিতে পারেন। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনের বন্যাপ্রবাহে তিনি নিজেকে ভাসিয়া যাইতে দিলেন না, অধ্যয়নকে অপরিহার্য কর্তব্য জানিয়া তাহাতেই পূর্বের ন্যায় নিরত রহিলেন।

কেবল পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রি পাইলেই যে আদর্শ চিকিৎসক হওয়া যায় না, ইহা বিধান তাঁহার শিক্ষা-গুরুর মুখে বহুবার শুনিয়াছেন। সেই সত্যটি তাঁহার মনে ভাল করিয়া গাঁথা রহিয়াছে। কর্নেল লিউকিস্ বিধানকে আদর্শ চিকিৎসকের নীতি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে,—চিকিৎসকের চাই এমন অন্তঃকরণ, যাহা কখনও কঠিন হইবে না ; চাই এমন প্রকৃতি, যাহা কখনও ক্লান্ত হইবে না ; চাই এমন স্পর্শ, যাহা কখনও ব্যথা দিবে না।

"A heart that never hardens,
A temper that never tires,
A touch that never hurts."

আচার্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত নীতি-বাণী শিষ্যকে অনুপ্রাণিত করিল আদর্শ চিকিৎসকরূপে নিজকে গড়িয়া তুলিতে। চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করা অবধি তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সেই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। চিকিৎসা একটি মহৎ বৃত্তি—যাহাকে বিধানচন্দ্র সার্থক করিয়াছেন সেই নীতির রূপায়ণে। ডাক্তার রায়ের রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং হাতযশ সম্পর্কে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে,—তিনি অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে পরীক্ষা না করিয়া কিছুদূর হইতে দেখিয়াই সঠিক রোগনির্ণয় করিতে পারেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র রোগীর মনে রোগ সারিয়া যাইবে বলিয়া আশা জাগে। কর্নেল লিউকিস্ বিধানের শিক্ষালাভে কিরূপ যত্ন নিতেন, সেই সম্পর্কে তাঁহার বড় দাদা শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেন যে,—কলেজ-হাসপাতালে পরিদর্শনকালে কর্নেল লিউকিস্ বিধানকে লইয়া যাইতেন সঙ্গে করিয়া। তিনি পনর-বিশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া কোন একটা রোগীকে দেখাইয়া দিয়া বিধানকে সেই স্থান

হইতে দেখিয়া রোগ-নির্ণয় করিতে নির্দেশ দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধানচন্দ্রের নিদান (diagnosis) নির্ভুল হইত। কি কি লক্ষণ দেখিয়া ছাত্র রোগ সম্বন্ধে মত দিলেন, তাহাও অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিতেন। তারপর রোগীর শয্যার পার্শ্বে যাইয়া উভয়ে রোগীর বেড্-টিকেট দেখিতেন এবং রোগীকে প্রয়োজন মতে পরীক্ষা করিয়া আলোচনা করিতেন। সুবোধচন্দ্র বলেন যে,—কর্নেল লিউকিস্ পিতার মতো যত্ন লইতেন বিধানের শিক্ষা বিষয়ে। তিনি বিধানকে নিজহাতে সস্নেহে গড়িয়া তুলিয়াছেন। দূরদর্শী শিক্ষা-গুরু যেন চোখের সামনে দেখিতেছিলেন তাঁহার প্রিয় ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

এম. বি. শেষ (ফাইন্যাল) পরীক্ষার দিন পনর পূর্বে এমন একটি ঘটনা অকস্মাৎ ঘটিয়া গেল, যাহার দরুন বিধানকে অপ্রত্যাশিতভাবে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতে হইল। ঘটনাটি এই:—একদিন সকালবেলা মেডিকেল কলেজের প্রসূতিতন্ত্র অধ্যাপক (Professor of Midwifery) কর্নেল পেক তাঁহার ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া কলেজ হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। কলেজের সদরদরজার (gate-এর) সম্মুখে কলেজ স্ট্রীটের উপর একখানা চলন্ত ট্রামগাড়ীর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীখানার ধাক্কা লাগায় ঘোড়ার গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। আরোহী কর্নেল পেক্ কিংবা তাঁহার কোচম্যানের কোন আঘাত লাগে নাই। তখন অশ্ব-বাহিত ট্রামগাড়ীর পরিবর্তে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রামগাড়ী কলেজ স্ট্রীট দিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলেজের প্রবেশ-দ্বারে দণ্ডায়মান বিধানচন্দ্র সেই দুর্ঘটনা দেখিয়াছিলেন। অব্যবহিত পরেই কর্নেল পেক্ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—তুমি কি দুর্ঘটনাটা দেখিয়াছ? বিধান 'হাঁ' বলিতেই কর্নেল পেক্ পুনরায় প্রশ্ন করেন:— ট্রামগাড়ীখানা ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলিতেছিল না? জবাবে বিধান বলেন—'না।' সঙ্গে সঙ্গে আরও বলিলেন যে, তাঁহার মতে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়াছে কোচম্যানের দোষেই। জবাব শুনিয়া কর্নেল পেক্ রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যান। পূর্বোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে কর্নেল পেক বিধানকে ডাকাইয়া আনিয়া জানিতে চাহেন যে, ট্রাম-কোম্পানির বিরুদ্ধে তিনি যে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিয়াছেন, তাহাতে বিধান তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কিনা। বিধান কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি সত্য কথা বলিবেন। বিধানকে মামলায় সাক্ষী মানা হইল না।

ইহার এক সপ্তাহ পরেই ফাইন্যাল অর্থাৎ শেষ এম. বি. পরীক্ষায় তাঁহাকে মৌখিক (viva voce) পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইল কর্নেল

পেকের নিকট। তিনি পরীক্ষার্থী বিধানকে দেখিবামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন। পরীক্ষকের বিরাগভাজন পরীক্ষার্থীটি প্রশ্নের উত্তর না দিতেই পরীক্ষক চেঁচাইয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন এবং তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। একজন উচ্চপদস্থ অধ্যাপকের ছাত্রের প্রতি ওই অন্যায় আচরণে বিধান মর্মাহত হন। জীবনে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার দুর্ভাগ্য হইল তাঁহার এই প্রথম। তিনি দমিয়া গেলেন। বিধান কর্নেল লিউকিসের নিকট যাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত তিনি বিধানের মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার কথাও ইতঃপূর্বে অবগত হইয়াছিলেন। নিরুৎসাহ বিধানকে উৎসাহিত করিয়া তিনি বলিলেন যে,—দুই সপ্তাহ পরে যে এল. এম. এস. পরীক্ষা হইবে, তাহাতে ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিলেও সে পাস করিয়া গ্র্যাজুয়েট হইতে পারিবে; এবং দুই বৎসর পরে এম. ডি. পরীক্ষা দিতেও কোন বাধা হইবে না। সুতরাং এম. বি. ডিগ্রি না পাইলেও তাহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। ইহাতে বিধান আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইতে পারিলেন না; কেননা যে পরীক্ষক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার ও অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তিনিই তো আবার পরীক্ষা নিবেন। তিনি কর্নেল লিউকিস্‌কে তাহা খুলিয়া বলিলেন। কর্নেল লিউকিস্‌ বিধানকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে, তিনি সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছেন। যথাসময়ে পরীক্ষা দিবার জন্য বিধান উপস্থিত হইলেন কর্নেল পেকের নিকট। তিনি সানন্দে ও সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন তাহার পরীক্ষকের পরিবর্তন। পনর দিন পূর্বের সেই ক্রুদ্ধ, রুক্ষ ও কর্কশ কর্নেল পেক্‌ রূপান্তরিত হইয়া গেছেন শান্ত, কোমল ও মধুর-প্রকৃতির একটি মানুষে। কর্নেল পেক্‌ প্রথমেই বিধানকে সস্নেহ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—আগের এম. বি. পরীক্ষার বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য কেন তুমি আমার কাছে আসিলে না? এইরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে,—কর্নেল লিউকিস তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সুযুক্তির দ্বারা সহকর্মী বন্ধু কর্নেল পেকের ওই প্রকার পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। কর্নেল পেক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একটি নিরপরাধ, সত্যানুরাগী ও মেধাবী ছাত্রকে তিনি অবৈধ ও অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেন নাই।

বিধান ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি প্রোভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে সহ-চিকিৎসক (Assistant Surgeon) নিযুক্ত হন। তিনি মেডিকেল কলেজে কর্নেল লিউকিসের

সন্নিযুক্ত চিকিৎসক (House Physician) রূপে কাজ করিবার জন্য আদেশ পাইলেন। সম্ভবতঃ কর্নেল লিউকিসই তাহার প্রিয় ছাত্রটির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। নবোৎসাহে ও নবোদ্যমে বিধান তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে এম. ডি. পরীক্ষার প্রস্তুতি চলিল। মেডিকেল কলেজে তিনি যখন উপরের শ্রেণীর ছাত্র, তখন কর্নেল লিউকিস তাঁহাকে নিম্ন-শ্রেণীতে অধ্যাপনার সুযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্য শিক্ষার্থিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। এল. এম. এস. পরীক্ষা পাস করিবার পূর্বেই তিনি কলেজের ছাত্রমণ্ডলীতে জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কাজের সঙ্গে তিনি যখন কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার গুণগ্রাহী ছাত্রদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতা পান। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে লাগিল দ্রুতগতিতে। তৎকালে ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে নূতন ডাক্তারের দর্শনী (ফী) ছিল মাত্র দুই টাকা। সরকারী চাকরিতে বিধান মাসিক বেতন পাইতেন নিরানব্বই টাকা দশ আনা মাত্র। তাঁহাকে পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হইত। মেডিকেল কলেজের ডাক্তারের কর্তব্য সম্পাদন, এম. ডি. পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় চালানো—এই সমুদয় কাযের জন্য তিনি প্রায় প্রতিদিনই সতর-আঠার ঘণ্টা খাটিতেন। ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার ক্লান্তি আসিত না। এম. ডি. পাস করিয়া বিলাতে যাইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্পও তাহার ছিল। সেইজন্য উপার্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু সঞ্চয়ও তিনি করিতেন। দুইটি বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া বিধানকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হইলে যাতায়াত-ব্যয় সহ যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করিতে হইবে। সমস্ত টাকা তাঁহাকে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে স্বোপার্জিত অর্থ হইতে। সুতরাং শ্রমবিমুখ হইলে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন কি করিয়া ? বিশেষতঃ শ্রমবিমুখতা বিধানের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। উচ্চাভিলাষী যুবকের উৎসাহ-উদ্যম লইয়া তিনি কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে পরিশ্রমের ফল ফলিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করিলেন।

ওই উচ্চাভিলাষী যুবক স্বীয় সংকল্প সিদ্ধিকল্পে শ্রমবিমুখ হন নাই। পরবর্তী জীবনেও তাঁহার মধ্যে শ্রমবিমুখতা দেখা যায় নাই। তদ্দরুন তিনি স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র সম্মান ও সমাদর পাইয়াছেন।

ডাঃ রায়ের ৭৪তম জন্মদিনের প্রাক্কালে (১৯৫৫খ্রীঃ পয়লা জুলাইর অমৃত বাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য) পত্রিকার রিপোর্টারকে বলিয়াছিলেন যে, বিলাত যাত্রা-কালে জাহাজের ভাড়া দিয়া তাঁহার ব্যাঙ্কের হিসাবে ছিল মাত্র বারো শত টাকা। এই সামান্য টাকা লইয়াই তিনি পাড়ি দিয়াছিলেন অকূল সাগরে। বিলাতের বিদ্যার্থী-জীবনেও তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছিল অর্থকষ্টের মধ্য দিয়া। কোন অবস্থায়ই নিরাশ হন নাই। তাঁহার দীর্ঘ কর্ম-বহুল জীবনের সফলতার মূলে ছিল বলিষ্ঠ আশাবাদ, শ্রমশীলতা ও অবিলম্বে কর্ম-পন্থা স্থির করিয়া নেওয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কর্মক্ষেত্রে

ডাঃ রায়কে মেডিকেল কলেজে চাকরি করার কালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ইংরেজ ডাক্তারদের দুর্ব্যবহার ও অন্যায় আচরণের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। তদ্দরুন এম. ডি. পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও তাঁহার ব্যাঘাত কম ঘটে নাই। গবেষণা-কার্যে সাহায্য করা তো দূরের কথা, বরং বিঘ্নই সৃষ্টি করিয়াছেন ওই সমুদয় সংকীর্ণমনা অধ্যাপকেরা। আই. এম. এস.-ভুক্ত প্রায় প্রত্যেক ইংরেজ ডাক্তারই আপনাকে পি. এম. এস.-ভুক্ত ভারতীয় ডাক্তারের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে উচ্চ স্তরের বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা যে প্রভু-জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয়গণ যে দাস-জাতির অন্তর্ভুক্ত— এই দাম্ভিকোচিত মনোভাবও তাঁহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও আচরণে প্রকাশ পাইত। ফলে, ইংরেজ অধ্যাপক এবং ভারতীয় ছাত্রের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যথার্থ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারিত না। ওই অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলেন পূর্বোক্ত শ্রেণীর ইংরেজ অধ্যাপকগণই। ইঁহারা ছিলেন কর্নেল লিউকিসের বিপরীতধর্মা।

প্রভুমনোভাবাপন্ন দাম্ভিক ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অন্যায় আচরণ ও ব্যবহার ডাঃ রায়কে পীড়া দিত। তিনি কখনও তাহা বরদাস্ত করিতেন না। তাঁহার আত্মসম্মানবোধ ছিল তীক্ষ্ণ। ডাক্তার বিধান রায় ইউরোপীয়ান ফিমেল ওয়ার্ডে একটি রোগিণীর বেড্-টিকেটে যে নির্দেশ দিলেন, কিছুকাল পরে রেসিডেণ্ট সার্জন ক্যাপটেন আরউইন্ আসিয়া একজন নার্সের কথায় তাহা কাটিয়া অন্যরূপ নির্দেশ লিখিয়া নাম সই করিয়া যান। পরদিন সকালে হাসপাতালের সেই ওয়ার্ডে আসিয়া বিধান তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে ওই প্রকার অন্যায় ও বিধিবিরুদ্ধ হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি টিকেটখানা হাতে লইয়া নিম্নতলে যাইয়া কর্নেল লিউকিস্‌কে দেখাইলেন এবং বিষয়টি বুঝাইয়া বলিলেন। অবিলম্বে কর্নেল ডাকিয়া পাঠান রেসিডেণ্ট সার্জনকে। তিনি আসিবামাত্র কর্নেল তাঁহাকে ডাক্তার রায়ের উপস্থিতিতেই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন:—আরউইন, আমার হাউস্ ফিজিসিয়ানের নির্দেশ এভাবে কাটার মানে কি? তারপর কর্নেল তাঁহাকে হাত ধরিয়া বারান্দায় লইয়া গিয়া কি কি বলেন। ডাক্তার রায় তাহা শুনিতে না পাইলেও আরউইনের মুখের ভাব দেখিয়া

বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তিরস্কৃত হইয়াছেন। কর্নেল লিউকিস্ বারান্দা হইতে আসিয়া ডাঃ রায়কে বলেন:—তোমার ওয়ার্ডগুলিতে ফিরিয়া যাও। তোমার কাজে আর কোন বাধা সৃষ্টি হইবে না। আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল কলেরা ওয়ার্ডে রোগীর রক্ত পরীক্ষা সম্পর্কে। হাসপাতালে কাজ করার কালে ডাঃ রায় এম. ডি. পরীক্ষার গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ (thesis) লিখিবার জন্য গবেষণার কাজও করিতেন। একদিন তিনি কলেরা ওয়ার্ডে গবেষণার জন্য একটি রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিতেছিলেন। তখন বিকারতত্ত্ব-অধ্যাপক কর্নেল লিওনার্ড রোজার্স তথায় আসিয়া ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কি করিতেছেন। ডাঃ রায় জবাব দিলে কর্নেল তাঁহাকে বলিলেন যে, আর যেন সেই ওয়ার্ডে ওই সব করা না হয়। ডাঃ রায় সেই ওয়ার্ড হইতে সোজাসুজি গেলেন কর্নেল লিউকিসের নিকটে। বিষয়টি তাঁহাকে জানাইলে তিনি পর দিন ডাকিয়া পাঠান কর্নেল রোজার্সকে। ডাঃ রায়ের উপস্থিতিতেই তিনি বলিলেন:—রোজার্স! কলেরা ওয়ার্ডের ভার কোন চিকিৎসকের উপর দেওয়া হয় নাই। সুতরাং হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে সেই ওয়ার্ডের ভার অধ্যক্ষেরই উপর। ডাঃ রায় আমার হাউস্ ফিজিসিয়ান। আমার অনুপস্থিতিতে উহার ভার ডাঃ রায়ের হাতে। ভবিষ্যতে ওই ওয়ার্ডে যাইতে হইলে আমার অনুপস্থিতিতে ডাঃ রায়ের অনুমতি লইয়া যাইবেন।

মেডিকেল কলেজে কাজ করিবার কালে ডাঃ রায়ের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ইংরেজ ডাক্তারদের যে সকল বিরোধ বাধিয়াছিল, তন্মধ্যে আরও দুইটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি। একদিন কর্নেল লিউকিস্ ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করার সময়ে একটি রোগীর বেশী জ্বর উঠিয়াছে দেখিতে পান। ডাঃ রায়কে নির্দেশ দিলেন যে, রোগীর রক্ত পরীক্ষায় 'ম্যালেরিয়্যাল প্যারাসাইট' (পরজীবী) পাওয়া গেলে যেন কুইনিন দেওয়া হয়। ডাঃ রায় রক্ত পরীক্ষা করিয়া ম্যালেরিয়্যাল প্যারাসাইট পাইলেন। সে কালে উহা পাওয়া একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডাঃ রায় রোগীকে কুইনিন দিবার পূর্বেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন রেসিডেণ্ট ফিজি-সিয়ান ক্যাপটেন মেগো। তিনি ডাঃ রায়কে কুইনিন দিতে নিষেধ করিলেন, কেননা বাংলা দেশের জ্বর রোগ সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিতেছেন, তজ্জন্য ওই রোগীকে তাঁহার পর্যবেক্ষণে রাখিতে হইবে। ক্যাপটেন মেগোর ওইভাবে ডাঃ রায়ের কর্তব্যকার্যে বাধা সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। তথাপি তিনি আই. এম. এস. ভুক্ত বলিয়াই বিধি-

বিরুদ্ধ কাজ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কর্নেল লিউকিস্ কিছুকাল পরে পুনরায় সেই রোগীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন কুইনিন দেওয়া হইয়াছে কিনা। তদুত্তরে ডাঃ রায় তাঁহাকে ক্যাপটেন মেগোর নিষেধ করার নির্দেশের কথা জানান। শুনিয়া কর্নেল খুব চটিয়া গেলেন এবং প্রশ্ন করেন—ক্যাপটেন মেগো কে? ডাঃ রায় বলেন :—ক্যাপটেন মেগো কলেজের রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ান এবং আমি য়্যাসিস্টাণ্ট ফিজিসিয়ান বলিয়া আমাকে তাঁহার নির্দেশ মানিতে হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ কর্নেল লিউকিস্ ডাকিয়া পাঠাইলেন ক্যাপটেন মেগোকে। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে কর্নেল ডাঃ রায় এবং বহুসংখ্যক ছাত্রের সম্মুখেই তাহাকে বলিলেন :—ওয়ার্ডগুলির ভার আমার উপর এবং আমার অনুপস্থিতিতে ডাঃ রায় হইলেন ওইগুলির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। ভবিষ্যতে ওয়ার্ডগুলির কার্যে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা না হয়। ক্যাপটেন মেগো পরবর্তী কালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল সিমলায়।

অপর ঘটনাটি হইল হাসপাতালের বরিষ্ঠ চিকিৎসক (Senior Physician) কর্নেল বার্ড সম্পর্কে। ডাঃ বিধান রায় ইউরোপীয়ান পোশাক পরিয়া হাসপাতালের কাজে যাইতেন। ওইরূপ পোশাক পরিলে কাহাকেও হাত তুলিয়া 'সেলাম' দিবার নিয়ম নাই; কেবল মুখে গুড্ মর্নিং, গুড্ আফ্‌টারনুন ইত্যাদি বলিলেই চলে। ডাঃ রায় তাহাই করিতেন। একদিন কর্নেল বার্ডের সঙ্গে হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার কালে ডাঃ রায়ের দেখা হয়। তিনি তাঁহাকে পূর্ববৎ গুড্ মর্নিং বলিয়া শুভেচ্ছা জানান; কিন্তু কর্নেল বার্ড তাহাতে সাড়া না দিয়া ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন :—আপনি আমাকে দেখিলে হাত তুলিয়া 'সেলাম' দেন না কেন? জবাবে ডাঃ রায় বলেন :—সাহেবী পোশাক পরিলে হাত তুলিয়া 'সেলাম' দিবার দিয়ম নাই। কর্নেল বার্ড উত্তেজিত হইয়া কহিলেন :—না, হাত তুলিয়া 'সেলাম' দিবার নিয়ম আছে। ডাঃ রায় প্রত্যুত্তর করিলেন :—যদি ওই রকম নিয়ম থাকে, তবে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমি তাহা মানিয়া চলিব। আমার যে উপরওয়ালা কর্নেল লিউকিস, তাঁহাকেও আমি হাত তুলিয়া 'সেলাম' করি না। ইহার অব্যবহিত পরেই কর্নেল বার্ডকে কর্নেল লিউকিসের সহিত কথা বলিতে দেখিলেন ডাঃ রায়। কর্নেল লিউকিসের মুখে তিনি চাপা-হাসি লক্ষ্য করিলেন। বার্ড চলিয়া গেলে ডাঃ রায় কর্নেল লিউকিসের নিকটে যান। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় ব্যাপারটা

বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়া কর্নেল লিউকিস্ শান্তভাবে কহিলেন :—বিধান, তুমি কর্নেল বার্ডের কাছে কখনও যাইও না। ভবিষ্যতে গুড্ মর্নিং বলিয়া শুভেচ্ছাও জানাইও না। এই জাতীয় কর্মচারীরাই তো ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সুনাম নষ্ট করিয়া দেন। ইংরেজদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সেই সম্পর্কে একদিন কর্নেল লিউকিস্ ডাঃ রায়কে কথা-প্রসঙ্গে বলেন :—বিধান, আমি হয়তো চিকিৎসা-বিদ্যা তোমাকে বেশী শিখাইতে পারিব না; কিন্তু একটা বিষয় শিক্ষা দিয়া যাইতেছি। যখনই কোন ইংরেজের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহার কাছে তোমার মেরুদণ্ড এক ইঞ্চির সিকি ভাগও নত করিবে না, কারণ তাহা হইলে, তিনি তোমাকে নত করাইবেন দ্বিগুণ। ডাঃ রায় ওই অমূল্য উপদেশ জীবনে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

পরবর্তীকালে কর্নেল বার্ডের মনোভাবের পরিবর্তন এবং ডাঃ রায়ের প্রতি উদার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ডাঃ রায় এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে যখন উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাতে যাইবেন বলিয়া স্থির করেন, তখন কর্নেল বার্ড তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার সৌভাগ্য কামনা করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিলাতে কয়েকজন বন্ধুর নামে পরিচয়পত্র দেন। ডাঃ রায়ও পূর্বের বিরোধিতার অপ্রীতিকর স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলেন। ডাঃ রায় যুব-বয়সেই ছাত্রজীবনে এবং কর্মজীবনে ইংরেজ-চরিত্রের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দুইটি দিকই প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কর্নেল বার্ডের মধ্যেই তিনি দেখিতে পাইলেন সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইংরেজের ন্যায়-বোধ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে পড়িয়া সাময়িকভাবে অচেতন হইয়া পড়িলেও একেবারে লোপ পায় না। অনুকূল অবস্থায় সহজেই তাহা আবার সচেতন হইয়া উঠে। তখন তিনি নিজের অন্যায়কে নিজেই সংশোধন করিয়া নেন। ইতঃপূর্বে বর্ণিত কর্নেল পেকের ঘটনায় তাহাই দেখা গেল।

সপ্তম অধ্যায়

ইংলণ্ডে বিধানের শিক্ষালাভ।

ডাঃ রায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দুই বৎসর চাকরি করিয়া এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইয়া বিলাতে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেন। যদিও তাঁহার সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট নহে এবং তাহাতে পড়ার খরচ চালাইতে হইবে কষ্টেসৃষ্টে, তবু তিনি বিলাত যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে (আই. এম. এস.) ভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, না বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন করিবেন, তাহা স্থির করিতে তাঁহাকে সমস্যায় পড়িতে হইল। তৎকালে আই. এম. এস. ভুক্ত হওয়ার জন্যই চিকিৎসা-বিদ্যার্থীদের আগ্রহ ছিল বেশী। কেননা, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারিলে মোটা মাহিনায় চাকরি পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ সেকালে ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বড় বড় ডাক্তারদের অধিকাংশই ছিলেন আই. এম. এস. ভুক্ত। যাহা হউক ডাঃ রায়ের সেই সমস্যা সমাধান করিয়া দিলেন তাঁহার পরম হিতৈষী শিক্ষাগুরু কর্নেল লিউকিস্। তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্র-শিষ্য বিধানকে আই. এম. এস. ভুক্ত হইতে নিষেধ করিলেন। কারণ আই. এম. এস-এ প্রবেশ করিয়া সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরেই থাকিতে হইবে কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময়। কর্নেল নিজের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে,—তিনি আই. এম. এস. ভুক্ত হইয়া যে ভুল করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি বিধানকে আরও বলিলেন—আমি যদি ভালো পয়গম্বর হই, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য করিবে ভারতীয়েরাই। সুতরাং তোমার কলিকাতায় থাকিয়া তাহাতে অংশীদার হওয়া উচিত। ডাঃ রায় তাঁহার শিক্ষা-গুরুর উপদেশ মতেই চলিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কর্নেল বিধানকে বলিলেন বিলাতে যাইয়া এম. আর. সি. পি. (লণ্ড্) এবং এফ. আর. সি. এস. (ইংগ্) ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন করিতে। এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কর্নেল লিউকিস্ উত্তরকালে ভারতসরকারের অধীনে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সর্বোচ্চ (ডিরেক্টার জেনারেল) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ডাঃ রায় বিনা বেতনে দুই বৎসর তিন মাসের বিদায়ের জন্য আবেদন

করিলেন। বঙ্গদেশের চিকিৎসা-বিভাগের বড় কর্তা সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেন এই অজুহাতে যে, ডাঃ রায় মাত্র দুই বৎসর চাকরি করিয়া প্রার্থিত বিদায় পাইবার দাবি করিতে পারেন না। বিদায়ের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার কথা শুনিয়া কর্নেল লিউকিস্ বিধানকে পরামর্শ দিলেন ছোটলাটের নিকট আবেদন করিতে। তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন, এইরূপ অজুহাত যেন দেখান হয় যে,—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সদস্যগণকে যখন অনুরূপ অবস্থায় বেতন এবং অধ্যয়ন ভাতাসহ বিদায় দেওয়া হয়, তখন প্রোভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসের একজন সদস্যকে বিনা বেতনে বিদায় দিতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তাঁহার উপদেশ মতে পূর্বোক্ত অজুহাতে বিধান ছোটলাটের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইলেন। কর্নেল লিউকিস্ দুইটি মেডিকেল সার্ভিসের মধ্যে বিদায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারে ওইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি ডাঃ রায়ের আবেদনের সমর্থনে তদানীন্তন লেফ্টেনেন্ট গভর্নর (ছোট লাট) স্যার এড্ওয়ার্ড বেকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে জোরালো যুক্তি দিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দেন। ছোট লাট ডাঃ রায়ের বিদায়ের আবেদন মঞ্জুর করিলেন। বঙ্গদেশের হাসপাতালসমূহের ইন্স্পেক্টার জেনারেলকে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।

ডাঃ রায় বিলাত যাইবার জন্য বার্থ রিজার্ভ করিলেন। জাহাজ রওনা হইবার দশ দিন পূর্বে জাহাজ কোম্পানির জনৈক কর্মচারী তাঁহাকে জানাইলেন যে,—ডাঃ রায় যদি সেই কেবিনে যাইবার জন্য আর একজন ভারতীয় যাত্রী যোগাড় করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে দুইটি বার্থেরই ভাড়া দিতে হইবে; কেননা ভারতীয়ের কেবিনে কোন ইউরোপীয়ান যাত্রী যাইতে রাজী হইবেন না। এই নূতন বিঘ্নের কথা ডাঃ রায় কর্নেল লিউকিস্কে জানাইলে তিনি বলিলেন যে ইহা অত্যন্ত অন্যায়; ভারতীয়ের কেবিনে ইউরোপীয়ানের যাইতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, সাধারণতঃ ভারতীয় ইউরোপীয়ান অপেক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যদিও ভারতীয়ের চামড়া ইউরোপীয়ানের চেয়ে অধিকতর কালো; ওইরূপ অন্যায়কে বিনা প্রতিবাদে চালু হইতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি নিজেই কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং ওইরূপ অন্যায় ব্যবস্থা বাতিল করিতে বলিলেন। কর্নেল লিউকিসের কথায় সেই ব্যবস্থা বাতিল করা হইল। ডাঃ রায় 'সিটি অব্ গ্লাস্গো' জাহাজে করিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুআরি ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন।

মার্চের শেষ ভাগে ডাঃ রায় লণ্ডনে পৌছিলেন। তিনি দেশে থাকা-কালেই স্থির করিয়াছেন যে, সেণ্ট্ বার্থোলোমিউজ্ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল লিউকিস্ এবং অধ্যাপকগণের বেশির ভাগই ওই শিক্ষায়তনের ছাত্র। উহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে, তবে লণ্ডনের যাবতীয় চিকিৎসা-বিদ্যায়তনের মধ্যে উহাতে শিক্ষালাভের ব্যয় বেশী। কর্নেল লিউকিস্ এবং অন্যান্য অধ্যাপকেরা সেণ্ট্ বার্থোলোমিউজ্-এর ডীনের (প্রধানের) নিকট ডাঃ রায়কে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। তিনি ভর্তি হইবার জন্য পরিচয়-পত্রাবলীসহ সাক্ষাৎ করিলেন হাসপাতালের ডীন (Dean) ডাঃ শোরের সঙ্গে। ডাঃ শোর তৎসমুদয় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেন এবং ডাঃ রায়ের গুণাবলী সম্বন্ধেও অবগত হইলেন। কিন্তু তিনি তথাপি ডাঃ রায়কে ভর্তি করিয়া নিতে সম্মত হইলেন না। তিনি লণ্ডনের অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ডাঃ রায়কে প্রবেশের চেষ্টা করিতে উপদেশ দেন। উচ্চাভিলাষী বিদ্যার্থী আরোগ্যশালা-প্রধানের (ডীনের) অসম্মতিতেও স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। দুই দিন পরে তিনি পুনরায় দেখা করিলেন ডাঃ শোরের সঙ্গে। তিনি ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ডাঃ রায় কত দিন থাকিবেন এবং কি পড়িবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উত্তরে ডাঃ রায় বলেন যে, তিনি দুই বৎসর তিন মাস থাকিয়া এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন) এবং এফ. আর. সি. এস. (ইংলণ্ড) পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক। ডীন বলিলেন—দুইটি পরীক্ষার জন্য দুই বৎসর তিনমাস অত্যন্ত কম সময়। তারপর এক সঙ্গে মেডিসিন এবং সার্জারীর দুইটি পৃথক ডিগ্রির জন্য পড়িবার ছাত্র ইংলণ্ডে বেশী নাই। তুমি খুব বেশী উচ্চাভিলাষী। বিধান ওই মন্তব্যে ঘাবড়াইয়া না যাইয়া জবাব দিলেনঃ—সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত উচ্চাভিলাষ ব্যতীত জগতে কোন বড় কাজ সম্পন্ন হয় নাই। এবারেও বিধানের আবেদন মঞ্জুর হইল না। উচ্চাভিলাষী দৃঢ়সংকল্প যুবক ইহাতেও হাল ছাড়িয়া দেন নাই। দুই দিন পরে তিনি পুনরায় ডীনের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ডীন তাঁহাকে জানান যে, বিদেশী ছাত্রের নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডাঃ রায় বলিলেন—গতকল্য দক্ষিণ আফ্রিকার একজন নিগ্রো ছাত্রকে ভর্তি করা হইয়াছে। ডীন বলিলেন যে একজন লর্ডের সুপারিশ থাকায় তাঁহাকে ভর্তি করা হইয়াছে। ডাঃ রায় কহিলেন—ওইরূপ কেন উচ্চস্তরের ব্যক্তির সুপারিশ যদিও আমার নাই, তথাপি আপনাদের শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের আগ্রহ আমার যে খুব বেশী, তাহা আপনাকে নিশ্চিত

করিয়া বলিতেছি। এইবারের চেষ্টাও তাঁহার সফল হইল না। দেড় মাসের মধ্যে তিনি কমপক্ষে ত্রিশ দিন হাসপাতালের ডীন ডাঃ শৌরের দ্বারস্থ হইয়াছেন। ডাঃ রায়ের প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে,—যেখানে তিনি বাধা পান সেইখানে থাকিয়াই তাহা অপসারণে চেষ্টিত হন। তাঁহার অগ্রগতির পথের বিঘ্ন অপসারিত না করিয়া তিনি অন্য পথ ধরিয়া লক্ষ্যস্থলে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নহেন। শেষবার তিনি ডীনের নিকট উপস্থিত হইলে ডীনের অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন হইল। ডীন ডাঃ রায়কে ভর্তি হইতে অনুমতি দিলেন।

অনুমতি পাইবার পরেই ডাঃ রায় বিখ্যাত শিক্ষায়তন সেণ্ট বার্থোলোমিউজে ভর্তি হইলেন। উচ্চাভিলাষী যুবক উৎসাহ উদ্যম এবং মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। মেডিসিন এবং সার্জারী দুইটি বিষয়ের উচ্চ ডিগ্রি-পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার সংকল্প। সেই সংকল্পকে সার্থক করিবার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কয়েক জন অধ্যাপকের সস্নেহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তাঁহার প্রতি। ফলে, তাঁহাকে কলেজে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইল। তদ্দরুন তাঁহার আর্থিক কষ্টের লাঘব হইল অনেক পরিমাণে। যে দুই বৎসর তিন মাস সময়কে ডীন ডাঃ শৌর দুইটি ডিগ্রি-পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত কম সময় বলিয়া বিধানকে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই প্রতিভাবান উচ্চাভিলাষী বিদ্যার্থী যুবক দুইটি পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হইলেন। এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় তিনি অধিকার করিলেন সর্বোচ্চ আসন। এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষায়ও ফল সন্তোষজনক হইল। ডাঃ রায় তাঁহার প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় লইবার কালে ডীন ডাঃ শৌর তাঁহাকে বলেন :—

ডাঃ রায়, তোমাকে আমাদের শিক্ষায়তনে প্রথম ভর্তি হইতে অনুমতি দিই নাই বলিয়া আমি সত্যসত্যই লজ্জিত। তোমাকে অনুমতি দানের অসম্মতির কারণ এই যে,—তোমার পূর্বে যে সকল ছাত্র বাংলা হইতে আসিয়া এখানে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের অমর্যাদা হইয়াছে। তোমাকেও সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থী মনে করিয়া নিতে রাজী হই নাই। তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি ডিগ্রিই পাইয়াছ, তাহা খুব অল্প ছাত্রের ভাগ্যে ঘটে। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার প্রতি আমার অতীতের ব্যবহারের জন্য আমি বড়ই দুঃখিত। বাংলাদেশ হইতে কোন ছাত্র যদি তোমার পরিচয়পত্র লইয়া ভর্তি

হইবার জন্য আসে, তবে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া তাহাকে ভর্তি করিয়া নিব।

এই স্থলে সেই শিক্ষায়তনের আর একজন গুণগ্রাহী অধ্যাপকের কথা বলা উচিত। ইনি বিশ্ববিখ্যাত শারীরস্থান-বিশারদ (Anatomist) ডাঃ য়্যাড্‌ডিসন। বিধানের জ্ঞান-লাভের আগ্রহ, শ্রমশীলতা, একাগ্রতা ও মেধা এই অধ্যাপকের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহার সুপারিশেই যে ডীন বিধানকে কলেজে ভর্তি হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি পরে বিধানকে কথা-প্রসঙ্গে বলেন। ডাঃ য়্যাড্‌ডিসন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উদারনীতিক দলের (লিবারেল পার্টির) মনোনীত প্রার্থীরূপে একটি শ্রমিক নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে পালামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচন-সংগ্রামে বিধান তাঁহার অধ্যাপকের জন্য কাজ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। প্রথম মহা বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ডাঃ য়্যাড্‌ডিসন মন্ত্রিসভায় আসন পান ; পরবর্তীকালে তিনি 'লর্ড' হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী রূপে উভয়ের মধ্যে যে প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহা পঞ্চ দশকে লর্ড য়্যাড্‌ডিসনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ রায় দুইটি উচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে

ডাঃ রায় বিলাত হইতে কলিকাতায় পৌছিয়া প্রথমে সাক্ষাৎ করেন তদানীন্তন সার্জন জেনারেলের (মহা-চিকিৎসকের) সঙ্গে। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে বিধান তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিলাতের দুইটি উচ্চ ডিগ্রি পাওয়ায় তিনি বিধানকে অভিনন্দন জানান এবং বিধান কি করিতে চাহেন জিজ্ঞাসা করেন। বিধান তাঁহাকে জানান যে, তিনি চাহেন কলিকাতায় থাকিয়া সরকারী কার্য করার সঙ্গে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইতে। সার্জন জেনারেল কর্নেল হ্যারিস্ বলেন যে, তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার মতো কোন পদ কলিকাতায় আপাততঃ শূন্য নাই। বিধান কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকের পদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে,—ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের সহকর্মীদের মধ্যে যাহারা এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় তাঁহার অনেক নিম্নে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই তো পদোন্নতির দ্বারা অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বেলায় অন্য প্রকার ব্যবস্থা হইতেছে কিজন্য। তদুত্তরে সার্জন জেনারেল বলিলেন যে,—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য যে ব্যবস্থা করা যায়, প্রোভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য তাহা করা যাইতে পারে না; শেষোক্ত সদস্যদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে,—ব্রিটিশ শাসনকালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস ইত্যাদি যে সকল সার্ভিস প্রত্যাবর্তন করা হইয়াছিল, ওইগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অপেক্ষা ব্রিটিশদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা এবং নানাভাবে বেশী সুবিধা দেওয়া। ওই সমুদয় সার্ভিসে ভারতীয়গণের প্রবেশে কোন বাধা ছিল না সত্য, কিন্তু উচ্চ পদগুলিতে অধিক গুণাবলী, কর্মদক্ষতা ও ন্যায্য দাবি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত না। শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সার্ভিসের ব্রিটিশ সদস্যগণকে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার দ্বারা নানাভাবে অনুগৃহীত করা হইত।

ব্রিটিশ শাসকগণের অনুসৃত পূর্বোক্ত নীতির ফলেই ডাঃ রায় মেডিকেল

কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইলেন। আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলেও সরকারী কার্য তিনি তখন ছাড়িয়া দিতে পারেন না; কেননা তাহা ছাড়িয়া দিলে কলিকাতার সরকারী হাসপাতালে থাকিয়া ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাঁহাকে হারাইতে হইবে। সার্জন জেনারেল ডাঃ রায়কে বলিলেন যে,—তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) শিক্ষকের (teacher-এর) পদ নিতে পারেন; তবে সেজন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ সেখানে কোন পদ খালি নাই। তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে কোন জেলায় সিভিল সার্জন করিয়া পাঠান যাইতে পারে, তাহাও জানান হইল। কিন্তু তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি সার্জন জেনারেলকে বলিলেন যে,—যদি শুধু উচ্চপদের জন্য তাঁহার লোভ থাকিত, তবে তো তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে প্রবেশ করিতেন। বর্তমান অবস্থায় প্রোভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে থাকিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইবার সুযোগ-সুবিধা দিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে সার্জন জেনারেল মন্তব্য করেন যে, ডাঃ রায়ের মতো একটা শ্বেত হস্তীকে কলিকাতায় পোষণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ডাঃ রায় জবাবে বলেন—আপনি লিখিয়া দিন এখন কলিকাতায় আমাকে কোন কাজ দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা হইলে আমি সেই অজুহাতে চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারি। সার্জন জেনারেল ডাঃ রায়ের জবাব শুনিয়া কতকটা বিব্রত হইলেন এবং সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে,—তিনি ওইরূপ লিখিয়া দিতে পারেন না; কেননা ভারতীয় সংবাদপত্রে এই বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হইবে যে ডাঃ বি. সি. রায়কে তাঁহার একজন প্রাক্তন অধ্যাপক পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ রায়কে নির্দেশ দেওয়া হইল কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অতিরিক্ত চিকিৎসকরূপে কাজ করিতে। সেই কার্যে নিযুক্ত থাকা-কালে তাঁহাকে কলিকাতা পুলিসের কনস্টেবলদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় পরিচালনা (First aid and ambulance) সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইত। যে কার্য একজন সাধারণ ডাক্তারের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিত, সেই কার্য করিতে হইল একজন ডাক্তারকে, যিনি ভেষজ ও শস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যায় (Medicine and Surgeryতে) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ দুইটি ডিগ্রির অধিকারী। ডাঃ রায় দেখিতে

পাইলেন যে, ওইরূপ অব্যবস্থার দুর্ভাগ্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয় ভারতীয় চিকিৎসকদের জন্যই। সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকিলে সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলা কর্তব্য, নতুবা শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। সুতরাং তিনি তাঁহার উপর অর্পিত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সেই কাজ করিতে হইল নয় মাসেরও ঊর্ধ্বকাল। তৎকালে তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবসায় তেমন জমিয়া উঠে নাই। তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সার্জারি বা শস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা দানের জন্য একটা টিউটোরিয়েল ক্লাস খুলিলেন। সেই ছোটখাটো ক্লাসটিতে যে সকল ছাত্র ডাঃ রায়ের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভাবীকালে দেশের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যশপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ইহার পরে ডাঃ রায় নিযুক্ত হইলেন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকেব পদে। তখন তিনি মাসিক বেতন ভাতা ইত্যাদি বাবত পাইতেন ৩৩০৲ টাকার কিছু বেশী। মাস কয়েক পরে তৎকালীন অধ্যক্ষ (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) কর্নেল য়্যাণ্ডার্সন ডাঃ রায়ের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই একজন প্রদর্শককে তাঁহার সহ-চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। তিনি ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে অধ্যক্ষ তাঁহার ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা চাহিলেন। কিছুকাল পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া আসেন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সদস্য মেজর রেইট্। তিনি এডিনবার্গের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তবুও কেবল শ্বেতাঙ্গ বলিয়া আই. এম. এস. ভুক্ত হইয়া বেতন ভাতা ইত্যাদি সমেত মাসিক দেড় হাজার টাকা পাইতেছিলেন। তিনি যেদিন কাজে যোগ দেন, সেদিনই ডাঃ রায়কে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া নেন ডাঃ রায়ের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য। মেজর রেইট্ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন :—আপনি এখানে কি কি কাজ করেন? ডাঃ রায় জবাবে বলেন :—ছাত্রদের ক্লাসে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়; ইহা ব্যতীত ছাত্রদের শব-ব্যবচ্ছেদ এবং প্রদর্শকদের (ডেমনেষ্ট্রেটারদের) কার্য তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি। শুনিবামাত্র মেজর রেইট্ মন্তব্য করেন :—কাজের তুলনায় আপনি এত বেশী বেতন পাইতেছেন দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে। চাকরি করিতেছেন বলিয়া ডাঃ বিধান রায় ওইরূপ অন্যায় ও অশোভন মন্তব্য শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিবার মতো যুবক নহেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দিলেন এই বলিয়া—একজন এম. আর. সি. পি. (লণ্ড্), এফ. আর. সি. এস্. (ইংগ্) এবং এম. ডি. (ক্যাল্) ডিগ্রি-পরীক্ষা পাস করিয়াও বেতনাদি বাবত পাইতেছেন মাসে মাত্র ৩৩০৲

টাকা, কিন্তু অন্যজন এডিনবার্গের ফেলোশিপে পর্যন্ত ফেল করিয়া একই সময়ে বেতনাদি বাবত মাসে পাইতেছেন দেড় হাজার টাকা, এইরূপ অসমতার কারণ যে কি, তাহা আমি বুঝি না। হয়তো বর্ণ-বৈষম্যই ইহার একমাত্র কারণ। মেজর রেইট্ তাঁহার অধীনস্থ একজন ভারতীয় যুবক ডাক্তারের নিকট হইতে ওইরূপ জবাব শুনিবেন বলিয়া আদৌ আশা করেন নাই। যুবক বাক্যবাণ হানিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন উহার প্রতিক্রিয়া। সাহেবের চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে আঘাতের জ্বালা। ভিতরে ভিতরে তিনি খুবই চটিয়া গেলেন। তবে সেই ভাব গোপন রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তিনি আলোচনায় আর অগ্রসর হন নাই। শুধু বলিলেন যে ডাঃ রায়কে পরে সরকারী নোট পাঠানো হইবে।

যথা সময়ে অধ্যক্ষ মেজর রেইটের নিকট হইতে তিনি তাঁহার কাজের সময়-নির্দেশক একখানা নোট পাইলেন। তাহাতে এইরূপ নির্দেশ ছিল যে, ডাঃ রায়কে শারীরস্থান বিভাগে বেলা বারোটা হইতে তিনটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা উপস্থিত থাকিতে হইবে। অর্ধ শতক পূর্বে প্রদত্ত একটা বিভাগীয় প্রজ্ঞাপন (নোটিফিকেসন) অনুসারে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নোটখানা পাইয়া তিনি অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নির্দেশ কি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে, না উহার মূলনীতি (স্পিরিট) অনুসরণ করিলে চলিবে। অধ্যক্ষ বলিলেন—সরকারী নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতে হইবে বই কি। তদুত্তরে ডাক্তার রায় কহিলেন—যখন আমরা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করি, তখন ঘণ্টা হিসাবে ভাড়ার টাকা দিয়া থাকি, কিন্তু ট্যাক্সির বেলায় হিসাব-নিকাশ হয় দূরত্ব ধরিয়া। তেমনিই যখন কোন পিয়ন কিংবা ভৃত্য নিযুক্ত করি, তখন আমরা তাহাকে দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করিবে ঠিক করিয়া দিয়া থাকি, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে একটি বিভাগ পরিচালনায় নিযুক্ত করিলে আমাদের দেখিতে হয় তিনি দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতেছেন কিনা, তখন প্রতিদিন কত ঘণ্টা কাজ করেন তাহা দেখার প্রয়োজন হয় না। বিধানচন্দ্রের এই জবাব শোনার পরও মেজর রেইট্ পুনরায় বলিলেন যে, নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হউক, ইহাই তিনি চাহেন।

ওই নির্দেশের দিনকয়েক পরে মেজর রেইট্ ডাঃ রায়কে লিখিয়া পাঠান যে,—তিনি বিকাল চারটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা শস্ত্র-চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শ্রেণীর (tutorial class-এর) ভার নিতে

পারেন কিনা। তিনি চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিয়া দিলেন রদ্দী কাগজের ঝুড়ির (ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের) মধ্যে, কোন জবাবই দিলেন না। ইহার পরে কিছুদিন কাটিয়া গেল। মেজর রেইট এক দিন শারীরস্থান বিভাগে আসিলেন। ডাঃ রায় প্রজ্ঞাপন মতে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করিতেছেন কিনা, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যাওয়া সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তখন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা। ডাঃ রায়কে কর্মরত দেখিয়া অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার চিঠিখানার উত্তর ডাঃ রায় দেন নাই কেন। তিনি জবাবে বলিলেন—আপনার চিঠিখানাকে তো উহার উপযুক্ত স্থানেই অর্থাৎ রদ্দী কাগজের ঝুড়িতে (ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে) ফেলিয়া দিয়াছি। শুনিয়া মেজর রেইট্ হতভম্ভ হইয়া যান এবং প্রশ্ন করেন—কেন? প্রত্যুত্তরে ডাঃ রায় কহিলেন—আপনিই যে আমাকে বলিয়াছেন সরকারী নিয়মকে মানা চাই অক্ষরে অক্ষরে, মূলনীতির কোন প্রশ্ন সেখানে উঠে না। আমি তো তাহাই করিতেছি, বারোটা হইতে তিনটা আমার কাজের নির্দিষ্ট সময়। ইহাতেই আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্যকার্যের দায়িত্ব শেষ হইয়া গেল। আপনি আমাকে সেই নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ করিতে বলিয়াছেন, আমি তাহা অস্বীকার করিয়াছি। মেজর রেইট্ মন্তব্য করিলেন যে, প্রকারান্তরে তাঁহার নির্দেশ অমান্য করা হইয়াছে। ডাঃ রায় বলিলেন—আপনি যদি তাহাই মনে করেন, তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতে পারেন, আমার যাহা বলিবার সেইখানে বুঝাইয়া বলিতে প্রস্তুত আছি।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে কাজ করিবার কালে অধ্যক্ষ (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) মেজর রেইটের সঙ্গে ডাঃ রায়ের বিরোধ চলিয়াছিল অধ্যক্ষের ওই প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যাইবার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত। সেই সম্পর্কে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গ-বিভাগের (১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর) ফলে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরকে লইয়া যে প্রদেশটি গঠিত হইয়াছিল, উহার তৎকালীন ছোট লাট ছিলেন স্যার য়্যানড্রু ফ্রেজার। তিনি একদা প্রতিষ্ঠানটি দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার কিছুকাল পূর্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজের গাড়ীতে করিয়া হাসপাতালে পৌছিলেন। সদর দরজায় ছোট লাটের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার সহকর্মী বন্ধুগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়াই তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যান। মেজর রেইট্ যে নিকটে ছিলেন,

তাহা ডাঃ রায় দেখিতে পান নাই; তিনি বন্ধুদের সঙ্গে তখন কথা বলিতেছিলেন। ছোট লাট স্কুল ও হাসপাতাল দেখিয়া চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই অধ্যক্ষ ডাকাইয়া পাঠাইলেন ডাঃ রায়কে। তিনি জানিতে চাহিলেন—ডাঃ রায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াও কেন মাথার টুপি (হ্যাট্) উঠাইয়া সম্মান দেখান নাই। ডাঃ রায় বলিলেন—আমি প্রকৃতপক্ষে আপনাকে দেখিতে পাই নাই। আর দেখিতে পাইলেও টুপি উঠাইতাম না, মুখে 'গুড্ মর্নিং' বলিয়াই সম্মান দেখাইতাম। কেননা ইংলণ্ডে অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপককে দেখিয়া টুপি উঠাইতে হয় না, কেবল মুখে 'গুড্ মর্নিং', 'গুড্ আফ্‌টারনুন্' ইত্যাদি বলিলেই চলে। তিনি আরও বলিলেন—আমি মনে করিয়াছিলাম, ইংরেজরা যেখানেই যান, তাঁহাদের আচারও সেখানে চল থাকে। অধ্যক্ষ রেইট্ তাঁহাকে খোঁচা দিবার মতলবে বলেন—সে দেশ হইল ইংলণ্ড, আর এদেশ হইল ইণ্ডিয়া। তদুত্তরে ডাঃ রায় তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যেন একটা বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইয়া দেন যে, প্রত্যেকেরই মাথার টুপি উঠাইয়া সম্মান দেখানো উচিত। মেজর রেইট্ এই বলিয়া তাহা করিতে অস্বীকার করেন যে, উহাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। সেই দিন হইতে ওই প্রতিষ্ঠানে মাথার টুপি উঠাইয়া সম্মান দেখাইবার রীতি একেবারে উঠিয়া গেল। এইজন্য প্রশংসা পাইবার অধিকারী একমাত্র ডাঃ রায়।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে আরও একটা রীতি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। কোন অধ্যাপক বা শিক্ষককে দেখিবামাত্র ছাত্রদের খোলা ছাতা বন্ধ করিতে হইত। ডাঃ রায় ইহা মোটেই পছন্দ করিতেন না। কোন ছাত্র ক্লাসে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ছাতা মাথায় দিয়া যাইবার কালে যদি তিন জন অধ্যাপককে কিংবা শিক্ষককে পর পর দেখিতে পাইতেন, তবে সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহাকে তিন বারই ছাতা বন্ধ করিতে হইত এবং পুনরায় মাথায় দিবার জন্য তিন বারই ছাতা খুলিতে হইত। ডাঃ রায়ের বিবেচনায় এই রীতি যে কেবল ছাত্রদের পক্ষে বিরক্তিকর ছিল তাহা নহে, উহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় মর্যাদারও ক্ষতিকর ছিল। তিনি ছাত্রদের ওইভাবে সম্মান দেখাইতে নিষেধ করেন; মুখে 'গুড্ মর্নিং', 'গুড্ আফটারনুন', 'গুড্ ইভিনিং' ইত্যাদি বলিয়া কিংবা নমস্কার জানাইয়া সম্মান দেখাইতে বলেন। ছাত্রসমাজে ডাঃ রায়ের জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে সেই উপদেশ দ্রুতগতিতে প্রচারিত হইয়া গেল। ছাত্রগণ তাহাই মানিয়া চলিতে লাগিলেন। একদিন মেজর

রেষ্টকে দেখিয়া কয়েকজন ছাত্র ছাতা বন্ধ না করিয়া কেবল মুখে 'গুড্ মর্নিং' বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি চটিয়া যান এবং তাঁহাদের ছাতা বন্ধ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তাঁহারা অধ্যক্ষকে জানাইলেন যে, ছাতা বন্ধ না করিয়া ওইভাবে সম্মান দেখাইতে উপদেশ দিয়াছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান। ঘটনাটা উল্লেখ করিয়া অধ্যক্ষ জানিতে চাহিলেন—ডাঃ রায় কেন ছাত্রদের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা শিক্ষা দিতেছেন। তদুত্তরে ডাঃ রায় বলেন যে,—ওইরূপ শিক্ষা কখনও তিনি দিতে পারেন না; বিরক্তিকর রীতি ছাড়িয়া একটা যুক্তিসঙ্গত রীতিতে সম্মান দেখাইতে বলিয়া দিয়াছেন মাত্র। ডাঃ রায় যে কি ধাতুতে গড়া, তাহার পরিচয় অধ্যক্ষ ইতঃপূর্বেই পাইয়াছেন। সুতরাং ওই ব্যাপার নিয়া বাড়াবাড়ি করা তিনি সমীচীন মনে করেন নাই। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে বহু বৎসর যাবৎ অনুসৃত আর একটি অবাঞ্ছিত রীতি ডাঃ রায়ের সৎসাহসের দরুন চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

ওই সমুদয় ঘটনা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ডাঃ বিধান রায়ের আত্মসম্মান-জ্ঞান ও জাতীয় মর্যাদাবোধ কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল। ইংরেজ গবর্নমেণ্টের অধীনে চাকরি করিতেন বলিয়া তিনি কোন দিন তাঁহার ঊর্ধ্বতন ইংরেজ রাজপুরুষকে মাথার টুপি খুলিয়া সম্মান দেখান নাই। ছাত্রদেরও তিনি ছাতা বন্ধ করিয়া সম্মান দেখাইতে নিবৃত্ত করিলেন। সেকালটা ছিল বাংলায় Renaissance বা নব-জাগৃতির যুগ—যাহা প্রবর্তন করিয়াছে স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে আরব্ধ বিরাট আন্দোলন তখন সফল সমাপ্তির দিকে চলিতেছিল। উহার সমাপ্তির পূর্বেই সমগ্র বাংলায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীর বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রের সাধনা। সেই যুগেরই অবিস্মরণীয় ঘটনা কলিকাতার মানিকতলায় অরবিন্দ ঘোষ ও ভ্রাতৃগণের বাগানবাড়ীতে বোমা-নির্মাণের কারখানা এবং অস্ত্রাগার আবিষ্কার। তাহা হইতে উদ্ভব হইল আলিপুর বোমার মামলা—যাহাতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্লবধর্মী যুবকেরা। বিপ্লবী যুবক প্রফুল্ল চাকী মৃত্যুবরণ করিলেন নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহনন করিয়া; ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু প্রভৃতি ফাঁসির মঞ্চে গাহিয়া গেলেন জীবনের জয়গান। আরও কত কি ঘটিতেতেছিল সেকালের নব-জাগ্রত বাংলায়।

তেজস্বিতা, আত্মসম্মান-জ্ঞান ও সৎসাহস ছিল বিধানচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ; ইহা ব্যতীত তাঁহার উপর যুগের প্রভাবও যথেষ্ট পড়িয়াছিল। মননশীল, প্রতিভাবান ও ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী যুবক বিধানচন্দ্র সেই নব-জাগৃতির যুগের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও স্বাজাত্যবোধ তীক্ষ্ণতর হইল। যুগের প্রভাব সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—'তা পড়েছিল বইকি।'

সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্বে একদিন মেজর রেইট্ ডাঃ রায়কে একাকী পাইয়া সবলভাবে একটি প্রশ্ন করেন—ডাঃ রায়, আপনি কি আমাকে মূর্খ মনে করেন? জবাবে তিনি কহিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। যদি বলি 'হাঁ' তবে তাহা আপনি পছন্দ করিবেন না, আর যদি 'না' বলি, তাহা হইলেও আমার বিবেকে আঘাত লাগিবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না—কি উত্তর আপনাকে দিব। এইরূপ কথাবার্তার পরে মেজর রেইট্ বলিলেন—ডাঃ রায় আমার কার্যকাল এখনও শেস হয় নাই। আমি ইচ্ছা করিলেই আরও কয়েক বৎসর কাজ করিতে পারি। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি এখনই কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব। যে প্রতিষ্ঠানে আমার অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্যতর শিক্ষক রহিয়াছেন, সেখানে অধ্যক্ষ্যের পদে থাকিয়া কাজ করা আমার পক্ষে যে অনুচিত, তাহা আমি অনুভব করিতেছি। ইংরেজ চরিত্রের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য—নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝিতে পারিলে অকপটে তাহা স্বীকার করা। মেজর রেইটের চরিত্রেও সেই বিশেষত্ব ছিল। তবে ডাঃ রায়ের সৎসাহস এবং সতেজ আচরণই যে মেজর রেইটের ওইরূপ অনুভূতি জাগাইতে সহায়ক ছিল, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না।

নবম অধ্যায়

চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে

বিধানচন্দ্র এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন মেডিকেল কলেজে সহ-চিকিৎসকের (য়্যাসিস্টাণ্ট্ সার্জনের) পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন হইতে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি দর্শনী (ফী) নিতেন দুই টাকা। তৎকালে কলিকাতায় নূতন ডাক্তারদের দর্শনীর হার ওই প্রকারই ছিল। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তাও ছিল যথেষ্ট। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অগ্রগতির পক্ষে তাহা কম সহায়ক ছিল না। ডাক্তার হিসাবে তাঁহার দক্ষতা ও হাতযশ এবং রোগীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ও সদয় ব্যবহার ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি লাভের প্রধান কারণ। দুই বৎসরের উপার্জন হইতে ডাঃ রায় বিলাতে পড়ার খরচের টাকাও সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল লিউকিন্ বিধানচন্দ্রকে নূতন ছাত্রদের অধ্যাপনার সুযোগও দিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্য এবং সস্নেহ ব্যবহার বিদ্যার্থীগণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার গুণাবলীই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেই সমুদয় প্রকাশের সুবিধা দিয়াছিলেন গুণগ্রাহী ও হিতৈষী অধ্যক্ষই। তাঁহার প্রিয় ছাত্র বিধান যে সুচিকিৎসক ইহা তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন। তাহাতে ডাঃ রায়ের চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভে কম সহায়তা হয় নাই।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর ডাঃ রায় দর্শনীর হার বাড়াইয়া আট টাকা করিলেন। তাহাতেও রোগীর অভাব হইল না। দিনের পর দিন তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রথমে এল. এম. এস. ডিগ্রি পাইয়া তিনি যখন সহ-চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন, তখন ৬৭।১নং হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। বিলাত হইতে আসিয়া তিনি ভাড়া লইলেন ৮৪নং হ্যারিসন রোডের বাড়ী—যেখানে বাস করিয়াছেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই বৎসরই তিনি তাঁহার নিজের বাড়ীতে ৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে উঠিয়া আসেন। বাড়ীটি তিনি খরিদ করিয়াছেন মিঃ খাস্তগীর হইতে। ডাঃ রায়ের খরিদের পূর্বে সেই বাড়ীর ভাড়াটে ছিলেন একজন ন্যাভাল অফিসার অর্থাৎ

নৌ-বিভাগের আধিকারিক। ১৯১৬ খ্রীঃ হইতে তিনি সেই বাটীতেই বাস করিয়া আসিতেছেন। তিনি চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে বিলাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়নে তাঁহার কাটিয়া গেল দুই বৎসর তিন মাস সময়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় আট বৎসরের মধ্যেই ডাঃ রায় কলিকাতায় বাড়ী এবং গাড়ীর মালিক হইলেন। তৎকালে ওই দুইটি কলিকাতায় আভিজাত্যের নিদর্শন। গবর্নমেণ্টের অধীন সহ-চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি সেই সময়ে যে বেতন পাইতেন, উহাকে সামান্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার মতো প্রতিযোগিতা-সংকুল মহানগরীতে তাঁহার ডাক্তারিতে যে কিরূপ পসার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ডাঃ রায়ের দর্শনীর হার আরও বাড়িয়া তদানীন্তন প্রবীণ শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের সমান হইল।

রোগীর থুথু, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা তখন কলিকাতায় ছিল না। তজ্জন্য ডাঃ রায় নিজের বাড়ীতে একটি প্রয়োগশালা (লেবোরেটরী) স্থাপন করিলেন। তাহাতে কয়েকজন ডাক্তার আসিয়া কাজ করিতেন। এই ব্যবস্থায় তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীদের সুবিধা হইল। কেননা প্রয়োজন হইলে থুথু, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার কাজ সত্বর সম্পন্ন হইত। চিকিৎসা-বৃত্তিকে তিনি নিছক ব্যবসায় বলিয়া মনে করিতেন না; সেই বৃত্তির মধ্যে দিয়া যে পরোপকার ও লোকসেবার সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, উহার সদ্ব্যবহার করিতেন। ডাঃ রায় রোগীর এরূপ যত্ন নিতেন যে, রোগীর ঘরে ঢুকিয়া যদি দেখিতেন রোগীর বিছানা ঠিকমতো পাতা হয় নাই, তবে নিজহাতে তাহা ঠিক করিয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে রোগীর পথ্য কিভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা রোগীর ঘরে নিজহাতে প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়া দিয়া আসিতেন। বাড়ীতে যে সকল রোগী চিকিৎসা করাইতে আসিতেন, তাঁহাদিগের প্রাথমিক পরীক্ষাদির জন্য তিনজন ডাক্তার বিধানচন্দ্রের সহকারী-রূপে কাজ করিতেন। সহকারী ডাক্তারের জন্য রোগীদের কোন অতিরিক্ত দর্শনী (ফী) দিতে হইত না। তাঁহাদের পারিশ্রমিক ডাঃ রায়ই দিতেন। নিয়ম ছিল সহকারী ডাক্তার প্রথমে রোগীর পরীক্ষাদি কাজ সারিয়া কেস্-বুকে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়া নিতেন। ডাঃ রায় প্রথমে কেস-বুকে লিখিত বিবরণ ও মন্তব্য পাঠ করিতেন এবং তারপর রোগীকে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিতেন। রোগীর রোগের নিদানে তাঁহার দক্ষতা

সমসাময়িক প্রবীণ চিকিৎকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। ব্যাধির হেতুর নির্ভুল দ্রুত নির্ণয়ে তাঁহার ক্ষমতাকে অসাধারণ বলা যাইতে পারে।

দরিদ্রের প্রতি বিধানচন্দ্র বরাবরই সহানুভূতিশীল। রোগীর বাড়ীতে যাইয়া যদি দেখিতেন রোগীর এমনই দুরবস্থা সে ডাক্তারের প্রাপ্য দর্শনী দিতে খুবই কষ্ট হইতেছে, তবে তিনি কখনও পীড়াপীড়ি করিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হইয়াছে যে.—রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা আংশিক দর্শনী যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহা দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন কিংবা সাহস করিতেছেন না; এরূপক্ষেত্রে ডাঃ রায় তাঁহার বাড়ীতে চ্যারিটি বক্সে সেই টাকা দিতে বলিয়া আসিতেন। মর্যাদার হানিকর অল্প ফী তিনি নিতেন না। বাড়ীতে যাইয়া যে সকল রোগী চিকিৎসা করাইতেন এবং দারিদ্র্যের দরুন অল্প ফী দিতে চাহিতেন, তাঁহাদের জন্যও পূর্বোক্ত নিয়ম ছিল। ডাঃ রায়ের বড় দাদা সুবোধচন্দ্র রায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রতি মাসে সেই দান-ভাণ্ডারে বেশ টাকা জমিত এবং সমস্তটাই দান করা হইত নানাবিধ সৎকার্যে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ডাঃ রায় কেবল চ্যারিটি বক্সের টাকাই দান করিতেন, আর কোন টাকা দান করিতেন না। পশ্চিমবঙ্গের মহামন্ত্রীর পদ গ্রহণের পূর্বে তাঁহার আয়ের পরিমাণ ছিল কত গুণ বেশী! তখন দানের পরিমাণও ছিল যথেষ্ট, বিশেষতঃ কংগ্রেসের কার্যে তাঁহার দান কর্মীমণ্ডলীতে সুবিদিত।

ডাঃ রায় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। প্রায় তেরো বৎসর সরকারী কাজ করিয়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তিনি সেই বৎসরই কার্যে ইস্তফা দিলেন। নব-প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (পরে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বন্ধীকরণের (affiliation-এর) অনুমোদন পাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি উহার ভেষজ-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ওই মহাবিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী ইতঃপূর্বে যে ডাক্তারকে পূর্বোক্ত পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষদ (Syndicate) তাঁহাকে উপযুক্ত মনে করেন নাই। জানাইয়া দেওয়া হইল যে,—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যদি ওই পদ গ্রহণে সম্মত হন, তবে সম্বন্ধীকরণের আবেদন মঞ্জুর করা হইবে। পরিচালকগণের পক্ষ হইতে প্রসিদ্ধ ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র ডাঃ রায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার দেখা পাইলেন। দুই জনে নিজ নিজ গাড়ী থামাইয়া নামিলেন। উভয়ের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য কথাবার্তা হইল। ডাঃ মিত্র ডাঃ রায়কে ইহাও জানান যে, সেই দিনই কয়েক ঘণ্টা পরে নিষদের

সভায় বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। এইরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার পরে মতামত জানাইবেন বলিয়া ডাঃ রায় সময় লইলেন না। তাঁহার মনের মধ্যে নিজের লাভ-লোকসানের প্রশ্ন জাগে নাই, জাগিয়াছিল একটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নটি হইল—তাঁহার অধ্যাপক-পদ গ্রহণের সম্মতি দানের উপর নির্ভর করিতেছে ওই বেসরকারী শিক্ষায়তনের ভবিষ্যৎ। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মতো একটা বিরাট প্রদেশে কলিকাতা মেডিকেল কলেজই ছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের একমাত্র কলেজ। বিদেশী-শাসনে শোষিত দেশে দরিদ্র জনগণের হিতার্থে কালোপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিকরণ যে অত্যাবশ্যক, তাহা তিনি অনুভব করিয়া আসিতেছেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই। সে সময়ে অখণ্ড ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় ওই শ্রেণীর ডাক্তারের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বাংলা দেশে প্রতি চল্লিশ হাজার জনে একজন শিক্ষিত ডাক্তার, পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে প্রতি আঠার শত জনে একজন। সুতরাং শাসিত বা শোষিত দেশের সঙ্গে শাসকের বা শোষকের দেশের শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যার তারতম্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্গতির করুণ চিত্র চোখের উপর ভাসিয়া উঠে।

ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, এম. ডি. এফ. আর. সি. এস্ (এডিন্) কলিকাতার তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা শস্ত্র-চিকিৎসকমণ্ডলীর অন্যতম। তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যু যথাক্রমে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ডাঃ রায়ের অপেক্ষা প্রায় পনর বৎসরের বড়। বয়োজ্যেষ্ঠ চিকিৎসক-প্রধানের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি জানাইলেন সঙ্গে-সঙ্গেই। ডাঃ রায় প্রস্তাবককে বেতন, চাকরির শর্ত, পদের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাদি সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেন নাই। কেননা তাঁহার মনে এইরূপ ভাবই জাগিয়াছিল যে,—ওই সকল প্রবীণ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দেশের কল্যাণ-কল্পে একটি উচ্চাঙ্গের মহাবিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা গড়িয়া তুলিবার কার্যে অগ্রণী হইয়াছেন এবং ত্যাগ স্বীকারও করিতেছেন, তবে তিনি যুবক (৩৭) হইয়াও কেন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন! তাঁহার কাছে এ যেন দেশমাতারই ডাক; সে ডাকে তিনি সাড়া দিবেন না কেন? ডাঃ রায় ড্রাইভারকে গাড়ী ফিরাইয়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে লইয়া যাইতে বলিলেন। সেখানে তদানীন্তন অধ্যক্ষ কর্নেল লেভেন্টনের করণে বসিয়াই পদত্যাগপত্র লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি তাহা পড়িয়া যেন অবাক হইয়া গেলেন! পত্রে পদত্যাগের হেতু লিখিত ছিল। অধ্যক্ষ

পদত্যাগপত্র গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেনঃ—ডাক্তার রায়! নয় মাসের ছুটি তো, আপনার পাওনা আছে। এখন ছুটির দরখাস্ত দিলেও তো আপনার কাজ হয়;—বলিয়া তাঁহাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া নয় মাসের বিদায়ের জন্য দরখাস্ত দিতে বারংবার অনুরোধ করেন। কেননা অধ্যক্ষ জানিতেন যে,—ডাঃ রায়ের মতো একজন লোকপ্রিয় শিক্ষক ও যশস্বী চিকিৎসককে হারানো ওই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এবং চিকিৎসা-কৃত্যকের (Medical Service-এর) অপূরণীয় ক্ষতি। ডাঃ রায় অধ্যক্ষকে সেই অনুরোধের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বিদেশী রাজের বংশবদ ভৃত্যরূপে রাজ-সেবার অনভিপ্রেত দায় হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন চিরদিনের জন্য। যে বাঞ্ছিত ক্ষণের জন্য এতদিন তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া গেল। উচ্চাভিলাষী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী যুবকের ঘটনাসংকুল জীবনের জয়যাত্রা চলিতে লাগিল নূতন পথ ধরিয়া।

দশম অধ্যায়

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে

বিধানচন্দ্র প্রবেশ করিলেন নূতন কর্মক্ষেত্রে—কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। পূর্বে কাজ করিতেছিলেন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে, বর্তমানে কাজ করিতেছেন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক রূপে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীকরণের (affiliation-এর) মঞ্জুরি দেওয়ায় ইহা পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে পরিণত হইল। মহানগরীর দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজের মর্যাদা পাইল ওই শিক্ষায়তনটি। ভারতবর্ষ পরাধীন থাকা কালে অখণ্ড বাংলাদেশে বহু শিক্ষায়তন বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখ করিতেছি :—সিটি কলেজ (কলিকাতা ও ময়মনসিং), বঙ্গবাসী কলেজ (কলিকাতা), রিপন কলেজ (কলিকাতা, বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), মেট্রোপলিটন কলেজ (কলিকাতা, বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ), ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশান (কলিকাতা), ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশান (বরিশাল), ভিক্টোরিয়া কলেজ (কুমিল্লা), মহসীন কলেজ (হুগলী) এবং নরসিংহ দত্ত কলেজ (হাওড়া)। ডাঃ রায় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাইলেন—বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র এবং স্বাধীনভাবে কাজ করিবার পূর্ণ সুযোগ। এই মহাবিদ্যালয়ে ভেষজ-অধ্যাপকের পদ গ্রহণের প্রায় তিন বৎসর পূর্বে (১৯১৬খ্রীঃ) তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদের (Senate-এর) সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ইতোমধ্যেই তাঁহার প্রতিভা, কর্মশক্তি, স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদি গুণ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা কম হয় নাই। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহা অবগত ছিলেন বলিয়া ডাঃ রায়ের পক্ষে কাজ করার বেশ সুবিধা হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তিনিও পরিচালকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হইলেন।

অধ্যাপনার আরম্ভেই ডাঃ রায় বিদ্যার্থিগণকে বুঝাইয়া দিলেন—কি কি গুণ থাকিলে আদর্শ চিকিৎসক হওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসা-বৃত্তি যে একটি মহৎ বৃত্তি, তাহা চিকিৎসককে মনে রাখিতে হইবে। সেই বৃত্তির সাফল্য নির্ভর করে চিকিৎসকের কোমলহৃদয়, ধৈর্যশীল প্রকৃতি এবং সমবেদনার উপর। তাঁহার শ্রদ্ধেয় আচার্য কর্নেল লিউকিসের নিকট হইতে তিনি যে আদর্শ-বাণী (motto) পাইয়াছিলেন, তাহা ছাত্রদের শুনাইলেন :—

"A heart that never hardens,
A temper that never tires,
A touch that never hurts."

অনুবাদ করিয়া দিলাম ঃ—

একটি এমন হৃদয়—
কঠোর হয় না যে কভু,
একটি এমন প্রকৃতি—
বিরাম চায় না যে কভু,
একটি এমন পরশ—
বেদনা দেয় না যে কভু।

ওই বাণী যাহাতে শিক্ষার্থিগণের দৃষ্টিতে পড়ে, সেইজন্য ডাঃ রায় একখানি বড় বোর্ডে তাহা সুন্দর করিয়া লিখাইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখাইলেন। তাঁহার অধ্যাপনা এত চিত্তাকর্ষক হইত যে, শ্রেণীর ভালো-মন্দ সমস্ত ছাত্রই তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। অধ্যাপনার সময়ে শ্রেণীর মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত। সুচিকিৎসক হইলেই যে সুঅধ্যাপক হওয়া যায়, কিংবা সুঅধ্যাপক হইলেই যে সুচিকিৎসক হওয়া যায়, তাহা নহে। কিন্তু ডাঃ রায়ের মধ্যে উভয়ের গুণাবলীই বিদ্যমান। সুতরাং কলেজের ছাত্রগণের তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান অধ্যাপকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

নূতন কর্মক্ষেত্রে বিধানচন্দ্র কাজ করিতে লাগিলেন নবোদ্যমে ও নবোৎসাহে। প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চাঙ্গের শিক্ষায়তন রূপে গড়িয়া তুলিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে জাগিল। তিনি পরিচালকমণ্ডলীকে তজ্জন্য নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শিক্ষায়তনটিকে স্কুল হইতে কলেজে উন্নীত করার তৃতীয় বৎসরে তিনি গ্রহণ করিলেন অধ্যাপকের পদ। কলেজে পরিণত হওয়া অবধি পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে (১৯১৬ খ্রীঃ—১৯৪১ খ্রীঃ) ইহার কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল, সেই বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার দুইটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—'ক্যালকাটা স্কুল অব্ মেডিসিন' এবং 'কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স য়্যাণ্ড সার্জনস্—একীভূত (amalgamated) হইয়া যায়। প্রথমটি স্থাপিত হইয়াছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং এক স্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পূর্বের নাম বদলাইয়া "দি ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল" নামকরণ হইল। ইহার বাড়ী নির্মাণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকায় খরিদ করা হয় কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বেলগাছিয়া রোডের পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড জমি। তারপর সত্তর

হাজার টাকা ব্যয়ে একটি দোতলা বাড়ী নির্মিত হইল; সেই টাকার মধ্যে আঠার হাজার টাকার দান পাওয়া গিয়াছে রাজপুত্র য়্যালবার্ট ভিক্টরের ভারত-আগমনের স্মারক ভাণ্ডার হইতে। সেই বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'য়্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল' নামে একটা আরোগ্যশালা স্থাপিত হইল। পূর্বোক্ত দুইটি শিক্ষায়তন একীভূত হওয়ার পর নাম দেওয়া হইল—'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল য়্যাণ্ড্ কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স্ য়্যাণ্ড সার্জন্স অব্ বেঙ্গল'। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের জন্য একটা ব্লক তৈয়ারী করিতে পনর হাজার টাকা এককালীন সাহায্য (ক্যাপিটাল গ্র্যাণ্ট) রূপে দান করিলেন। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ তখন সংলগ্ন বারো বিঘা জমি খরিদ করিয়া আর একখানা বাড়ী নির্মাণ করাইলেন। তৎকালে গৃহ-নির্মাণের জন্য পোস্তা রাজপরিবারের রানী কস্তুরী মঞ্জুরি-দান করেন সাঁইত্রিশ হাজার টাকা।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালকেরা ভারতসরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন। শিক্ষায়তনটি যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বন্ধী-করণের (affiliation-এর) মঞ্জুরি পাইতে পারে, তজ্জন্য ভারতসরকার আর্থিক সাহায্য দানে সম্মত হইলেন। ওই সাহায্য-প্রাপ্তি যাঁহাদের চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল:— স্যার শঙ্করণ নায়ার, কর্নেল এড্ওয়ার্ডস, লর্ড সিংহ, স্যার আর. এন. মুখার্জি, ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ভারতসরকার কয়েকটি শর্তে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। এককালীন দানরূপে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ (capital grant) নির্ধারিত হইল পাঁচ লক্ষ টাকা। যদি শিক্ষায়তনের পরিচালকমণ্ডলী সেই প্রস্তাবিত দানের অর্ধেক অর্থাৎ আড়াই লক্ষ টাকার দান সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে সরকার পূর্বোক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা দিবেন। তদুপরি বার্ষিক সরকারী সাহায্যের (recurring annual grant-এর) পরিমাণ নির্ধারিত হইল পঞ্চাশ হাজার টাকা। ওইরূপ বার্ষিক সাহায্য পাইতে হইলে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (Corporation) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে ত্রিশ হাজার ও দশ হাজার টাকার বার্ষিক সাহায্যের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। পরিচালকবর্গ শর্তগুলি পালন করিয়া পূর্বোল্লিখিত এককালীন ও বার্ষিক সাহায্য পাইলেন। পরিচালকবর্গের সংগৃহীত আড়াই লক্ষ টাকার মধ্যে স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার করিয়া দান করিয়াছেন। তাঁহাদের দানের অল্পকাল পরেই রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের নিকট হইতে বহির্ভেষজশালার (আউট্ডোর ডিস্পেন্সারীর) জন্য পাওয়া গেল পঁচাত্তর হাজার টাকার দান। ইহা ব্যতীত

তিনি হাসপাতালে আঠারখানা শয্যা বা 'বেড্'-এর ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দান করেন।

পরিচালকমণ্ডলীর অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল কলেজের উপযোগী হইয়া। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই বাংলার তদানীন্তন গবর্নর লর্ড কারমাইকেল কলেজটির উদ্বোধন করেন; তদবধি ইহা 'বেলগাছিয়া 'মেডিকেল কলেজ' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম এবং শেষ এম. বি. পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়া যায় যথাক্রমে ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠানকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-মহাবিদ্যালয়রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় লর্ড কারমাইকেল বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নাম দিলেন 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তিত 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল' নামে যে বেসরকারী শিক্ষায়তনটি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিল, উহার পরিচালনার জন্য একটি সংস্থা গঠিত হয়। উহা আইনমতে রেজেস্টারী করা হইল। সেই পরিচালকসংস্থার সদস্যগণের নাম উল্লেখ করিতেছি:—ডাঃ লালমাধব মুখার্জি (সভাপতি), ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর (কর্মসচিব), মিঃ আর. ডি. মেটা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ আর. কে. সেন, হরিপদ ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পূর্বোক্ত সংস্থার দ্বারাই শিক্ষায়তনটি পরিচালিত হইল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত। সেই বৎসরের ২০শে মার্চ ওই সংস্থার নাম বদলাইয়া 'মেডিকেল এডুকেসন সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' করা হয়। পরিচালনা-সংক্রান্ত বিধি-বিধানেরও কালোপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইল। আইনমতে উহার রেজিস্ট্রেসন হইল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জুলাই। তৎপূর্বে ২০শে মে হইতে নবগঠিত সোসাইটির বিধিবিধান চালু হইল। ইহার নিয়মানুসারে পরিচালক-পরিষদ গঠিত হইবে এইভাবে:—(১) সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট, (২) বাংলাসরকার কর্তৃক মনোনীত তিন জন সদস্য, (৩) কলিকাতা কর্পোরেশনের মনোনীত তিন জন সদস্য, (৪) কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারীগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত চার জন সদস্য, (৫) কলেজের অধ্যক্ষ (পদাধিকারে), (৬) মোট চৌদ্দ জন সদস্যের মধ্যে অবশিষ্ট দুই জন নির্বাচিত হইবেন সোসাইটির সদস্যগণ কর্তৃক এবং তন্মধ্যে একজনকে নিতে হইবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর বহির্ভূত শ্রেণী হইতে। পরিচালক-পরিষদ নূতন

নামে ('মেডিকেল এডুকেসন সোসাইটি') ও নূতনভাবে গঠিত হইলে পর উহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন লেফঃ কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হইলেন ডাঃ আর. জি. কর। তাঁহাদের কার্যকাল ছিল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন যথাক্রমে স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু (১৯২০—১৯২১ খ্রীঃ) এবং স্যার নীলরতন সরকার। শেষোক্ত প্রেসিডেণ্ট স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন প্রায় দশ বৎসর। তারপর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ (Principal) নিযুক্ত হইলেন ডাঃ এম. এন. ব্যানার্জি (১৯১৬—১৯২২ খ্রীঃ), দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্যার কেদারনাথ দাস (১৯২২—১৯৩৫ খ্রীঃ), তৃতীয় অধ্যক্ষ ডাঃ এম. এন. বসু, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যক্ষ যথাক্রমে ডাঃ এস. কে. সেন ও ডাঃ এ. কে. রায়চৌধুরী।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। প্রথম মহা-বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকা কালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং দ্বিতীয় মহা-বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকা কালে পূর্বোক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ইহার রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল (Vice-chancellor) ডক্টর সি. আর. রেড্ডি। সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ উদ্বোধনী ভাষণে মনীষী রেড্ডি আরম্ভেই ধর্ম, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাজাতিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলার অবদানের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে,—ওই সমুদয় ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাতে বাংলা যে নেতৃত্ব করিয়াছে তাহা ভারতবর্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল স্মরণীয় বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন—রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি. আর. দাস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি সরকারী শিক্ষা-নীতির—বিশেষ করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া সংশোধনের উপায়ও বলিয়া দেন। সরকারী মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যক্ষ (Principal)-এর পদে, যোগ্যতা বিচার না করিয়া কেবল আই. এম. এস. ভুক্ত ডাক্তারদের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখার ব্যবস্থা যে কিরূপ অন্যায় ও অনিষ্টকর, তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন। ডক্টর রেড্ডি বলেন যে সরকারী চিকিৎসা-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতে হইলে তাঁহাকে সিভিল সার্জনের শ্রেণীর (grade-এর)

রাজকর্মচারী হওয়া চাই। এইরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা ভারতের বাহিরে কোন দেশের কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিত আছে বলিয়া তিনি জানেন না।

তাঁহার ভাষণের একাধিক স্থলে ডাঃ বি. সি. রায়ের অবদানের উল্লেখ করা হইয়াছে। কলেজের অর্থ-ভাণ্ডারে যে সকল দানশীল ব্যক্তি দশ হাজার টাকা তদপেক্ষা অধিক টাকা দিয়াছেন তিনি তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন। সর্বোচ্চ দানের পরিমাণ তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা; সেই বিপুল দান পাওয়া গিয়াছে মিসেস্ মেরি হেলেনা মগার নামক একজন মানবহিতৈষিণী উদারহৃদয়া মহিলার নিকট হইতে। এক লক্ষ টাকা বা তাহার বেশী টাকা যাঁহারা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উদ্বোধনী-ভাষণে প্রদত্ত তালিকা হইতে দিতেছি :—ডাঃ লালবিহারী গাঙ্গুলী ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, রায় বাহাদুর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, বলাইচাঁদ দে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, রায় বাহাদুর ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, কৃষ্ণদাস কুণ্ডু ১ লক্ষ টাকা। ডক্টর রেড্ডি বলেন যে, ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে দাতার যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে, সংগঠক ও কর্মীর প্রয়োজনও তেমন আছে। তাঁহাদের নাম প্রকাশকালে তিনি মন্তব্য করেন যে, ঐ নামগুলি জাতীয় প্রভায় দীপ্ত; সংগঠক ও কর্মীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় রহিয়াছেন :—রায় বাহাদুর ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আর. জি. কর, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ এম. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, স্যার কেদারনাথ দাস, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, যতীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ এম. এন. বসু। বক্তা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুরাতন শিক্ষা-দান পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া বলেন :—উহার উদ্দেশ্য বুদ্ধি-বৃত্তির ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্বের যোগ্য করিয়া তোলা নহে, পরন্তু পরবশ্যতায় দক্ষ করিয়া তোলা। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটি মন্তব্যে আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছি। 'কেহই শিক্ষাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন, যদি তাঁহার এইরূপ উচ্চাভিলাষ না থাকে যে, তাঁহার ছাত্রদের মধ্যেই একজন সেই (শিক্ষাদাতার) আসনে বসিবার অধিকারী হইবেন।' শিক্ষাগুরুর সর্বাপেক্ষা গর্ব এই হওয়া উচিত এবং আদর্শ শিক্ষাগুরুর বেলাও তাহা হইয়াছেও যে তাঁহার ছাত্র-শিষ্যদের মধ্যে একজন সেই (শিক্ষাগুরুর) আসনে বসিবার যোগ্য হইবেন। অক্সফোর্ড এবং কেম্‌ব্রিজের বিদ্যার্থিগণের বেলায় কি হইতেছে, দেখুন। ওই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরাই শিক্ষা-সমাপনান্তে

অধ্যাপকের আসনে বসেন। শিক্ষার্থিগণের মধ্য হইতে অধ্যাপক নির্বাচনে স্থানগত বা জাতিগত প্রশ্ন ওঠে না।

মনীষী রেড্ডি চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারের শিক্ষা-দান ব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া বলেন:—মেডিকেল কলেজগুলিকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে, যেন ওই সমুদয় হইতে শিক্ষার্থীরা সরকারের চিকিৎসা-বিভাগের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের উপযোগী হইয়া আসিতে পারে। আই. এম. এস. ভুক্ত ডাক্তারদিগকেই কেবল উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কোন ভারতীয় তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহাদের আসনে বসিবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষার পরিমাণ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ওই শ্রেণীর শিক্ষাদাতাদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা ও ক্ষমতা কতটা আছে। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানের সংস্কার সাধনের প্রসঙ্গে আসিয়া বলেন:—ডাঃ বি. সি. রায় ভারতের চিকিৎসা-ক্ষেত্রের নেতা। (তাঁহাদের মতো শুভ-সূচক নক্ষত্র দীপ্যমান থাকিতেও আমরা যদি চিকিৎসা-বিদ্যায়তনগুলির অত্যাবশ্যক পুনর্গঠনের কাজ করাইয়া লইতে না পারি, তবে দেশের ও উহার ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা চরম দুর্ভাগ্য বলিয়া আমি মনে করিব।) "Dr. B. C. Roy is the Medical Leader of India. If with all these propitious stars in the ascendant, we cannot get the much needed re-organisation effected, I should consider it greatest misfortune to the country and its future."

'মেডিকেল এডুকেসন সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' নামক যে সমিতি কলেজটি পরিচালনা করিতেছেন, উহার প্রেসিডেণ্ট স্বরূপ ডাঃ রায় রজত-জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রথম দিন (১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রীঃ) এক ভাষণ দিয়াছেন। তাহাতে কলেজের বিগত পঁচিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। সেই ইংরাজী ভাষণের কতকাংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম:—

"সুদূর অতীতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্নমেণ্ট কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিগত (উনবিংশ) শতাব্দীর অষ্টম দশকের কোন এক সময়ে ইহা অনুভূত হইয়াছিল যে, বাংলা দেশের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সরকারী শিক্ষায়তনগুলি যথেষ্ট নহে; সেইজন্য অষ্টম দশক হইতে নবম দশকের মধ্যে কলিকাতায় চারিটি বেসরকারী শিক্ষায়তন স্থাপিত হইল। চিকিৎসাজীবীরাই ছিলেন ওই সমুদয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

ডাঃ আর. জি. কর এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন। ইহার পরিচালনার জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া উহাকে রেজেস্টারি করা হইল। অপর তিনটির মধ্যে একটি স্থাপন করেন ডাঃ এস. কে. মল্লিক ও ডাঃ বি. বসু. দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ফার্নাণ্ডেজ্ এবং তৃতীয়টির স্থাপয়িতা ডাঃ বি. কে. বসু ও কর্নেল এন. পি. সিংহ। আমরা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করি। সরকার তদুত্তরে জানাইলেন যে,—সমস্ত বেসরকারী, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায়তনগুলিকে একীভূত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক এবং উহার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলির একীকরণ (amalgamation) সম্ভবপর হয় নাই। সে যাহা হউক ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকার কতকগুলি সাপেক্ষ এই বিদ্যায়তনকে আর্থিক সাহায্য দান করিতে সম্মত হইলেন। পরিচালকসংস্থা সেই সমুদয় শর্ত পালন করিতে সমর্থ হইল।

"বিগত পঁচিশ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির পথে কিরূপ অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে—ছাত্র, শয্যা ও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কার্যের পরিমাণ হইতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে,—এই প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীদের কার্যোপযোগী বিজ্ঞানের বিষয়গুলির শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিয়াছে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শয্যার সংখ্যা ছিল সত্তর, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের শয্যার সংখ্যা ৫ শত ৩১ হইয়াছে; ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ শত, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের ছাত্রসংখ্যা হইয়াছে ৮ শত ৮৩ জন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বহির্বিভাগগুলিতে ১৬ হাজার রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে; ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা এবং অন্তর্বিভাগগুলিতে হইয়াছে ৭ হাজারের বেশী রোগীর চিকিৎসা। বিগত পঁচিশ বৎসরে কলেজে ভর্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে মোট ২৩ হাজার ৯৩ জন ছাত্রের নিকট হইতে; ওই সকল দরখাস্ত আসিয়াছে—মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতনা ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং এমনকি বহির্ভারতের ব্রহ্ম, সিংহল, স্টেট্স্ সেটলমেন্টস্ প্রভৃতি দেশগুলি হইতেও। দরখাস্তকারীদের মধ্যে ২ হাজার ৪ শত ৮৮ জন ছাত্রকে আমরা ভর্তি করিতে পারিয়াছি। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠান ভারতের সমস্ত অঞ্চলের জনগণের বিদ্যায়তন হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় বিদ্যার্থিগণ শিক্ষা-সমাপনান্তে নিজ নিজ অঞ্চলে যাইয়া রুগ্‌ণ মানবকে নিরাময় করিতে আত্মনিয়োগ করেন। বিগত পঁচিশ বৎসরে যে ২ হাজার

৪ শত ৮৮ জন ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ১ হাজার ৩ শত ৬৬ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। ওই সমুদয়ের কতক ছাত্র স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন পাইয়াছে ডক্টরেট এবং ১৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে অবস্থিত বিভিন্ন রয়েল কলেজের ফেলোসিপ পরীক্ষায়, ২৭ জন পাইয়াছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ডিপ্লোমা; ১৫৬ জন এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন স্নাতকোত্তর বিষয় অধ্যয়নান্তে পাইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি., এম. এস, এম. ও, এম. এস-সি. এবং ডি. পি. এইচ্. ও ডি. টি. এম. ডিপ্লোমা।

"ইহা আনন্দের বিষয় যে, এই শিক্ষায়তনের বহুসংখ্যক ছাত্র ডাক্তার হইয়া দেশের নানা অঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন।

"চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা কখনও সন্তোষজনক হইতে পারে না, যদি সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজও না চলে। সেইজন্য কলেজের পরিচালকবর্গ তদ্বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং 'স্যার নীলরতন সরকার রিসার্চ ইনস্টিটিউট' নামে একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে। সেখানে সম্পন্ন কার্যাবলীর মধ্যে অনেকগুলিই স্বদেশে এবং বিদেশে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এই মহাবিদ্যালয়ে যে পাঠাগার আছে, উহার গ্রন্থাদির সংখ্যা ২০ হাজারেরও অধিক। স্যার কেদারনাথ দাস তাঁহার সংগৃহীত স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিতন্ত্র বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ, মাসিক পত্রাদি এবং দর্শনীয় যন্ত্রপাতি পাঠাগারে দান করিয়া গিয়াছেন।

"১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তনের যাবতীয় সম্পত্তির মোট মূল্য ছিল ৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি ও গৃহাদির মোট মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক। গৃহ-মধ্যস্থ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং নানাবিধ জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত নহে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে যন্ত্রপাতির সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। ভেষজের বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা-পদ্ধতির যথেষ্ট পরিবর্তন হওয়ায় চিকিৎসার ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভেষজের বিবিধ বিভাগে গবেষণার সঙ্গে যদি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার সম্বন্ধ না থাকে, তবে সেই শিক্ষা নিরর্থক। সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক চিকিৎসার জন্য প্রচুর ব্যয় আবশ্যক। আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় আমরা সেই ব্যয় বহন করিতে পারি না।"...

ডাঃ রায় কলেজের পরিচালক-পরিষদের (মেডিকেল এডুকেসন সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এর) সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত। কলেজের পুনর্গঠনে ও সম্প্রসারণে তাঁহার অবদান প্রশংসনীয়। জাতি ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধনার্থ তিনি যখন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া ওই শিক্ষায়তনে গেলেন, তখন উহা মাত্র তিন বৎসরের শিশু। যখন তিনি পরিচালক-পরিষদের সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত হইলেন, তখন উহা পঁচিশ বৎসরের যুবক—প্রাণ-চাঞ্চল্যে পূর্ণ। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার এক বৎসরের মধ্যেই (১৯৪৮ খ্রীঃ ২রা মার্চ) কলেজের নাম পরিবর্তিত করিয়া 'আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ' নাম দেওয়া হইল। ডাঃ রায় অদ্যাবধি বিদায়-ভোগী অধ্যাপকের পদে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির সহিত সাঁইত্রিশ বৎসরের (১৯১৯ খ্রীঃ—১৯৫৬ খ্রীঃ) সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ

ডাঃ বিধান রায়ের সক্রিয় রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন কংগ্রেসে গান্ধী-যুগের পঞ্চম বৎসর। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদের প্রার্থী হইয়াই তিনি প্রকাশ্যে প্রথম রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিলেন। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার মনের গতি রাজনীতির দিকে যাইতেছিল। পরাধীন দেশের রাজনীতি যে স্বাধীন দেশের রাজনীতি অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহা তিনি জানিতেন। কেননা পরাধীন দেশের রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল—শক্তিশালী বিদেশী শাসকমণ্ডলী হইতে ন্যায্য অধিকার আদায় করা; সে অধিকার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের অধিকার। ইহা যে কঠিন কাজ তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য বিধানের প্রকৃত অনুরাগ ছিল বলিয়াই তাঁহার মন সেই কষ্টসাধ্য কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। যে রাজনীতিক পটভূমিকায় তাঁহার মানসিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, উহার কতক বর্ণনা এস্থলে আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। সেই বর্ণনা হইল কংগ্রেসে গান্ধী-নেতৃত্বের গোড়ার কথা। তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী-যুগ আরম্ভ হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন প্রথম মহা বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের বিশ বৎসর কাটিয়া গেল দক্ষিণ আফ্রিকায়—লাঞ্ছিত অসহায় প্রবাসী ভারতীয়গণের সেবায়। তথায় তাঁহার পরিচালিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক অর্ডিন্যান্স বাতিল করার মধ্য দিয়া। সেই বৎসরই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন-; যেহেতু তিনি স্থির করিয়াছেন যে, এখানে থাকিয়াই দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। তাঁহার মতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার কর্তব্য কার্য সম্পন্ন হইয়াছে; অবশিষ্ট কার্য তথাকার ভারতীয়গণ সম্পাদন করিতে পারিবেন। পরের বৎসর গান্ধীজী লোক-সেবার উদ্দেশ্যে আমেদাবাদের একটা গ্রামে আশ্রম স্থাপন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১৯১৭ খ্রীঃ) সেই আশ্রম স্থানান্তরিত হয় সবরমতিতে।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অন্যতম স্মরণীয় অবদান। বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবরা চাষীদিগের উপর নানাভাবে জোর-জুলুম ও অত্যাচার অবিচার করিতেন। গান্ধীজীর প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ অভিযান পরিচালিত হইল তাঁহাদের বিরুদ্ধে। বিদেশী সরকার

এবং তদাশ্রিত ইংরেজ নীলকর উভয়ে মিলিয়া প্রবল ভাবে সে অভিযানের বিরোধিতা করেন। চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবদের অধ্যুষিত অঞ্চলে যাইয়া তিনি কৃষকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবেন এবং তাহাদের নিকট যথার্থ বিবরণ জানিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এপ্রিল মাসে গান্ধীজী প্রথমে মজঃফরপুর শহরে পৌছেন এবং অধ্যাপক জে. বি. কৃপালনীর গৃহে তাঁহার অতিথিরূপে বাস করেন। সেখানে বিহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মজঃফরপুর হইতে তিনি গেলেন চম্পারণ জেলার সদর মতিহারীতে। তথা হইতে দলবলসহ যাত্রা করিলেন গ্রামাঞ্চলে। অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করার পূর্বেই গান্ধীজীর উপর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইল। তিনি পরবর্তী ট্রেনে চম্পারণ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। সেই আদেশ মানিবেন না বলিয়া গান্ধীজী জানাইয়া দেন। সঙ্গীয় সহকর্মীদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে যাইয়া অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করিতে উপদেশ দিয়া তিনি মতিহারী শহরে ফিরিয়া আসিলেন। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে তিন দিন পরে মতিহারীর সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে তাঁহার বিচার হইবে বলিয়া সমন জারী করা হইল। বিচারের দিন এবং পরদিন সেখানে গেলেন—মিঃ পোলক, দীনবন্ধু এণ্ড্রুস, মৌলানা মজহরল্ হক (ব্যারিস্টার), ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ (বিহার সরকারের মন্ত্রী) এবং বিহারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, গান্ধীজীর কারাদণ্ড হইলে তাঁহার আরব্ধ কর্ম তাঁহারা সম্পন্ন করিবেন। তজ্জন্য একটি কার্যক্রম রচিত হইল। শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

সমন জারীর তৃতীয় দিবসে গান্ধীজীর বিচার হইল। তিনি অভিযোগ স্বীকার করিলেন এবং এক লিখিত বিবৃতি বিচারালয়ে দাখিল করিয়া জানাইয়া দিলেন—কি কারণে তিনি নিষেধাজ্ঞা মানেন নাই। বিচারের দিন আদালতের প্রাঙ্গণে এবং নিকটবর্তী স্থানে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বিরাট জনতার বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চল হইতে আগত কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি সাধারণ জন। অভিযোগ স্বীকার করা সত্ত্বেও রায়দান স্থগিত রহিল। তৃতীয় দিবসে সংবাদ আসিল যে, বিহার সরকার গান্ধীজীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করিয়াছেন। অধিকন্তু জেলা-কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে সরকারী নির্দেশ আসিয়াছে—যেন গান্ধীজীর তদন্ত-কার্যে সর্বপ্রকার সম্ভবপর সাহায্য করা হয়। সরকারের তরফ হইতেও একটি তদন্ত-কমিটি নিয়োগ করা

হইল। মধ্য প্রদেশের গবর্নর মিঃ স্লাই চেয়ারম্যান এবং গান্ধীজী সদস্য মনোনীত হইলেন। মাত্র একপক্ষ কালের মধ্যে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম যেন দ্রুত সংঘটিত নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জয়যুক্ত হইল। নিপীড়িত প্রজাগণের মন হইতে ভয় দূর হইয়া গেল। তাঁহারা নীলকর সাহেবদের জোর-জুলুম এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার মতো মনোবল পাইল। বেগতিক দেখিয়া নীলকর সাহেবরা তল্পিতল্পা গুটাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

চম্পারণ সত্যাগ্রহে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী-যুগের প্রবর্তন হয়। গান্ধীজীর পরবর্তী দুইটি অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল—খয়রায় কৃষকগণের পক্ষে এবং আমেদাবাদে কাপড়ের কলে শ্রমিকদিগের অনুকূলে। এই তিনটি সফল সত্যাগ্রহের অভিযানে তাঁহার সুখ্যাতি ভারতে ও বহির্ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের গণ-চিত্তে তিনি যে আসন পাইলেন, তাহা ইতঃপূর্বে আর কোন নেতা পান নাই। এদেশে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃত যে মহাত্মা গান্ধী, সেই ঐতিহাসিক সত্য গান্ধী-বিরোধীগণও অস্বীকার করিতে পারেন না।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহা বিশ্বযুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হইল। পরের বৎসর জুলাই মাসে বোম্বেতে সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হইল, তাহাতে প্রস্তাবিত মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান হয়। সেই অধিবেশনের পরে ওই বৎসরই দিল্লীতে পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। তাহাতে মধ্যপন্থী (মডারেট) দল যোগদান করে নাই। এতকাল ভারতের ওই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ছিল মধ্যপন্থী নেতাদেরই হাতে। তাঁহারাই ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু জাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহারা আর চলিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের কংগ্রেস ছাড়িয়া যাইতে হইল। ইতোমধ্যে রাউলাট কমিটির (সিডিশান কমিটির) সুপারিশ মতে জনগণের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে (কেন্দ্রীয় আইনসভায়) নূতন দমনমূলক আইন পাস হইয়া যায়। সেই আইনের বলে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের অজুহাতে ভারতবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায্য অধিকার হরণ করা হইল। প্রতিবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল প্রভৃতি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। পূর্বোক্ত দিল্লী অধিবেশনে সেই আইন প্রত্যাহার করার দাবি জানান হয়। আর একটি

প্রস্তাবে যুদ্ধান্তে ইউরোপে যে শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের দাবি জানান হইয়াছে এবং লোকমান্য তিলক, গান্ধীজী ও মিঃ সৈয়দ হাসান ইমামকে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হইয়াছে। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইল—যুদ্ধের ব্যয়-ভার হইতে ভারতকে অব্যাহতি দিবার দাবি জানাইয়া।

কংগ্রেসে গান্ধী-যুগ প্রবর্তিত হওয়া অবধি কংগ্রেস-পন্থীরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন সংগ্রামের পথে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। ৩০শে মার্চ রাউলাট আইনের প্রতিবাদে হরতাল পালনের জন্য গান্ধীজী সমগ্র জাতিকে আহ্বান করেন। বিশাল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় জনগণ সাড়া দিল সেই আহ্বানে। দিল্লীতে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিস গুলি চালায়, ফলে অনেকে হতাহত হইল। প্রতিবাদে পুনরায় হরতাল পালন করা হয় ৬ই এপ্রিল। ওই দিন অমৃতসরে পুলিস জনতার উপর গুলি চালাইলে বহু লোক হতাহত হয়। পাঁচ দিন পরে জেনারেল ডায়ারের উপর ন্যস্ত হইল তথাকথিত শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার। ১৩ এপ্রিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত অন্যূন দশ সহস্র নিরস্ত্র হিন্দু, মুসলমান ও শিখের উপর ডায়ারের আদেশে সৈন্যগণ নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করিল। পুরুষের সঙ্গে নারী শিশু ও বৃদ্ধ শত শত ভারতবাসী নিহত হইল, যাহারা আহত হইয়াও প্রাণ হারায় নাই তাহাদের সংখ্যাও শত শত ; ওই নৃশংস বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হইল। সেই বৎসরই অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। পাঞ্জাবে হত্যাকাণ্ড এবং নিগ্রহ-নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সেই সংস্রবে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে অভিযুক্ত করার এবং বিলাতে তলব করার দাবি জানান হয়। অন্য এক প্রস্তাবে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার অগ্রাহ্য করা হয়। অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীজীর অপূর্ব লোকপ্রিয়তার পরিচয় মিলিল বিরাট জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন হইতে।

পরবর্তী বৎসর (১৯২০ খ্রীঃ) লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে—ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীর সন্নিকটে পূর্বদিকস্থ বৃহৎ উদ্যানে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। তাহাতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই আন্দোলনকে সফল করার জন্য যে কার্যক্রম গৃহীত হইল, তাহাতে ছিল :— আইনসভা বর্জন, সরকার-প্রদত্ত খেতাব, সরকারী দরবার এবং সরকারী ও আধা-সরকারী অনুষ্ঠানাদি বর্জন, স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া জাতীয় শিক্ষা-

প্রতিষ্ঠানে যোগদান, আদালত বর্জন ও সালিসী আদালত গঠন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধী যে ভারতের অবিসংবাদী নেতা, উহার প্রকাশ্য স্বীকৃতি হইল সেই অধিবেশনে। ডাঃ বিধান রায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করেন। বিরাট সভামণ্ডপে সমবেত বিশ-পঁচিশ হাজার নরনারী—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি ও দর্শক—যেভাবে ওই মহান নেতাকে অভিনন্দিত করিলেন, তাহা দেখিয়া ডাঃ রায় বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে ইতঃপূর্বে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি ওই পর্যন্ত বিগত ৩৪ বৎসরের মধ্যে কোন দেশনায়ক জনগণের নিকট হইতে এমন আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পান নাই। অল্প কাল মধ্যেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটিল। এতকাল কংগ্রেস ছিল ধনী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংস্থা। তিনি ইহাকে রূপান্তরিত করিলেন সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রতিষ্ঠানে। জেলা, মহকুমা এবং থানা ব্যতীতও গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হইল। এইভাবে কংগ্রেস সুসংহত ও সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। সেই বৎসরই কংগ্রেসের ৩৫তম অধিবেশন হইল নাগপুরে বিজয়রাঘব আচারিয়ার সভাপতিত্বে। চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে 'দেশবন্ধু') ও লাল লাজপত রায় গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সমর্থন করায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি আলোচ্য অধিবেশনে পুনরায় অনুমোদিত হইল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রেরও আমূল পরিবর্তন হয়। গান্ধীজী সমগ্র জাতিকে আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল দেশের অগণিত মুক্তিকামী নরনারীর নিকট হইতে।

পরের বৎসর (১৯২১ খ্রীঃ) আমেদাবাদে হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসিল, তাহাতে গান্ধীজীকে আন্দোলন পরিচালনার্থ সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মাত্র চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি জাতির কিরূপ বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। ভারতে অহিংস পন্থায় রাজনীতিক সংগ্রাম এই প্রথম। সেই অভিনব পন্থার প্রদর্শকও গান্ধীজী। তিনিই সর্বপ্রথম পাইলেন একনায়কত্বের (dictatorship-এর) ক্ষমতা—যাহা কংগ্রেসের জন্মাবধি আর কোন নেতা ইতঃপূর্বে পান নাই। আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল সমগ্র ভারতবর্ষে। লক্ষাধিক নরনারী কারাবরণ করিলেন। বিদেশী রাজের নিগ্রহ-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগেও আন্দোলন মন্দীভূত হয় নাই। কিন্তু অকস্মাৎ সর্বাধিনায়কের নিকট হইতে আদেশ আসিল যুদ্ধ-বিরতির।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল। গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে পুলিসবাহিনীর আক্রমণে বিপুল জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং পালটা আক্রমণ চালাইয়া একজন দারোগা ও একুশ জন কনস্টেবলকে পুড়াইয়া মারে। ইহাতে গান্ধীজীর উপর যে প্রতিক্রিয়া হইল, তাহারই ফলে তিনি দেশ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উপযোগী হয় নাই যুক্তি দিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎকালে এই বিশাল দেশে নূতন আন্দোলন চলিতেছিল বর্ষা-সমাগমে বন্যা-প্লাবনের দুর্নিবার স্রোতের মতো। কিন্তু এইভাবে আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অসংখ্য সত্যাগ্রহী সৈন্যের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইল। নেতৃবর্গের অনেকেই গান্ধীজীর এই আদেশকে অসমীচীন বলিয়া প্রতিকূল সমালোচনা করিলেন। তাঁহাদের মতে—ভারতবর্ষের ন্যায় একটা বিরাট দেশে কোন অঞ্চলে সাময়িক উত্তেজনার মুখে অল্পসংখ্যক লোক যদি হিংসার পথ অবলম্বন করে এবং সেই হেতুতে যদি আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তবে কোনকালেই তাহা চালানো সম্ভবপর হইবে না। পরে গান্ধীজীও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি ভুল করিয়াছেন। সেই ভুলকে তিনি 'Himalayan blunder' অর্থাৎ হিমাদ্রি-প্রমাণ ভুল বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। সাধারণ নেতারা কখনও এইরূপ ক্ষেত্রে নিজের ভুল স্বীকার করেন না, পাছে যদি বা নেতৃত্বের পদ হইতে অপসারিত হইয়া যান। কিন্তু গান্ধীজী একজন অনন্যসাধারণ নেতা। তাঁহার পন্থা এবং নীতি ছিল অসাধারণ। তাঁহার ওই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া যে সৎসাহস প্রকটিত হইল, তাহাতে গান্ধী-নেতৃত্বে জনগণের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন হইল গয়াধামে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সংস্রবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কলিকাতায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দণ্ড ভোগ করার কালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। দণ্ডকাল শেষ হইবার পরেই কংগ্রেসের অধিবেশন। তিনি গয়ায় যাইয়া সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। অপর এক প্রস্তাবে দেশের শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা স্থির হয় এবং তজ্জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। দেশবন্ধু মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারকে সংশোধন কিংবা সংহার করার উদ্দেশ্যে (to mend or end) আইনসভায় প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং

চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীয়া উহার বিরোধিতা করিলে দেশবন্ধুর প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, এন. সি. কেলকার প্রমুখ নেতৃবর্গের সহিত মিলিয়া 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী দল গঠন করিলেন। সেই বৎসরই মার্চ মাসে গান্ধীজীকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তিনি সত্যাগ্রহের নীতি অনুসরণ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। বিচারে তাঁহার প্রতি ছয় বৎসরের কারাদণ্ড ভোগের আদেশ হইল। গান্ধীজী কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় দণ্ড-ভোগের দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে মুক্তি পাইলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে। তাহাতে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, এন. সি. কেলকার প্রস্তাবিত আইনসভায় প্রবেশের নীতি পুনরায় আলোচিত হইল। সেই নীতির সমর্থক নেতৃবর্গ বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আইনসভায় প্রবেশ করিবেন না; তথায় যাইয়া নব-প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থার (Diarchy) সংস্কার করিবেন, আর যদি তাহা সম্ভবপর না হয় তবে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া উহাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিবেন। স্বরাজ্য দলকে আইনসভায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। সেই বৎসরের শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে নির্বাচন হইল, তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্বরাজ্য দল জয়ী হইল।

বৎসর তিনেক পূর্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিল বয়কটের অর্থাৎ আইনসভা বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর মধ্যপন্থী বা নরম দলের এবং বিদেশী সরকারের কায়েমী সমর্থক 'জো হুকুম' দলের আইনসভায় প্রবেশের সুবর্ণসুযোগ জুটিল। সেই সুযোগের পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করিলেন উভয় দলই। তৎকালে রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেশ এতটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল যে, অধিকাংশ দেশবাসী দুইটি দলের মধ্যে কোন পার্থক্য জানিতেন না। বস্তুতঃপক্ষে মধ্যপন্থীদের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাবের এমন অধোগতি হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে সরকার-ঘেঁষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইলেন। স্বদেশী যুগে তিনি ছিলেন বয়কট আন্দোলনের পুরোভাগে। সে-কালে তিনি এতটা লোকপ্রিয় ছিলেন যে, দেশবাসী তাঁহাকে বাংলার অনভিষিক্ত রাজা ('Uncrowned King of Bengal') বলিতেন। রাজনীতিক অগ্রগতি

সাধনে তাঁহার অবদান এত বেশী যে, রাষ্ট্রগুরু বলিয়া তিনি অদ্যাবধি অভিহিত হইতেছেন। কংগ্রেসের স্রষ্টাদের তিনি অন্যতম। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীতে সুরেন্দ্রনাথকে আসন দেওয়া হইল। বেতন ধার্য হইল বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা। এইজন্য দেশের লোক সে-কালের মন্ত্রীদের বলিত 'চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী।' অপর মন্ত্রী মনোনীত হইলেন প্রভাস চন্দ্র মিত্র—যিনি রাউলাট কমিটির সদস্যরূপে কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্রীর পদ পাইলেন নবাব নবাবালি চৌধুরী। যে শাসন সংস্কার কংগ্রেস গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে, উহাকে চালু করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করায়, সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মধ্যপন্থী নেতার বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে জোরালো প্রচার চলিতে লাগিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে 'চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী' সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার সদস্য-পদের প্রার্থী হইলেন। ভোট-যুদ্ধের রণাঙ্গন হইল উত্তর ২৪ পরগনা মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী। প্রবীণ জননায়কের প্রতিপক্ষ হইলেন রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। 'শত যুদ্ধের বীর যোদ্ধার' বিরুদ্ধে বিধানচন্দ্র স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে দাঁড়াইলেন। স্বরাজ্য দল আইনসভায় প্রবেশের জন্য কংগ্রেসের অনুমতি পাইবার পূর্বেই ডাঃ রায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ মতে স্থির করিয়াছিলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে তিনি প্রতিযোগিতা করিবেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত গবর্নমেণ্টের বিরোধ চলিতেছিল। আশুতোষের ইচ্ছা, বিধানের মত একজন তেজস্বী, স্পষ্টবাদী, কর্মদক্ষ বিতর্কবিদ্‌ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হউক। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়েরও যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদের (Senate-এর) নির্বাচিত সদস্যরূপে বিধান কয়েক বৎসর যাবৎ যেভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আশুতোষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছেন। নির্বাচকমণ্ডলী বাছিয়া লইবার ব্যাপারে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন বিশিষ্ট সদস্যের উপদেশ পাইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নির্বাচন-প্রার্থী হওয়া ডাঃ রায়ের পক্ষে দুঃসাহসিকতার কাজ বলা যাইতে পারে। কেননা স্বরাজ্য দলের প্রচারের ফলে তাঁহার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পাইলেও তখনও তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি কম নহে। কিন্তু বিধানচন্দ্রের ঘটনাবহুল জীবনের কার্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কার্য দুঃসাহসিক বলিয়া তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। দেশবন্ধুর সঙ্গে স্বরাজ্য দলে যোগ দিয়া মনোনয়ন নেওয়া

সম্পর্কেও তাঁহার আলোচনা হইল। তিনি দেশবন্ধুকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে,—স্বরাজ্য দল নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় নামিবার পূর্ব হইতেই তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে ভোটদাতাদের কাছে যাতায়াত করিতেছেন এবং সেইভাবে প্রচারকার্যও চালানো হইতেছে। সুতরাং সেই অবস্থায় যদি তিনি স্বরাজ্য দলে প্রকাশ্যে যোগদান করেন, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের দল প্রচার করিবার সুবিধা পাইবে। ওই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার কোন কারণ দেশবন্ধু দেখিতে পান নাই। উভয়ই বিশিষ্ট ব্রাহ্মপরিবারের সন্তান বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে জানাশুনা আগে হইতেই ছিল। বিধানের প্রতিভা, তেজস্বিতা, স্বদেশসেবার আগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদের সদস্যরূপে কার্যাদি সম্বন্ধে দেশবন্ধু সবিশেষ অবগত ছিলেন। আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যে স্বরাজ্য দলের বিপক্ষে যাইবেন না কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন না, তাহাও দেশবন্ধুর অজানা ছিল না। অতএব তিনি স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে প্রকাশ্যভাবেই বিধানচন্দ্রকে সমর্থন করিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর (১৩৩০ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ) ভোট গণনার ফলাফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে, একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেন্দ্রনাথকে বহু ভোটে পরাজিত করিয়া বিধানচন্দ্র জয়লাভ করিয়াছেন। পরের দিনের (১লা ডিসেম্বর) অমৃতবাজার পত্রিকায় সেই সংবাদ প্রকাশিত হইল এই শিরোনামায়—

> "Sir Surendra Nath Banerjee Defeated
> "An object lesson to supporters of Bureaucracy
> "Dr. Bidhan Chandra Roy Elected
> "People's Victory at Barrackpur."

ওই শিরোনামা ছিল গোটা পৃষ্ঠা জুড়িয়া। সেই সংবাদে আছে—মোট ১১,৬৬০ জন ভোটারের মধ্যে ৮০২৯ জন ভোট দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫৮টি ভোট অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিধান রায় পাইয়াছেন ৫৬৮৮ ভোট এবং সুরেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন ২২৮৩ ভোট। ভোট-গণনার ফলাফল জানিবার জন্য আলিপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের প্রাঙ্গণে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে বিরাট জনতা অপেক্ষা করিতেছিল। বিধানচন্দ্রের জয় এবং সুরেন্দ্রনাথের পরাজয় ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'মহাত্মা গান্ধীকী জয়', 'সি. আর. দাশকী জয়', 'ডাঃ বি. সি. রায়কী জয়'। ডাঃ রায়—যিনি সাদা ধুতি জামা পরিয়া ভোট-গণনাকালে উপস্থিত ছিলেন—শ্রবণ-বিদারী জয়ধ্বনির মধ্যে মাল্যভূষিত হইলেন। পূর্বোক্ত নির্বাচনে ভোট গৃহীত হইয়াছিল ২৬শে

নভেম্বর। পরবর্তী দিবসের (২৭শে নভেম্বরের) অমৃত বাজার পত্রিকায় 'ব্যারাকপুরের সংগ্রাম—ডাঃ রায়ের নিশ্চিত জয়' শিরোনামায় বিশেষ সংবাদদাতার প্রদত্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে,—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার স্বরাজ্য দল কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার মতামত হইতে জানা যায় যে, স্বরাজ্য দলের কার্যক্রম তিনি সাধারণতঃ সমর্থন করেন। সংবাদের পূর্বোল্লিখিত অংশটি এই :—

"The Battle of Barrackpur.

"Dr. Roy's sure success.

"Dr. Bidhan Chandra Roy was backed by the Swarajya Party of Bengal inasmuch as his views show that he generally supports the programme of the Swarajya Party. "……

সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ের সংবাদের সঙ্গে একই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল অন্যান্য মধ্যপন্থী নেতার পরাজয়ের সংবাদ। স্যার নীলরতন সরকার এবং মিঃ এস. আর. দাশ ব্যারিস্টার (দেশবন্ধুর আপন জেঠতুত ভাই) পরাজিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে স্বরাজ্য দলের বিজয়কৃষ্ণ বসু এবং শ্রীসাতকড়িপতি রায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। আনন্দবাজার পত্রিকার তখন শৈশব। তৎকালে সেই পত্রিকা ছিলেন গান্ধীজীর গোঁড়া ভক্ত—'নো চেঞ্জার' ('No Changer') দলভুক্ত। ইঁহারা গান্ধীজীর কার্যক্রমের কোন প্রকার পরিবর্তন সমর্থন করিতেন না। ওই দলের কর্মীরা স্বরাজ্য দলের আইনসভায় প্রবেশের নীতির বিরোধী ছিলেন। সুতরাং আনন্দবাজার পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়-বার্তা স্বরাজ্য দলের সমর্থক অমৃতবাজার পত্রিকার মতো জমকালো ও আকর্ষণীয় করিয়া প্রকাশ করেন নাই। আনন্দবাজার পত্রিকা পয়লা ডিসেম্বর তারিখে মাত্র ডবল কলম শিরোনামায় সেই সংবাদ প্রকাশ করেন। চারটি ছত্রে শিরোনামা ছিল এই :—

"নির্বাচনের ফলাফল

"মন্ত্রীদের কেল্লা ফতে

"সুরেন্দ্রনাথ কুপোকাত

"নীল রতনের পতন

পূর্বোক্ত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামের ডান দিকে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে 'আধা স্বরাজ্য দল'। ওই সংখ্যায় 'রঙ-বেরঙ' শিরোনামায় যে সম্পাদকীয় টিপ্পনী কাটা হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাঙ্গালীর স্বদেশী যুগের মুকুটহীন রাজা নন-কোঅপারেশন যুগের চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ, আপ্রাণ চেষ্টা করেও নির্বাচন-যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন, আপসোস কি কম! সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বুড়া বয়সের তিন বৎসরের চাকরির রোজগারের একটা মোটা অংশ নাকি এই নির্বাচন-ব্যাপারে দু'হাতে লুটিয়েছেন, তথাপি অকৃতজ্ঞ ভোটারগণ এমন মুক্তহস্ত দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেছেন!"

"আ হা হা! সে যুগ আর নেই, সে দিন-কাল কি আর আছে? নেতাগিরি ছেড়ে কোন রকমে রাজবাড়ীতে আমলাতন্ত্রের আওতায় থেকে যে কায়মনপ্রাণে দেশসেবা,—পোড়া দেশের লোকের চোখে তাও সহিল না! হে মন্ত্রী, হে স্যার, আপনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন এ হতভাগা দেশহিত চায় না, কাজেই আপনার মতন হিতৈষীর কাজ শেষ হয়েছে, এখন রাজনীতি ছেড়ে, গঙ্গাতীরে আশ্রম রচনা করে,—শেষের সে দিন স্মরণ করুন— আর কেন?"

"তবে বাজারে ইতিমধ্যেই গুজব সুরেন্দ্রনাথ এই পরাজয়ের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন, কাজেই তাঁর পরাজয়-সংবাদে 'হৃদয় ছাড়া' হবার কোন সম্ভাবনা নেই। লাটসভায় তাঁর জন্য নাকি আর একটা পোস্ট অপেক্ষা করছে, আশ্রিত-বৎসল আমলাতন্ত্র তাঁকে সরকারী দপ্তরখানায় কায়েম করে রাখবেন বোধ হয়।"

অমৃতবাজার পত্রিকা সুরেন্দ্রনাথের নির্বাচনে পরাজয়-বার্তা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে একই সংখ্যায় "Defeat of Sir Surendranath" অর্থাৎ স্যার সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। সেই প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির আরম্ভেই লিখিত হইয়াছে যে, সুরেন্দ্রনাথ যে নির্বাচনে পরাজিত হইবেন, তাহা একটি পূর্বোপনীত সিদ্ধান্ত ছিল। বর্তমানে জনগণের যে মনোভাব, তাহাতে এ দেশে বিদেশী আমলাতন্ত্রের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নবগঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর অনুগ্রহ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই কম। প্রবন্ধে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী থাকা কালেই বাংলা দেশে অসহযোগ আন্দোলনকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে। বাংলা দেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিও একই সময়ের ঘটনা। প্রবন্ধটির আরম্ভ এই:—"Sir Surendranath's defeat at the polls was a foregone conclusion. In the present temper of the people no one who is suspected to be on the side of the

present foreign Bureaucracy in the country had the least chance of winning the favour of the new electorates"…

বিধান রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন একটা ঐতিহাসিক জয়লাভের গৌরব লইয়া। সুরেন্দ্র-বিজয়ী বিধান, বিদেশী আমলাতন্ত্রের সুর-লোক—মহাকরণ (সেক্রেটারিয়েট) হইতে ভারতবিশ্রুত নেতা, কংগ্রেসের অন্যতম স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথকে অপসারিত করিয়া দিলেন। জীবনের সায়াহ্ন-বেলায়ও তিনি সে পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারেন নাই। সেই কারণেই আত্মচরিত ("A Nation in making") লিখিতে বসিয়া তিনি স্বরাজ্য দল ও উহার অন্যতম নেতা মিঃ সি. আর. দাশের উপর আক্রমণ চালাইয়াছেন। তাঁহার মতে যুক্তি কিংবা সাধারণ বুদ্ধি অথবা স্বদেশ-হিতকর সমীচীনতার সাধারণ বিবেচনার দ্বারা স্বরাজ্যবাদের নীতি নির্ধারিত হয় না। "But neither logic nor common sense, not even the ordinary considerations of patriotic expediency, dominate the counsels of Swarajism"… সুরেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালকাটা মিউনিসিপাল য়্যাক্‌টের বিধান মতে চিত্তরঞ্জন দাশ যে কলিকাতা পৌরসঙ্ঘের (কর্পোরেশনের) মহানাগরিক (মেয়র) নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাহাও তিনি সহিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, পৌরসঙ্ঘ (মিউনিসিপালিটি) পরিচালনা সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি! সুরেন্দ্রনাথ যৌবনে প্রথম যখন মিউনিসিপাল কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তখনও তো কেহ তাঁহার প্রতিকূলে অনুরূপ যুক্তি উত্থাপন করিতে পারিতেন। পরাধীন অবস্থায় আমাদের ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠী স্বরাজের দাবি অগ্রাহ্য করিবার কালে ওইরূপ অভিজ্ঞতার অভাবের মামুলী যুক্তি দেখাইতেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীতই স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু এবং তাঁহার অনুগামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ পরবর্তী নেতারা দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা পৌরসঙ্ঘের মহানাগরিকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর (নেতাজী) নাম সংযুক্ত করি নাই এইজন্য যে, তিনি মহানাগরিকের পদে নির্বাচিত হইবার পূর্বে কলিকাতা পৌরসঙ্ঘের মুখ্য নির্বাহক (চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার) রূপে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ অভিযোগও আনিয়াছেন যে স্বরাজীদের প্রাধান্য বাংলার জন-জীবনকে নীতি-ভ্রষ্ট করিয়াছে। অতীতের পবিত্রতা বিলোপ পাইয়াছে। জনসাধারণ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির সিদ্ধান্তে বল

এবং প্রতারণা হইল নির্ধারক যন্ত্র। "The dominance of the Swarajists has demoralised the public life of Bengal. The purity of the past is gone. Force and fraud have become determining factors in deciding public issues." প্রবীণ নেতা পরাজয়ের জ্বালায় যে কতটা জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতেছিলেন, তাহা ওইরূপ বিষোদ্গারণ হইতে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার অভিযোগের সমর্থনে তিনি একটি ঘটনারও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বহু বৎসরের রাজনীতিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি দেশ ও জাতির দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুগামী মধ্যপন্থী দল (যাহা পরবর্তীকালে উদারনীতিক দল নামে অভিহিত হইয়াছে) জাতীয় জাগরণের প্রভাত-কালের সেই নিয়মতান্ত্রিকতাবাদকেই (constitutionalismকেই) জাতির মুক্তির একমাত্র উপায় জ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সেই নীতির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও আত্যন্তিক আসক্তি বশতঃ তাঁহাদের দৃষ্টি এমনই আচ্ছন্ন হইয়া যায় যে, তাঁহারা দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই—ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন নেতার আবির্ভাবে কি বৈপ্লবিক বিবর্তনই না সংঘটিত হইতেছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিযানে মহানায়ক গান্ধীজীর অনুগমন করিয়া চলিতেছিল—অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী নূতন পথ ধরিয়া। বাংলার রাজনীতিক রাজ্যের এক কালের অনভিষিক্ত রাজা—'Uncrowned King of Bengal'—সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতি-ক্ষেত্রে নবাগত বিধানচন্দ্রের নিকট নির্বাচন-যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও বুঝিতে পারেন নাই—দেশের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে। যিনি 'রাষ্ট্রগুরু' বলিয়া জীবিতকালে অভিনন্দিত হইয়াছেন এবং মৃত্যুর পরেও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইতেছেন, তাঁহার রাজনীতিক দূরদৃষ্টির অভাব দেখিয়া দুঃখ হয়! যে স্বরাজ্য দল তাঁহার উষ্মা ও অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দলের অর্থাৎ কংগ্রেসীদের হাতে কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব থাকাকালে কর্পোরেশন স্ট্রীট হইয়াছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড এবং শীঘ্রই কার্জন পার্ক হইবে সুরেন্দ্রনাথ উদ্যান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিজে এবং তাঁহার অনুগামী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি নেতারা রাষ্ট্রগুরুকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য মর্যাদা দিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যবস্থাপক সভায়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হইয়া ডাঃ রায় প্রবেশ করিলেন নূতন কর্মক্ষেত্রে। তখন তাঁহার বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, যখন কোন কার্যের ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িবে, তখন তাহা তিনি দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিতে চেষ্টিত হইবেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইন, ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাবলী এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিধি-বিধান ডাঃ রায় ভালো করিয়া পড়িয়া নিলেন। আইনসভায় প্রবেশ করিয়া নিয়মকানুন শিখিবার জন্য তাঁহাকে কোন প্রবীণ সদস্যের শিক্ষানবিস হইতে হয় নাই। জীবনে দুইটি কঠিন বিষয়ে তিনি ইতোমধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন,—একটি হইল চিকিৎসা-বৃত্তি এবং অপরটি অধ্যাপনা। উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিবিদ্ হইয়া নির্ভীক ও নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবা করা হইল তাঁহার তৎকালীন উদ্দেশ্য। তাহা সফল করিতে তাঁহার দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। অর্থনীতি তিনি বেশ বুঝিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদের (Senate-এর) সদস্যরূপে এবং সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব্ য়্যাকাউণ্টস্-এর প্রেসিডেণ্ট্‌রূপে কাজ করিয়া ডাঃ রায় অর্থনীতিক বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় আয়ব্যয়ক (budget) আলোচনায় তাঁহার স্বাধীনভাবে স্বকীয় মতামত গঠনে ও প্রকাশে সুবিধা হইয়াছিল। স্বরাজ্য দলের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হইলেও তিনি সেই দলের সহিত সহযোগিতা রাখিয়া প্রথমে কাজ করিয়াছিলেন; এবং পরে সেই দলে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার আয়ব্যয়ক অধিবেশনে তিনি প্রথম (১৯২৪ খ্রীঃ ২৭শে ফেব্রুআরি) যে সারগর্ভ, তথ্যপূর্ণ ও সমালোচনাত্মক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতেই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান কিরূপ গভীর এবং দৃষ্টি কতটা তীক্ষ্ণ ও সন্ধিৎসু। ওই বক্তৃতার কতকাংশের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাজেট বা আয়ব্যয়ক উপস্থাপিত করার বার্ষিক অনুষ্ঠান কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। বাজেট সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিও আমরা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? যে নিয়মাবলী অনুসারে আমরা আজ কাজ করিতেছি, তাহাতে আমাদের এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই—যাহার দ্বারা আমরা অর্থ মঞ্জুর করিতে পারি, কিংবা মঞ্জুরি-অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে পারি

অথবা মঞ্জুরি-অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাপারে ব্যয়ের পরিবর্তে অন্য ব্যাপারে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারি। ওইরূপ ক্ষমতা আছে রাজকীয় পার্লামেণ্টের—যেখানে মন্ত্রীরা হইলেন নির্বাহী (executive) এবং রাজস্বের জন্য দায়ী; তাঁহাদের দাবি অনুযায়ী রাজার পক্ষ হইতে কমন্স্‌সভা অর্থ মঞ্জুর করিয়া থাকে। সাধারণ নিয়ম সেখানে এই যে,—ওই সমুদয় দাবি কোন প্রকারে হ্রাস না করিয়াই মঞ্জুর করা হইয়া থাকে; কারণ নির্বাহী (executive) নানাভাবে আইনসভা এবং দেশের নিকট দায়ী। কিন্তু আমাদের বেলায় কি প্রতিকার আছে? এই সভা কি করিয়া নির্বাহীকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে? আমি আশ্চর্য হই এই ভাবিয়া—তাহা হইলে শাসন-সংস্কার আইনের উদ্দেশ্য বুঝি এই ছিল যে, আইন-সভা নির্বাহীর উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিলে, একমাত্র সম্ভবপর ও ব্যবহারিক উপায় হইল দাবি মতে অর্থ মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করা কিংবা দাবি-করা অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া। ইহা একটা অবিসংবাদিত সত্য—কোন মানুষকে ক্ষমতা দিয়া দেখুন যে তিনি উহার অপব্যবহার করিবেনই, যদি দৃঢ় জনমত উহার প্রতিকূলে না থাকে; ক্ষমতা পাইয়া কোন মানুষ উহার অপব্যবহার না করিলে বুঝিতে হইবে তিনি মানব নহেন—অতিমানব। উপস্থাপিত বাজেটের বেলায়ও আমি দেখিতেছি ক্ষমতার অপব্যবহারের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

পূর্বোক্তভাবে শাসন-সংস্কার আইনের নীতিগত ত্রুটি প্রারম্ভে দেখাইয়া দিয়া ডাঃ রায় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহার অভিমতের সমর্থনে তিনি বাজেট হইতে যুক্তির সহিত তথ্যাদি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন:—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাজেটের আলোচনাকালে তদানীন্তন অর্থ-সদস্য এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য কোন কার্যে ব্যয় করা হইবে না; কেবল ব্যয় করা হইবে এই দুইটি কার্যে:—মূলধন হিসাবের (Capital-accounts-এর) জন্য ঋণদানের ব্যবস্থায় এবং দ্বিতীয়তঃ হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিকল্পনা রূপায়ণে। বর্তমান সময়ে এই আইনসভা নির্বাহীকে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য কিভাবে বাধ্য করিতে পারে? ইহা একটা সুবিদিত সত্য যে, সরকারের নির্বাহী সদস্যগণ জনগণের ইচ্ছা জানেন না এবং জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে জনগণের ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করিবার একমাত্র উপায় হইল অর্থ মঞ্জুরের দাবি অগ্রাহ্য করা কিংবা উহার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া।

বাজেটের ব্যয়-সংকোচন প্রসঙ্গে আসিয়া ডাঃ রায় বলেন:—মাননীয় অর্থ-সদস্য দুঃখ করিয়াছেন যে, পুলিস বাজেট হইতে ১২ লক্ষ টাকা কমাইতে

হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কার্যকর তত্ত্বাবধানের অভাবে পুলিস-বাহিনীর দক্ষতারও ক্ষতি হইয়াছে। আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কাহার উপর তত্ত্বাবধান? ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই দেশে শতকরা মাত্র ১৩ জনের অক্ষর-পরিচয় আছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, যদি জনগণ উহার গুরুত্ব না বুঝে কিংবা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহাদের না থাকে। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় একটা বৃহৎ শিক্ষা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। গতকল্য মিঃ মিত্র (শিক্ষা-মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র) এই প্রদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার জন্য অর্থ মঞ্জুরের দাবি জানাইয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন; এবং তিনি অর্থ-সদস্যের রাজনীতিজ্ঞতার অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাপক সভার সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাটা কি প্রকার? আমি ধরিয়া লইতেছি যে, গবর্নমেন্টের পক্ষে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজ করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়কে ওই কর্তব্য সম্পাদনের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের দায়িত্ব হইতে সরকার মুক্তি পাইতে পারেন না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত-সরকারের পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন:—

যখন এম. এ, পড়িবার জন্য ছাত্রেরা স্থানাভাবের দরুন কলেজে ভর্তি হইতে পারিতেছে না, তখন উচ্চতর শিক্ষাদানের, উচ্চতর অধ্যয়নের এবং গবেষণার বর্তমান ব্যবস্থাকে আমি মোটেই পর্যাপ্ত বিবেচনা করিতে পারি না।…আমাদের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যে নিযুক্ত আছেন এবং বহুসংখ্যক ছাত্রের উচ্চশ্রেণীর এম. এ. ডিগ্রি পাইয়া বাহির হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক; নতুবা স্কুল ও কলেজগুলির জন্য যোগ্য শিক্ষাদাতা পাওয়া কঠিন হইবে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্জুর-করা পূর্বোক্ত দান ভারতসরকার এবং বাংলাসরকার অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বিভিন্ন দাতার নিকট হইতে ৪৫ লক্ষ টাকা দান বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছে। গবর্নমেণ্ট তদুত্তরে কি করিয়াছেন? কালিম্পং হোম্‌স্ এবং লরেটো কন্‌ভেণ্টে সরকারী আর্থিক সাহায্য মঞ্জুরির সুপারিস করিয়া তৎকালীন অর্থ-সদস্য স্যার হেন্‌রি হুইলার বলিয়াছিলেন যে, ওই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দাতার নিকট হইতে প্রচুর আর্থিক দান পাইয়াছে, সুতরাং উহারা সরকারের নিকট হইতেও মুক্তহস্তে দান পাইবার

অধিকারী। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, বে-সরকারী দানে উৎসাহ দেওয়া একটা ভালো কারবার। আমি জানিতে চাহি—বিশ্ববিদ্যালয়ে বে-সরকারী দানের বেলায় উৎসাহ দিবার জন্য এই গবর্নমেণ্ট কিংবা ভারতগবর্নমেণ্ট কি করিয়াছেন? এই তো সেই দিন স্যার পি. সি. রায়—যাঁহার নাম গৃহস্থ-মাত্রেরই জানা আছে, এবং যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব দেখিয়া নিজের প্রাপ্য মাসিক বেতন হইতে এক হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন—বিজ্ঞান কলেজের কাজে রাসায়নিক দ্রব্য কিনিবার জন্য কেবল ৪ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন; হিসাব পর্ষদের সভাপতিরূপে আমাকে তাঁহার ওই সামান্য অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। মিঃ মিত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে উপেক্ষার জন্য এই সভার সদস্যগণের এবং নির্বাহী সরকারের রাজনীতিজ্ঞতার অভাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্যদানের ব্যাপারে গবর্নমেণ্টের রাজনীতিজ্ঞতার অভাবের জন্য আমি গবর্নমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহি।

অতঃপর ডাঃ রায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করার প্রসঙ্গে আসিয়া বলেনঃ—আমরা দেখিতেছি ভারতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু এবং রোগের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক যুদ্ধে নিযুক্ত থাকে। দারিদ্র্য হইল সেই রোগ এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষের অধিক লোক মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতেছে নিরোধ-যোগ্য ব্যাধিগুলির আক্রমণে। একই কারণে প্রত্যেক শ্রমজীবী বৎসরে অনেক দিনের কাজ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় এবং বহুসংখ্যক চিরজীবনের জন্য কর্মশক্তি হারাইয়া বিকলাঙ্গের মতো দিন কাটায়। এই সকল হইল সত্য বিবরণ—যাহা স্বাস্থ্যবিভাগের পরিসংখ্যানের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। অবস্থা এতটা শোচনীয় যে, জনগণ এই দুঃখ-কষ্টকে অদৃষ্টের ভোগ বলিয়া নির্বিবাদে ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে পারিতেছে। আমাদের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, রোগের চিকিৎসার জন্য প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় হইতেছে। যখনই চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য জনগণ অধিকতর আর্থিক সাহায্যের দাবি জানায়, তখন প্রদেশের দারিদ্র্যের অজুহাত দেখানো হয়; কিন্তু এই দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে বহুল পরিমাণে প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধিগুলি হইতে। ভারতবর্ষ যদি স্বাস্থ্য ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহা অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া ধরিতে হইবে। ...প্রতিরোধযোগ্য রোগগুলি দমন করুন, উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করুন, তবে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা উত্তম ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে। মহাশয়! ইহা হইল উদ্বুদ্ধ ভারতের বাণী। ভারতসরকার, ভারতসচিব

এবং তাঁহাদের স্থানীয় উপদেষ্টাদের দায়িত্ব যথেষ্ট, রাত্রির পরে দিনের আগমন যেমন নিশ্চিত, তেমনিই দেশের জনগণের নিকট একদিন তাঁহাদের কর্ণধারত্ব সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে। তাহারা জানিতে চাহিবে—কেন এভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে এমন নিষ্ফল প্রচেষ্টার জন্য—যাহা পীড়িত জনগণের কষ্ট লাঘবে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু শত্রুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিনাশ করিতে নিয়োগ করা হয় নাই। তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, যুদ্ধের প্রথম নীতি হইল শত্রুকে—প্রতিরোধ-যোগ্য ব্যাধিগুলির হেতুগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা। উহাদের বিরুদ্ধে সংহত পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযানের ব্যবস্থা করুন, তবে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর শত্রু নিপাত হইবে। উহাকে উপেক্ষা করুন, তাহা হইলে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশ সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইবে; দেশবাসী যদি সংগ্রাম করে, তবে তাহারা ঠিক কাজই করিবে।

ডাঃ রায় তাঁহার বক্তৃতা বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিয়া পাঠ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় এবং অন্যত্র তিনি বরাবরই উপস্থিত-বক্তা। পূর্বোল্লিখিত প্রথম বক্তৃতার মধ্যেই ব্যবস্থাপক-রূপে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রহিয়াছে। তিনি ক্রমান্বয়ে প্রায় সাত বৎসর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি একই নির্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনবার। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে কংগ্রেস-ব্যবস্থাপক সভাগুলির কংগ্রেসী সদস্যগণকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। তখন ডাঃ রায় সেই নির্দেশ মতে পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের নির্দেশ সম্পর্কে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তৎকালে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদেও ইস্তফা দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডাঃ রায় উচ্চশ্রেণীর ব্যবস্থাপক বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসক ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের ন্যায্য স্বার্থ-রক্ষা ও দাবি আদায়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। হুগলী নদীর জল দূষিত হইয়া যাইতেছে বলিয়া তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি আট জন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বিভিন্ন দলের পক্ষ হইতে সমর্থন করা হয়। সরকারের তরফ হইতে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করা হইল প্রস্তাব তুলিয়া নিতে; এবং ইহাও জানান হইল যে, তিনি তুলিয়া নিতে সম্মত না হইলে সরকার কর্তৃক উহা গৃহীত হইবে। ডাঃ রায় তদুত্তরে বলিলেন—অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি

বলিতে পারেন যে, উত্থাপিত প্রস্তাব তুলিয়া নেওয়ার ফল ভালো হয় নাই। অতঃপর ডাঃ রায়ের প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইল। সংশোধনের ফলে তাঁহার প্রস্তাবিত আট জন সদস্যের সঙ্গে আরও চার জন বৃদ্ধি পাইল। কমিটির বার জন সদস্যের নাম নিম্নে দিতেছি :—

বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়, ডক্টর প্রমথনাথ ব্যানার্জি, বাবু খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, বাবু বরদাপ্রসাদ দে, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মিঃ এ. সি, ব্যানার্জি, মিঃ আর. এন. ব্যাণ্ড, মৌলবী আবদুর রসিদ খান, মৌলবী বছর আহমেদ, মৌলবী নাজিমদ্দিন আহমেদ এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি এক তথ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিরূপ যত্নের সহিত ও শ্রম স্বীকার করিয়া তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সেই বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যবস্থাপক-রূপে তাঁহার কার্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ডাঃ রায় যখন যে কার্যে হাত দিতেন তাহা ঐকান্তিকতার সহিত করিতেন। বাজেট সমালোচনা কালে, কিংবা কোন প্রস্তাব উত্থাপন উপলক্ষে, অথবা প্রস্তাবের সমর্থনে বা বিরোধিতায় তিনি যে সকল বক্তৃতা দিতেন, তাহাতে তাঁহার পরিশ্রম ও চিন্তাশীলতার সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলিত। ব্যবস্থাপক সভার কার্যের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করিতেন এই ভাবিয়া যে,—তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, বিদেশী সরকার কর্তৃক শাসিত ও শোষিত দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের চেষ্টা করা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাঁহার মতে—নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তিনি জনগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। সুতরাং ব্যবস্থাপক-রূপে কর্তব্য কার্য সুসম্পন্ন না করিলে কিংবা করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা না করিলে বিশ্বাসভঙ্গ হয়।

খড়্গপুরে বি. এন. আর.-এর ধর্মঘটী ও রেলওয়ে কর্মিগণের উপর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুআরি সংঘটিত গুলি-বর্ষণের ব্যাপার সম্পর্কে, স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে একটি মুলতবী প্রস্তাব (Adjournment motion) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইয়াছিল। দলের তদানীন্তন উপনেতা ডাঃ বিধান রায় ২৭শে ফেব্রুআরির অধিবেশনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতার সারমর্ম অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

ওই ঘটনা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে (Assemblyতে) উত্থাপিত হইয়াছিল। ভারতসরকারের স্বরাষ্ট্র-সদস্য স্যার আলেকজেণ্ডার মাডিম্যান এবং বাণিজ্য-সদস্য স্যার চার্লস্ ইন্নেচ নাকি বলিয়াছেন, ব্যাপারটা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার (Council-এর) আলোচ্য বিষয় বলিয়া এই পরিষদের পক্ষে উহার আলোচনা

ঠিক কাজ হইবে না ; প্রকৃত বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের কার্য ন্যায়-সঙ্গতই হইয়াছিল। সরকার পক্ষের সদস্যের প্রদত্ত ওই প্রকার বিবৃতিতে আমাদের আশ্চর্য হইবার মতো কিছুই নাই। আমি মুলতবী প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে স্যার চার্লস ইন্নেচের বক্তৃতার কতকাংশ শুনাইতেছি :—"আমাদের সরকারী কর্মচারী যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা রেলওয়ে শ্রমিকদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে একেবারে অন্য রকমের ; এবং সমস্ত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মিল নাই। বস্তুতঃ পক্ষে এই পরিষদের নিকট এখনও প্রকৃত বৃত্তান্ত আসে নাই।" যদি আমি সেখানে থাকিতাম, তাহা হইলে স্বরাষ্ট্র-সদস্যকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, ওইরূপ অবস্থায় তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তা-ব্যক্তিদের আচরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছিলেন কি করিয়া ? স্যার চার্লস্ ইন্নেচ নিজেও বলিয়াছেন যে,—জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে আদেশ দেন নাই, সঙ্গীন ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কাজটা কঠিন ছিল এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা হয় নাই। যখন পরিষদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নাই, তখন কি করিয়া যে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। সুতরাং আলোচনার জন্য কংগ্রেস পক্ষে প্রস্তাবটি আনিয়াছি। সরকার পক্ষের কেহ কেহ বলিয়াছেন—প্রশ্ন করিলেই তো হইত। পূর্বে কতকগুলি ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর তিন সপ্তাহের পূর্বে পাই নাই। সুতরাং আলোচনায় সরকার এবং জনসাধারণের সুবিধা হইবে।

অতঃপর ডাঃ রায় ঘটনা সম্পর্কে বি. এন. আর. ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ রামচন্দ্র রাওর বিবরণের (রিপোর্টের) উল্লেখ করিয়া একাংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন :—"A further attack was made by Auxiliary Force and they began to pursue and charge the strikers with bayonets." অর্থাৎ অক্সিলিয়ারী বাহিনী আরও একটা আক্রমণ চালাইয়াছিল ; তাহারা ধর্মঘটীদের পিছনে ধাওয়া করিয়া সঙ্গীন দিয়া আক্রমণ করে। ব্যবস্থাপক সভার 'প্রেসিডেন্ট' রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি ওই বিবরণের দায়িত্ব নিতে পারেন কিনা। তদুত্তরে ডাঃ রায় বলেন—অক্সিলিয়ারী বাহিনীর যে সকল সৈন্য গুলি-বর্ষণে লিপ্ত ছিল বলিয়া বিবরণে উল্লেখ করা হয়, তাহাদের নামও দেওয়া হইয়াছে এবং ওই বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে এই পর্যন্ত সেই বিবরণের প্রতিবাদ করা হয় নাই। তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে গুলি-বর্ষণ এবং সঙ্গীনের আক্রমণের কথা। সঙ্গে-সঙ্গেই স্বরাষ্ট্র-সদস্য মাননীয় মিঃ মোবার্লি এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে,

মুলতবী প্রস্তাবে সঙ্গীনের আক্রমণের উল্লেখ নাই। জবাবে ডাঃ রায় বলেন—আমি তো ঘটনার বর্ণনা দিতেছি; মাননীয় সদস্তের অধৈর্য হইবার আবশ্যকতা নাই। অতঃপর ডাঃ রায় বলেন :—অক্সিলিয়ারি বাহিনীর দুইজন সদস্য মেসার্স এডওয়ার্ড ও গেইট্ ধর্মঘটীদের উপর গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রের বিবরণে দেখা যায়, তাঁহাদের তো খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে। তাঁহারা লোকদের পিছনে ধাওয়া করিয়া বাজারের মধ্যে গিয়াছিলেন এবং সেখানে করিম বক্সের দোকানের নিকট একজনকে গুলি করিয়াছেন। লোকটি গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়া যায়, তারপর তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। গুলি করার ঘটনা সরকার পক্ষ হইতেও অস্বীকার করা হয় নাই। ডাঃ রায় ওই ভাবে ঘটনা বর্ণনা করার কালে সরকার পক্ষীয় কতিপয় সদস্য মুচকি হাসিতেছিলেন দেখিয়া তিনি বলিলেন :—আমাদের বিপক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করিতেছি, বিষয়টিকে, তাঁহারা যেন হালকাভাবে না নেন। আমাদের সমাজের লোকদের গুলি করা হইয়াছে; সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পর্কে আমি যখন এই সভায় বক্তৃতা দিতেছি, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ হাসিতেছিলেন এবং কেহ কেহ মুচকি হাসিতেছিলেন। ধারণা করিতে পারিতেছি না, এইভাবে তাঁহারা হাসিতে পারেন কি করিয়া! আমাদের বিপরীত দিকের সদস্যগণের এই প্রকার আচরণ হইতেই মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে।……

ডাঃ রায়ের প্রস্তাবটি যিনি সমর্থন করিলেন, তিনি কংগ্রেস দলের সদস্য নহেন। তিনি হইলেন সরকারের মনোনীত বেসরকারী সদস্য মিঃ কে. সি. রায়চৌধুরী। মূলতবী প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাও যুক্তি এবং তথ্যে পূর্ণ ছিল। মিঃ চৌধুরী তৎকালে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া গবর্নমেণ্ট শ্রমিকদের স্বার্থে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া মিঃ চৌধুরী প্রথমেই ডাঃ রায়কে অভিনন্দন জানান, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মাধ্যমে তাঁহার বৃহৎ দলকেও অভিনন্দিত করেন; তিনি বলেন যে,—কৃষক ও শ্রমজীবীর অভাবাদি সম্বন্ধে ওই দল সচেতন হইয়া উঠিতেছে; এবং উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সভ্য জগতের কোথাও প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ বাদ দিয়া পরিচালিত হয় নাই। বক্তা আরও বলেন :—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে যে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট হইয়াছিল, তাহা কেবল অর্থনীতিক কারণে ঘটে নাই, অন্যান্য কারণও রহিয়াছে; যেমন—বেত মারা, সঙ্গীন দিয়া

আঘাত এবং খড়্গপুরে ১১ই ফেব্রুআরি তারিখে গুলি ছোঁড়া। খড়্গপুরে মেকানিকেল ওয়ার্কশপের রেলওয়ে শ্রমিকগণের মধ্যে যে অশান্তি (unrest) ঘনীভূত হইতেছিল, তাহা গত ছয় মাস কাল জনসাধারণের বিশেষ মনোযোগের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছেন। অতঃপর মিঃ রায়চৌধুরী কয়েকটি অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করেন, যথা—বাসের অযোগ্য ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা, প্রায় ৭০ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা, অল্প বেতন, মারধর এবং জাতি-বিশেষে বিচার-বিবেচনা। ঘটনার বিশদ বিবরণও তাঁহার বক্তৃতায় রহিয়াছে।

তারপর বক্তা বলেন যে,—বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল এবং তিনিও কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। ২৯ শে জানুআরি তিনি বি. এন. রেলওয়ের এজেণ্টকে তদন্ত-কমিটির পক্ষ হইতে সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ জানান; তদুত্তরে পয়লা ফেব্রুআরি এজেণ্ট লিখিলেন যে, ওই রকম তদন্তে কোন সুফল হইবে না এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ওই ধরনের কমিটির সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারেন না। বক্তা ইহাও বলেন যে, ধর্মঘটের দুই দিন পূর্বেও শ্রমিকদের অভিযোগ শোনার কথা ছিল, কিন্তু তাহা শোনা হয় নাই।

প্রস্তাবটি সমর্থিত হইবার পরে ব্যবস্থাপক সভার আরও কয়েকজন সদস্য বক্তৃতা দেন এবং পুলিস এবং অক্সিলিয়ারী বাহিনীর দুষ্কর্মের তীব্র নিন্দা করেন। সরকারের তরফ হইতে জবাব দিতে উঠিয়া মোবার্লি সাহেব বলেন যে, ধর্মঘটীরা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক শ্রমিক পুলিস ও অক্সিলিয়ারী বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছিল। সহকারী পুলিস সাহেব মিঃ কুক আক্রমণকারী জনতাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও পাথর ছুঁড়িয়া মারা বন্ধ করে নাই। তখন বাধ্য হইয়াই গুলি চালাইতে হইয়াছিল। কেহ হত হয় নাই। হাসপাতালে যে সকল লোক আহত হইয়া চিকিৎসার জন্য ভর্তি হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা হইবে প্রায় ১২ জন এবং তন্মধ্যে ৩।৪ জনের অবস্থা সাংঘাতিক। তিনি সঙ্গীনের আক্রমণ (Bayonet charge) সম্পর্কে এইরূপ জবাব দেন যে, সেই রকমের কিছু করা হয় নাই, তবে আক্রমণকারী জনতাকে হটাইবার জন্য সঙ্গীন দিয়া খোঁচা মারিতে হইয়াছিল। জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মোবার্লি বলেন যে, সহকারী পুলিসসাহেব মিঃ কুকের মাথায় জখম হইয়াছে, পুলিসসাহেব মিঃ ওয়াটারওয়ার্থ এবং কিছু সংখ্যক কনেস্টবলের শরীরেও আঘাত লাগিয়াছে।

মুলতবী প্রস্তাবের আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্বে জনৈক নির্বাচিত

ইউরোপীয় সদস্য ডাঃ রায়ের হাসি ও মৃদু হাসি সম্পর্কিত মন্তব্যের জবাবে বলেন যে, তাঁহাদের হাসি ও মৃদু হাসি আলোচ্য ঘটনা লইয়া নহে ; উহা একটা দুঃখজনক ব্যাপার ! তাঁহারা হাসিয়াছিলেন ডাঃ রায়ের যুক্তি শুনিয়া। স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে সদস্যের বিবৃতি সত্য বলিয়া গৃহীত হয়।

মুলতবী প্রস্তাবটির আলোচনায় একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে,—উহার সমর্থক সরকার-মনোনীত বেসরকারী সদস্য মিঃ কে. সি. রায়চৌধুরী তাঁহার বক্তৃতায় যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। ওই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে তাঁহার কর্তব্যবোধের নিদর্শনও মিলিবে। মিঃ চৌধুরী তৎকালে শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। মনোনীত সদস্য হইলে প্রত্যেক বিষয়েই যে সরকারকে সমর্থন করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৎসত্ত্বেও প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকার ওই শ্রেণীর সদস্যদের সমর্থন পাইতেন। কিন্তু মিঃ চৌধুরী তাঁহার কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদের ব্যতিক্রম। অধিকন্তু, প্রবীণ, বহুদর্শী ও প্রভাবশালী জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বয়ঃকনিষ্ঠ নবীন নেতা হইলেও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, দেশের হাওয়া কোন্‌দিকে বহিতেছিল। সেই জন্যই তিনি বক্তৃতার আরম্ভেই প্রস্তাবক ডাঃ রায়ের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাইলেন কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত স্বরাজ্য দলকে বৃহৎ দল বা 'great party' বলিয়া। শ্রমিক নেতার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রশংসনীয়।

ডাঃ রায় স্বরাজ্য দলের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হইয়া যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি *ন্যাশন্যালিস্ট* দলের নেতা সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেন। পরে মিঃ চক্রবর্তী নিজের প্রচারিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। ডাঃ রায় তখন স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইল। ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের উপনেতা (ডেপুটী লীডার) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (জে. এম. সেনগুপ্ত) নেতা (লীডার) নির্বাচিত হইলেন সর্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুর স্থলে, এবং ডাঃ রায়ও উপনেতা নির্বাচিত হইলেন যতীন্দ্রমোহনের স্থলে বিনা বিরোধিতায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব উত্থাপনের ভার পড়িল স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে ডাঃ রায়ের উপর। তখন কৃষি ও শিল্প-মন্ত্রী ছিলেন হাজী এ. কে. আবু আহ্‌মদ খান গজনবী এবং শিক্ষা-মন্ত্রী ছিলেন মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। তিনি দুইজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুইটি পৃথক অনাস্থা-প্রস্তাব (motions of no-confidence) ও ব্যবস্থাপক সভায় আনিলেন। সেই উপলক্ষে ডাঃ রায়

যে দীর্ঘ, জোরালো যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উহার আংশিক সারমর্ম নিম্নে দিতেছি ঃ—

"আমাদের নিকট দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা (Diarchy) অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যপূর্ণ ছিল, হইয়াছে ও আছে ; এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে যে কেহ বর্তমান অবস্থায় সেই শাসন-ব্যবস্থা কার্যকর করিতে সাহায্য করেন, তিনি আমাদের আস্থাভাজন নহেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল এই মর্মে ঃ—এই কংগ্রেস শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বিগত দিল্লী-অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সমর্থন করিতেছে এবং এই কংগ্রেসের মতে শাসন-সংস্কার আইন অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যপূর্ণ। কংগ্রেসের প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন পরলোকগত মিঃ সি. আর. দাশ। তিনি প্রস্তাব উপস্থিত করার কালে বলেন—"যদি দায়িত্বপূর্ণ সরকার দ্রুত স্থাপনে সহায়তা হইত, তাহা হইলে আমরা শাসন-সংস্কার গ্রহণ করিতাম ; আমরা সহযোগিতার বিরোধী নহি, যদি তাহাতে স্বরাজ লাভের সাহায্য হইত ; আমরা বিরোধিতার—সোজাসুজি বিরোধিতার বিরোধী নহি, যদি তাহাতে স্বরাজ লাভের সাহায্য হইত।" এই হইল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ছয় বৎসর পরে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মিঃ দাশ তাঁহার ফরিদপুরের বক্তৃতায় বলেন ঃ—আমি যদি সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম যে, বর্তমান শাসন-সংস্কার আইন জনগণের অনুকূলে প্রকৃত দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছে এবং ইহাতে আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিকাশের সুবিধা রহিয়াছে, তবে বিনা দ্বিধায় সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতাম এবং ব্যবস্থাপক সভার কক্ষেই গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করিয়া দিতাম।"

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, ইহার পরেও দলের মত বদলায় নাই। তিনি শাসন-সংস্কার আইনের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়া বলিলেনঃ—আইনে পরিষ্কার বিধান রহিয়াছে যে, মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা কেবল গবর্নরের হাতে এবং হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ("transfered subjects")-এর দায়িত্বও গবর্নরের উপর ন্যস্ত। এই আইনের দ্বারা প্রকৃত দায়িত্ব কি জনগণকে প্রদত্ত হইয়াছে ? গত ২২শে ফেব্রুয়ারি এই সভার অধিবেশনে বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবন্দী এবং সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য যখন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন মন্ত্রীরা কোথায় ছিলেন ? কোন্ পক্ষে তাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন ? তাঁহারা নীরব থাকিয়া বন্দীদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখিতে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ চক্রবর্তী এই সভায় অধুনা-লুপ্ত ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির নেতৃরূপে তাঁহার দলকে বর্তমান সরকারের বিপক্ষে পরিচালিত করিয়াছিলেন ; এবং তিনবার মন্ত্রক (ministry) গঠনে

অস্বীকার করিয়াছিলেন,—কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় শর্ত সরকার পক্ষ হইতে পালন করা হয় নাই বলিয়া ; কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি ওই সমুদয় শর্ত পালিত না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন আমলাতন্ত্রের অঙ্গ, স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন না। এইবারের পূর্বে-মন্ত্রিত্ব নেওয়ার দরুন তিনি জনমতের বিপক্ষে একাধিকবার ভোট দিয়াছেন।

ডাঃ রায়ের আনীত মিঃ গজনবী সম্পর্কিত অনাস্থা-প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল ৬৬ ভোটে, প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল ৬২ ভোট ; মিঃ চক্রবর্তী সম্পর্কিত অনাস্থা-প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল ৬৮ ভোটে, প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল ৫৫ ভোট। দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায় সৃষ্ট গজ-চক্র মন্ত্রক (Ministry) ভাঙ্গিয়া দিল স্বরাজ্য দল।

ইহার পূর্বেও স্বরাজ্য দল তদানীন্তন মন্ত্রিযুগলকে (নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী এবং রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরীকে) পদচ্যুত করিয়া দিয়াছিল। তখন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকার মন্ত্রী দুই জনের এক বৎসরের বেতন বাবত ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার দাবি নামঞ্জুর করার প্রস্তাব আনয়ন করেন। দেশবন্ধু তখন গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি সেই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন। ২৩শে মার্চের স্মরণীয় অধিবেশনে ডাঃ রায়ের তত্ত্বাবধানে দেশবন্ধুকে ইন্‌ভেলিড্ চেয়ারে করিয়া সভায় আনা হইল। তিনি অর্ধ-শায়িত অবস্থায় থাকিয়াই নলিনীবাবুর উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন। সরকারপক্ষের দাবি অগ্রাহ্য হইল ৬৯—৬৩ ভোটে। যুগল-চৌধুরীর স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল মন্ত্রিত্ব-যুগ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র

ডাঃ রায় যখন বাংলা গবর্নমেণ্টের চিকিৎসা-বিভাগের অধীনে সহ-চিকিৎসকের (য়্যাসিস্টাণ্ট্ সার্জন-এর) পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডাঃ কেদারনাথ দাস, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও মন্মথনাথ রায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যুবক বিধানচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৩৪ বৎসর। অধিষদের সদস্য হওয়া অবধি তাঁহার আশুতোষের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ ঘটিল। আশুতোষ যুবক বিধানের গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। অধিষদের (Senate-এর) সদস্য-রূপে ডাঃ রায়ের অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর মধ্য দিয়া অন্যান্য সদস্যেরাও তাঁহার গুণের পরিচয় পাইলেন। তিনি যে অনেক বৎসর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে বাংলার মতো একটা প্রগতিশীল প্রদেশে সে-কালেও শিক্ষিত সমাজে তাঁহার বিপুল জনপ্রিয়তার পরিমাপ করা যাইতে পারে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোস্বরূপ তাঁহার কার্যকাল আরম্ভ হয় ১১ই মার্চ হইতে। তিনি ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিন্-এর সহিত সংযুক্ত হইলেন। পরবর্তী নির্বাচনে (১৯২১ খ্রীঃ) ডাঃ রায় রেজিস্টার্ড্ গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক অর্ডিনারী ফেলো নির্বাচিত হইয়া ১১ই মার্চ হইতে ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিন্-এর সহিত সংযুক্ত হন। তৃতীয় বার (১৯২৬ খ্রীঃ) তিনি একইভাবে নির্বাচিত হইলেন, ১১ই মার্চ হইতে তাঁহাকে ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিন্, ফ্যাকাল্‌টি অব্ সায়েন্স এবং ভেষজ, শারীরবৃত্ত ও প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়নের পর্ষৎগুলির সহিত সংযুক্ত করা হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রায় অর্ডিনারী ফেলোর পদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি পরের বৎসরেই (১৯৩১ খ্রীঃ) পুনর্নির্বাচিত হইয়া ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে পূর্বোল্লিখিত ফ্যাকাল্‌টি দুইটির সহিত পুনরায় সংযুক্ত হইলেন। পরের বারও (১৯৩৬ খ্রীঃ) তাঁহার পুনর্নির্বাচন হইল, এবং ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে তিনি সংযুক্ত হইলেন পূর্বোক্ত ফ্যাকাল্‌টি দুইটির সহিত। পাঁচ বৎসর পরে (১৯৪১ খ্রীঃ) ডাঃ রায় আবার নির্বাচিত হইলেন এবং ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে ওই দুইটি ফ্যাকাল্‌টির সহিতই তাঁহাকে সংযুক্ত থাকিতে হইল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নির্বাচন হইল

সপ্তম বারের জন্য, এবং ১৩ই ফেব্রুআরি হইতে পূর্বের মতো তিনি সংযুক্ত হইলেন সেই ফ্যাকাল্‌টি দুইটির সহিত। ইহার পরেও ডাঃ রায় রেজিস্টার্ড্‌ গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক অর্ডিনারী ফেলোরূপে পুনর্নির্বাচিত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-পর্ষদের (Board of Accounts-এর) কার্য জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ। ডাঃ রায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই অর্থনীতিক কৃতিত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ফেলো নির্বাচিত হইবার আট বৎসর পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিসাব-পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হন; এবং সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এগার বৎসর কাল*। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ পর্যন্ত ডাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল (ভাইস্‌-চ্যান্সেলার) ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপালরূপে অর্থ-সমিতিরও সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ওই সময়ের জন্য।

ব্যবস্থাপক সভায় আর্থিক সাহায্যদানের প্রস্তাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপেও ডাঃ বিধান রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জন-স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসক-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন,—যদিও দেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি কখনও উদাসীন থাকিতেন না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে ডাঃ রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে—স্নাতকোত্তর বিভাগের পুনর্গঠন, গবেষণা ইত্যাদি কার্য সুপরিচালনার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক পৌনঃপুনিক অনুদান ('annual recurring grant') মঞ্জুর করা হউক। একটি অনুরূপ প্রস্তাব স্বরাজ্য দলের খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক পূর্বেই উত্থাপিত হইয়াছিল। ডক্টর প্রমথনাথ ব্যানার্জি, মন্মথনাথ রায় প্রভৃতিও প্রায় একই রকমের প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের উপনেতা ডাঃ বিধান রায় দলের পক্ষে ভার পাইলেন ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে। সেই উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন, তাহা সমাপ্ত করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কেননা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সরকারী বিবরণীতে দেখিলাম, উহার মুদ্রণে প্রায় সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা স্থানের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা ছিল যেমন তথ্য ও যুক্তিতে পূর্ণ, তেমনই ছিল জোরালো। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

সদস্যগণের ধৈর্যকে নিঃশেষে পীড়ন করিতে আমি প্রয়াসী হইব; কেননা,

প্রস্তাব-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সদস্যগণের নিকট উপস্থাপিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ কর্মীরূপে আমি অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য মনে করি। যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে হয়, তবে উহার শিক্ষাদাতাদিগের এবং অন্যান্য কর্মচারিগণের চাকরির স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিলে নৈপুণ্যের সহিত কার্য পরিচালিত হইতে পারে না। ইহার ফলে কেবল যে শিক্ষাদাতাদিগেরই ক্ষতি হইবে তাহা নহে, ছাত্রগণেরও ক্ষতি হইবে। আমাদের প্রস্তাবিত মঞ্জুরি ব্যতীত ভবিষ্যতে কোন্ পরিকল্পনাই রচিত হইতে পারে না।' সরকারের মতো কর ধার্য করিয়া টাকা আদায়ের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই; একমাত্র ক্ষমতা আছে পরীক্ষার ফী বাড়াইবার, তাহাও সরকারের সম্মতি ব্যতীত করা যায় না। ইতঃপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের অপ্রিয়তার সম্মুখীন হইয়াও অর্থ সংগ্রহের জন্য পরীক্ষার ফী বাড়াইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরকারের সম্মতি পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর ডাঃ রায় স্নাতকোত্তর বিভাগের উন্নয়নের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডক্টর এইচ. ডব্লিউ. বি. মরিনো একটি ছোট বক্তৃতা দিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

স্যার আবদুর রহিমের বক্তৃতার পরে স্বরাজ্য দলের সদস্য খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রথমে আনীত প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হইলে গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে সম্মতি দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় ডাঃ বি. সি. রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতির আনীত অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণার্থ উপস্থিত করার প্রয়োজন হয় নাই।

ডাঃ রায়ের প্রথম সমাবর্তন-ভাষণ

ডাঃ বিধান রায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল ছিলেন, তখন দ্বিতীয় মহা বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে তিনি অধিপাল-রূপে ইংরেজীতে ভাষণ দিয়াছিলেন।

তাহাতে একস্থলে তিনি বলেন—অধুনা গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই শুনিয়া থাকি; ইহা শুধু এক প্রকার গবর্নমেণ্ট নির্বাচন-পদ্ধতি নয় যে, স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার আমাদের কাম্য। তাহার অর্থ কেবল আমরা যে দেশের লোক সেই দেশবাসীকে শাসন ব্যাপারে সাহায্যের অধিকার লাভ করাই নহে। আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করাই ইহার উদ্দেশ্য। ক্ষমতা যেখানে কম প্রয়োগ করা যায় তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা।

নিয়মানুবর্তিতাই কৃষ্টির প্রাথমিক লক্ষণ। সর্বজনার সর্বাধিক হিতসাধনই নৈতিক শিক্ষার আদর্শ। কেবলমাত্র সত্যের পরিবেশের মধ্যেই নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে।

ডাঃ রায়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন-ভাষণ

বিধানচন্দ্র অধিপাল থাকাকালে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ (১৩৫০ সালের ২০শে ফাল্গুন) শনিবার সার্কুলার রোডস্থিত বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধিপাল স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এক উদ্দীপনা-পূর্ণ অভিভাষণ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা

"ডাঃ বিধান রায় তাঁহার অভিভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলার স্যার জন হার্বার্ট এবং ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার নীলরতন সরকারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার পর বলেন যে—১৯৪৩ সালের ৬ই জুন তারিখে সিনেটের এক বিশেষ সভায় স্যার নীলরতনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ তাঁহার নামানুসারে অভিহিত করা হইবে। ডাঃ রায় তাঁহার বক্তৃতায় আরও জানান যে, সাইক্লোস্টোন সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিরলার নিকট হইতে ৬০ হাজার টাকা অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়াছেন। তিনি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এই টাকা অর্পণ করিবেন। জনৈক অধ্যাপক (তিনি আপাততঃ তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে চাহেন না) বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন; তিনি ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আর. এম. ঠাকুর তাঁহার পরলোকগত কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের ৭৫০০৲ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ অর্পণ করিয়াছিলেন। এই টাকা হইতে একটি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতি বৎসর একটি করিয়া সুবর্ণ-পদক দানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্তও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ রায় বলেন যে, যাঁহারা এইবার উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ নলিনীমোহন সান্যালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বিহারী ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ৮০ বৎসর বয়সে তিনি পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন দে ১৯ বারের চেষ্টায় বি. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছেন। তিনি বাংলা দেশের আধুনিক রবার্ট ব্রুস। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর এবং বি. এ. ডিগ্রি লাভের জন্য তিনি তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম অংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ দৃঢ় সংকল্পের দৃষ্টান্তের কথা আর একটি মাত্র জানি। তিনি ছিলেন আমার সমব্যবসায়ী পরলোকগত ডাঃ নন্দন। ১৮৯৬ সাল হইতে তিনি চিকিৎসা বিভাগের শেষ পরীক্ষা দিতে সুরু করেন এবং ১৯২২ সালে পরীক্ষায় পাস করেন।

বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে ডাঃ রায়ের ভাষণ

ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালাচারীয়াকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সম্মানসূচক ডক্টর অব্ ল' (ডি এল.) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। উপাধিদান উপলক্ষে যে বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অস্থায়ী ভাইস্-চ্যান্সেলাররূপে ডাঃ বিধান রায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়াছিলেন। উহার সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"রাজাজী যেখানে যে আসনেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কখনও বিস্মৃত হন নাই যে, সাধারণ লোকেরাই দেশকে গড়িয়া তোলে; এবং যাঁহারা সৌভাগ্যের আসনে আসীন, তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ বিবেচনা তাহাদের প্রাপ্য। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রাচ্যের সন্তান হইলেও বিস্ময়ের বিষয় ইহাই যে, পাশ্চাত্ত্য কূটনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। তাঁহার সূক্ষ্ম ও বিচারক্ষম বুদ্ধিবৃত্তি, অপরকে স্বমতে আনয়ন করিবার শক্তি এবং তাঁহার লৌহ-কঠিন সঙ্কল্প প্রায়ই শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে জয়লাভ করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ধৈর্য রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৪৮ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর)

ডাঃ রায় ও রাজাজী বহু বৎসর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপালের পদে রাজাজী অধিষ্ঠিত থাকাকালে বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁহাকে আরও ভালো করিয়া চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ডাঃ রায় মানুষের রোগ নির্ণয়েই কেবল দক্ষ নহেন, দোষে-গুণে গঠিত মানুষের মধ্যে গুণগুলি বাছিয়া লইবার দক্ষতাও তাঁহার

আছে। পূর্বোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত ভাষণেই সেই দক্ষতার পরিচয় মিলিবে। যে কয়েকটি গুণ রাজাজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তৎসমুদয় পরিস্ফুট হইয়াছে ডাঃ রায়ের সমাবর্তন ভাষণে।

ডাঃ রায় কখনও সিনেটের সদস্যরূপে, কখনও সিণ্ডিকেটের সদস্যস্বরূপ এবং কখনও বা ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রের এবং প্রতিভাবান, উৎসাহী ও উদ্যমশীল সেবকের নিঃস্বার্থ নিরলস সেবায় সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। ডাঃ রায়ের সেবা ও কর্মাবদানের জন্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব্ সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

কলিকাতা পৌরসঙ্ঘ

প্রথম মহা-বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীর গদিতে বসিলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুআরি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। সংশোধিত 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল য়্যাক্ট' তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের প্রশংসনীয় কার্য বলা যাইতে পারে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখের অধিবেশনে ওই আইন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইল। সেই আইনের বিধান মতে কলিকাতা নগরের শহরতলীর কয়েকটি অঞ্চল কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তভূক্ত করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর লণ্ডনের মতো কলিকাতাকে পৌর মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া উন্নত করিবার ব্যবস্থা পূর্বোক্ত নূতন আইনে রহিয়াছে। পৌর জনগণের ভোটদানের অধিকারও প্রসারিত করা হইল। লণ্ডন নগরের পৌরসঙ্ঘের মতো কলিকাতার পৌরসঙ্ঘে (কর্পোরেশনে) মেয়র এবং অল্‌ডারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থাও করা হইল নয়া আইনে। অলডারম্যানের সংখ্যা হইল পাঁচ জন, ইঁহাদের নির্বাচন করিবেন কাউন্সিলারগণ। ওই পাঁচ জনের দ্বারাই নির্বাচিত হইবেন মেয়র বা মহানাগরিক। তৎকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় ছিল অখণ্ড বঙ্গের সরকারী রাজস্বের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ। পদমর্যাদায় অল্‌ডারম্যানদের স্থান হইল মেয়রের পরেই। মেয়রের পদমর্যাদা এবং কার্য ব্যবস্থাপক সভার স্পীকারের বা সভাপালের অনুরূপ।

নব-রচিত আইনের বিধান অনুসারে কর্পোরেশনের যে নির্বাচন হইল, তাহাতে কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্ত স্বরাজ্য দল জয়লাভ করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (সি. আর. দাশ) প্রথম মেয়র নির্বাচিত হইলেন। পরের বৎসর (১৯২৫ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল) সেই পদে দ্বিতীয় বার তাঁহারই পুনর্নির্বাচন হইল। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে দুঃখিত হইয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে না। তাঁহার আত্মচরিত 'A Nation in making' গ্রন্থে (৩৪ তম অধ্যায়ে) তিনি লিখিয়াছেন যে, মিঃ সি. আর. দাশের মেয়রের পদে নিয়োগ স্বরাজ্য দলের প্রথম গুরুতর ভুল। মিঃ দাসের কর্মকৌশল ও বিচারবুদ্ধির উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। এই সম্পর্কে স্বরাজ্য দলের কর্মনীতির সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, ওই পদে সাধারণতঃ অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন সেই সকল সম্মানিত নাগরিকেরাই—যাঁহারা

পৌরসঙ্ঘের কাজ করিতে করিতে পক্ককেশ হইয়া গিয়াছেন। গ্ল্যাডস্টোনকে, পামারস্টনকে কিংবা ডিস্রেইলিকে ওই পদ কখনও দেওয়া হয় নাই, কেননা ইহা পৌরসেবার খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাপ্য সম্মান। মিঃ দাশের সমগ্র জন-জীবনের মধ্যে তিনি কোন দিন মিউনিসিপাল অফিসের কয়েক মাইলের মধ্যেও যান নাই। কিন্তু তাঁহার দলের হাতে ক্ষমতা থাকায় এবং তিনি নেতা বলিয়া পৌরকার্যের এতটুকু অভিজ্ঞতা ব্যতীতই রাতারাতি তাঁহাকে মহানাগরিকের (মেয়রের) পদে অধিষ্ঠিত করা হইল। সুরেন্দ্রনাথের সমালোচনা হইতে বুঝা যায় যে, স্বরাজ্য দলের পক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে মিউনিসিপাল কার্যে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মেয়রের পদের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো উচিত কাজ হয় নাই। তাঁহার এই আপত্তি খণ্ডন করিবার যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত আত্মচরিতের পরবর্তী অধ্যায়েই আছে। সংশোধিত ক্যালকাটা মিউনিসিপাল য়্যাক্ট প্রবর্তনের পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনার জন্য গবর্নমেণ্ট একজন সিনিয়ার আই. সি. এস. রাজপুরুষকে 'চেয়ারম্যান অব্ দি কর্পোরেশন' পদে নিয়োগ করিতেন। ওই লোভনীয় পদটি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্যই সংরক্ষিত থাকিত। সুরেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে (৩৫তম অধ্যায়ে) তাঁহার মন্ত্রিত্বকালের উল্লেখযোগ্য কার্যের বিবরণ দান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম সেই পদে বাঙ্গালী সিভিলিয়ান মিঃ জে. এন. গুপ্তকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পরবর্তী চেয়ারম্যান নিয়োগ করার বেলায় সুরেন্দ্রনাথ পূর্বপ্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমে মনোনীত করিলেন একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে। ইনি হইলেন আলিপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকিল, কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলার এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। শাসন-কর্তৃমণ্ডলীর কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে,—মিউনিসি-পালিটির শাসনকার্যে মিঃ মল্লিকের অভিজ্ঞতা নাই, এবং উহার আভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্র কিভাবে পরিচালিত হয়, তাহাও তিনি জানেন না। সেই আপত্তির উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন :—মিঃ লয়েড জর্জ যখন 'চ্যান্সেলার অব্ দি এক্স্চেকার' হইলেন, তখন ব্রিটিশ অর্থনীতিক ব্যবস্থার কি জানিতেন? মিঃ মল্লিককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগাইয়া সাহায্য করার জন্য কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারীরাই রহিয়াছেন। কর্পোরেশনের মতো একটা বৃহৎ বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন হইল—প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এবং তথ্যাদি সম্পর্কে এরূপ জ্ঞান—যদ্দারা স্থায়ী কর্মচারিগণকে পরিচালিত করা ও উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার এই যুক্তি মানিয়া লইয়া বাংলার গবর্নর মিঃ মল্লিকের নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছিলেন। অনুরূপ যুক্তি কি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মেয়র-পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে? দেখিতেছি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রবীণ বহুদর্শী জননায়কও দলাদলির সংকীর্ণ মনোভাব হইতে নিজকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই।

কর্পোরেশন পরিচালনার ভার কংগ্রেস দলের হস্তগত হইবার পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রায় আট বৎসর অলডারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং দুই বার কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি সেই একই দলের হাতে পৌর-শাসনভার ন্যস্ত রহিয়াছে। কংগ্রেস দলের হাতে কেবল কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালনার ভারই আসে নাই, তেইশ বৎসর পরে (১৯৪৭ খ্রীঃ) খণ্ডিত ভারতের শাসন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বও আসিয়াছে। এই মহানগরীর পৌর-শাসনক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে থাকায়, স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই বাইশ বৎসরের (১৯২৪ খ্রীঃ—১৯৪৬ খ্রীঃ) মধ্যে ইহার নব রূপায়ণ হইয়াছে। কত দিক দিয়া যে কলিকাতার উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে, তাহা নগরবাসীগণ অবগত আছেন বলিয়া বিস্তারিতভাবে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটা কিংবদন্তী আছে যে, জন-স্মৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী—'Public memory is short.' সুতরাং কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি:—অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা, কর্পোরেশনের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মী ও শ্রমিকগণের বেতনাদি বৃদ্ধি ও কতকগুলি বিষয়ে ন্যায্য সুবিধা দান, পৌরস্বাস্থ্যের বিবিধ উন্নতি সাধন এবং নির্যাতিত দেশসেবকগণের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। এই সমুদয় ব্যতীতও কলিকাতা পৌরসঙ্ঘের অনুরূপ প্রশংসনীয় অবদান আরও রহিয়াছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ রাজস্ব দলের সমালোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ সতর্কবাণীও শুনাইয়াছেন যে,—ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হয়; এবং সেই ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তগত থাকে ততদিন পর্যন্তই, যতদিন তাঁহারা ন্যায়ানুষ্ঠানের সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া না যান। সমস্ত ইতিহাসের তাহাই শিক্ষা। "Power is given to the righteous; and is held by the righteous so long as they do not deviate from the golden track of right dealing. That is the lesson of all history." ওই সতর্ক-বাণী সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে কাহারও দ্বিমত হইবার সঙ্গত কারণ দেখিতেছি না। কংগ্রেসপন্থীগণ যে একাদিক্রমে এত দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালনার ক্ষমতা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের লোকপ্রিয়তার পরিচয় মিলিতেছে; অধিকন্তু তদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা পৌর-শাসন ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ (স্বাধীনতা লাভের বৎসর) পর্যন্ত যাঁহারা কংগ্রেস-মনোনীত কিংবা কংগ্রেস-সমর্থিত প্রার্থীরূপে মেয়র বা মহানাগরিক নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও নির্বাচনের তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

নাম	নির্বাচনের তারিখ
সি. আর. দাশ	১৬. ৪. ২৪
সি. আর. দাশ	১. ৪. ২৫
জে. এম. সেনগুপ্ত	১৭. ৭. ২৫
জে. এম. সেনগুপ্ত	১. ৪. ২৬
জে. এম সেনগুপ্ত	২৭. ৪. ২৭
বি. কে. বসু	২. ৪. ২৮
জে. এম. সেনগুপ্ত	১০. ৪. ২৯
জে. এম. সেনগুপ্ত	২৯. ৪. ৩০
সুভাষচন্দ্র বসু	২২. ৮. ৩০
ডাঃ বি. সি. রায়	১৫. ৪. ৩১
ডাঃ বি. সি. রায়	১১. ৪. ৩২
সন্তোষকুমার বসু	২৯. ৪. ৩৩
নলিনীরঞ্জন সরকার	৪. ৭. ৩৪
এ. কে. ফজলুল হক	৩০. ৪. ৩৫
স্যার হরিশঙ্কর পাল	২৯. ৪. ৩৬
সনৎকুমার রায়চৌধুরী	২৮. ৪. ৩৭
এ. কে. এম. জাকারিয়া	২৯. ৪. ৩৮
এন. সি. সেন	১৬. ৪. ৩৯
এ. আর সিদ্দিক	২৪. ৪. ৪০
পি. এন. ব্রহ্ম	২৮. ৪. ৪১
এইচ. সি. নস্কর	২৯. ৪. ৪২
সৈয়দ বদরুদ্দুজা	৩০. ৪. ৪৩
আনন্দিলাল পোদ্দার	২৫. ৬. ৪৪
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৭. ৪. ৪৫
এস. এম. ওসমান	২৯. ৪. ৪৬
সুধীর রায়চৌধুরী	২৯. ৪ ৪৭

বিধানচন্দ্রের কর্মতৎপরতা

ডাঃ রায় সর্বপ্রথম অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত হন ১৯৩০—৩১ খ্রীষ্টাব্দে এবং সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৩২—৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় অলডারম্যানের পদে ইস্তফা দিলে তৎস্থলে বিধানচন্দ্র পুনর্নির্বাচিত হইলেন ১৯৩৮—৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ করিলে ডাঃ রায় তাঁহার স্থানে অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন তৃতীয় বারের জন্য ১৯৪১—৪২ খ্রীষ্টাব্দে, এবং সেই পদে থাকিয়া ১৯৪৩—৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরবাসীগণের সেবা করেন। তিনি কর্পোরেশনের এক্‌শটি কমিটিতে থাকিয়া- কোন কোন কমিটির সভাপতিরূপে এবং কোন কোন কমিটির সদস্যস্বরূপ—মহানগরীর অধিবাসীগণের সেবা করিযাছেন। নিম্নে চারিটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির উল্লেখ করিতেছি ঃ—

বাজেট স্পেশাল কমিটি—চেয়ারম্যান ঃ ১৯৩১—৩২, ১৯৩২—৩৩, ১৯৩৯—৪০, ১৯৪২—৪৩, ১৯৪৩—৪৪;

ফিনান্স স্ট্যাণ্ডিং কমিটি—চেয়ারম্যান ঃ ১৯৩০—৩১, ১৯৪২—৪৩, ১৯৪৩—৪৪;

সার্ভিসেস স্ট্যাণ্ডিং কমিটি—চেয়ারম্যান ঃ ১৯৩১—৩২, ১৯৩৯—৪০;

পাব্‌লিক্ হেলথ্ স্ট্যাণ্ডিং কমিটি—সদস্য ঃ ১৯৩৯—৪০।

অপরাপর কমিটিগুলির নামও নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ডেভেলপমেণ্ট স্কিম্ স্পেশ্যাল কমিটি; বেগার প্রব্লেম্ স্পেশ্যাল কমিটি; বিলডিং রুল্‌স্ রিভিসান স্পেশ্যাল কমিটি; ড্রেইনেজ ডিপার্টমেণ্ট ইঙ্কোয়ারি স্পেশ্যাল কমিটি; হরিজন স্পেশ্যাল কমিটি; লাইভ স্টক্ য়্যাণ্ড মিল্ক সাপ্লাই স্পেশ্যাল কমিটি; ড্রাফ্‌ট্ ভ্যাগ্রেন্সী বিল স্পেশ্যাল কমিটি; স্ট্রে বুল্‌স য়্যাণ্ড ক্যাটল ইঙ্কোয়ারি স্পেশ্যাল কমিটি; আন্‌এম্প্লয়মেণ্ট প্রব্লেম্ স্পেশ্যাল কমিটি এ. আর. পি. স্পেশ্যাল কমিটি; কর্পোরেশনের আর্থিক বিষয়ে মিঃ. সি. ডব্‌লিউ. গার্নারের রিপোর্ট বিবেচনার জন্য স্পেশ্যাল কমিটি; পল্‌তা পাম্পিং স্টেশন ইঙ্কোয়ারি স্পেশ্যাল কমিটি; ট্রেইনিং অব্ ইণ্ডিয়ান নার্সেস্ সাব্-কমিটি; মিউনিসিপাল (য়্যামেণ্ড্‌মেণ্ট) বিল স্পেশ্যাল কমিটি; মেহোমিডেন য়্যাণ্ড্ ব্যাক্‌ওয়ার্ড য়্যাণ্ড্ মাইনারিট কমিউনিটিজ্ এমপ্লয়মেণ্ট্ স্পেশ্যাল কমিটি; রুল্‌স্ অব্ বিজ্‌নেস্ স্পেশ্যাল কমিটি; প্লে গ্রাউণ্ড্ ফেসিলিটিজ্ স্পেশ্যাল কমিটি।

টেগার্ট সাহেবের বক্তৃতা ও কর্পোরেশন

স্যার চার্লস্ টেগার্ট বাংলা সরকারের পুলিস বিভাগের স্পেশ্যাল ইণ্টেলিজেন্স্ ব্রাঞ্চের বড়কর্তা ছিলেন। বাংলার স্বাধীনতাকামী বিপ্লবপন্থী যুবকদের উপর

লাঞ্ছনা-নির্যাতনের জন্য তিনি, তাঁহার সহকর্মী মিঃ লোম্যান প্রভৃতি কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। টেগার্ট সাহেবকে তাঁহার কর্মদক্ষতার জন্য পুরস্কৃত করা হইল কলিকাতার পুলিস কমিশনারের পদে নিযুক্ত করিয়া। অবসর গ্রহণান্তে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাংলা দেশের বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বিষোদ্গীরণ করিতে থাকেন। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতে বিপ্লববাদ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সভার বিবরণ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়। সভা আহ্বান করিয়াছিল রয়েল এম্পায়ার সোসাইটি এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলার ভূতপূর্ব গবর্নর স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন। টেগার্ট সাহেব বলেন যে,—একথা বলা যায় যে, বাংলা দেশে এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নাই, যেখানে প্রধান প্রধান নেতাদের অধীন কোন একজন বিপ্লবী নাই। ইহার ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ওই সকল নেতার আদেশে বিপ্লবী যুবকেরা রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিতেছে, কিন্তু পুলিস উহাদের ধরিতে পারিতেছে না। ওই সমুদয় নেতা পুলিসেব দৃষ্টি এড়াইয়া চলে এবং বিপ্লবী দল পরিচালনা করে। ইহারা যুবকদের প্রতারণা করিয়া দলে আনে এবং উহাদের মনকে গবর্নমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। বিপ্লবী নেতারা এমন ধরনের লোক যে, জনসাধারণ তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিসকে সামান্য সাহায্য করিতেও সাহস করে না।

ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্যার চার্লস্ টেগার্ট বলেন যে, অনেক রক্তপাত হইয়া গিয়াছে এবং উহার পরিণাম বাস্তবিকই ভয়াবহ হইত—যদি সাহসী পুলিস কর্মচারীর দল বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করাটা জীবনের একটা দুঃসাহসিক কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ না করিতেন। বক্তা বলেন যে,—তিনি তিনটি বিভাগের তিন জন বড়কর্তাকে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওই সকল নিহত পুলিস কর্মচারীর বিপজ্জনক কর্তব্যভার অন্য কর্মচারী বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার কংগ্রেসে বর্তমানে বিপ্লবী দলের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া টেগার্ট সাহেব বলেন যে,—সম্প্রতি একজন ইউরোপীয়ানকে হত্যার অপরাধে যে বিপ্লবী যুবকের ফাঁসি হইয়াছে, তাহাকে প্রশংসা করিতে বাংলার কংগ্রেসকে বিপ্লবী দল বাধ্য করিয়াছে। তিনি কংগ্রেসকে এবং বিশেষ করিয়া কংগ্রেস-নেতা মিঃ সি. আর. দাশকে দোষারোপ করিয়া বলেন যে,—মিঃ দাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইবার পরে এমন সব লোককে চাকরির জন্য আহ্বান করিলেন, যাহারা দেশের স্বার্থের জন্য দুঃখকষ্ট স্বীকার করিয়াছে। ইহার ফলে অনেক বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের আত্মীয় কর্পোরেশনে চাকরি

পাইয়াছে। বেশির ভাগ বিপ্লবীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে শিক্ষকতার কার্যে। প্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলন কালের অপেক্ষা বর্তমান কালে সমগ্র প্রদেশে স্কুল ও কলেজে বিপ্লবীরা অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং গবর্নমেণ্ট আবার ভারত রক্ষা আইনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং ইতঃপূর্বে ওইরূপ ব্যবস্থার দ্বারাই বিভীষিকা-মূলক কার্যাবলী দমন করা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত রাজনীতিক বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া হইল; বিপ্লব দমনের উপযুক্ত আইন রহিত করার কিছুকাল পরেই চট্টগ্রামে চমকপ্রদ ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বিপ্লবীদলের তৃতীয় অভিযান বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কীর্তিমান টেগার্ট সাহেবের পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতায় সমগ্র বাংলাদেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। তাহা লইয়া কর্পোরেশনের ৯ই নভেম্বরের সভায় আলোচনা হয়। সেই সভার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"পূজার ছুটির পর গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার ভূতপূর্ব পুলিস-কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট বিলাতে বসিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন বিভীষিকা উৎপাদনকারীদিগকে অনেক চাকরি দিয়াছেন; বিশেষতঃ কর্পোরেশন ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকপদে ঐরূপ অনেক লোককে নিয়োগ করা হইয়াছে।

"মিঃ আবদুল রজ্জক উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য মেয়রকে নোটিশ দেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বলেন যে উক্ত বিবৃতিতে যে সকল অভিযোগ আছে তাহা ভিত্তিহীন অন্যায় অযাচিত। তিনি বলেন যে, হয় মেয়র মহাশয় স্বয়ং কিছু উক্তি করেন অথবা সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি দিন স্থির করা হউক।

"মিঃ ক্যাম্বেল ফরেস্টার বলেন যে, দিন ধার্য করায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই বটে, তবে তিনি বলেন যে, এই কথা সত্য কিনা তাহা অবধারণ করা ভাল।

"মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, তাঁহারা বহুবার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, স্যার চার্লস্ টেগার্টকে পত্র লিখিয়া তাঁহার বক্তৃতাটি পুরাপুরি আনয়ন করা ভাল, তারপর এই বিষয়ে সভায় আলোচনা করিলেই চলিবে। ঐ বিবৃতিতে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃত নহে। মিঃ ফরেস্টার বলিয়াছেন যে, ঐ বিবৃতি পুরাপুরি পাঠ করিলে অন্যরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

"পরিশেষে মেয়র মহাশয় বলেন যে, এই প্রকার প্রচারকার্যের দ্বারা কর্পোরেশনের কর্তব্য সম্পাদনের কোন বিঘ্ন হইবে না। তিনি সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি স্যার চার্লস টেগার্ট যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার অনুলিপি পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিবেন।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ই নভেম্বর ১৯৩২)

মেয়র ডাক্তার রায়ের বিবৃতি

স্যার চার্লস টেগার্টের বক্তৃতা এবং কর্পোরেশনকে আক্রমণ সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের ৫ই ডিসেম্বরের (১৯৩২ খ্রীঃ) সভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতি দান করেন। সেই সভার বিবরণ এবং মেয়রের বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"স্যার চার্লস টেগার্টের বিষোদ্গার—কর্পোরেশনকে আক্রমণ," "কর্পোরেশন বিপ্লবীদের পালক— মেয়রের বিবৃতি"

"ইংলণ্ডে কিছুদিন পূর্বে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার চার্লস টেগার্ট বলিয়াছেন যে, কর্পোরেশন বিপ্লবীদিগকে এবং বিপ্লবীদের আত্মীয়গণকে মাস্টারের চাকুরি দিয়া পুষিতেছেন। ঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্পর্কে কাউন্সিলারদের অভিলাষ সমর্থন করিয়া মেয়র গত সোমবারের সভায় ঐ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দান করেন। তিনি বলেন ঃ—কর্পোরেশন স্থির করিয়াছিলেন যে, স্যার চার্লস টেগার্টের বক্তৃতার একখণ্ড সঠিক অনুলিপি না পাওয়া পর্যন্ত ঐ বিষয়ে কর্পোরেশন বিবেচনা স্থগিত রাখিবেন ; কিন্তু এখানকার ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েসন ঐ বক্তৃতা এখানে মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি অদ্যকার কাগজে আবার রয়টারের খবর আসিয়াছে যে, স্যার চার্লস্ টেগার্ট জনৈক সংবাদপত্র-প্রাতনিধির নিকট তাঁহার পূর্ব উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। রয়টারের তারের ভাষা উল্লেখ করিয়া মেয়র বলেন— অভিযোগের বিষয়ীভূত বিষয় সম্পর্কে আমি পূর্বে বলিয়াছি, এখনও তাহার পুনরুক্তি করিতেছি। ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নির্লজ্জ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। দেশের এই সঙ্কটসময় যাঁহারা সত্য তথ্যের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদিগের মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে লোকের মনকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়েই উহা প্রচার করা হইয়াছিল।

স্যার চার্লসকে আমরা একজন কৃতী কর্মচারী বলিয়াই জানি, কিন্তু তিনি যে একজন কুটিল তার্কিক তাহা আমরা জানিতাম না। স্যার চার্লস তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে,—পরলোকগত দেশবন্ধু মেয়র হইয়াই যাঁহারা দেশের জন্য কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চাকুরি লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে দেশবন্ধু সত্যই এরূপ করিয়াছিলেন কিনা, কর্পোরেশনের কাগজপত্রে তাহার প্রমাণ নাই। ধরিয়া লওয়া গেল তিনি তাঁহাদিগকে চাকুরি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দোষের কি আছে? দেশবন্ধু মেয়র রূপেও জেল খাটিয়াছেন। দেশের কাজে জেল খাটিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই দেশের কাজে জেল খাটিয়াছেন। দেশের কাজে জেল খাটিয়াছেন এক কথা, আর কর্পোরেশন অনেক বিপ্লবী ও তাঁহাদের আত্মীয়গণকে শিক্ষকতার চাকুরি দিয়া পুষিয়া আসিতেছেন, এ কথা বলার অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশের কাজ করা আর বিপ্লবী হওয়া এক কথা নয়। এই পার্থক্য রাস্তার লোকও বুঝিতে পারে, স্যার চার্লস্ কি বুঝিতে পারেন না?

"সময় বুঝিয়া স্যার চার্লস্ এখন সেই পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন কেন,—এ বিষয়ে মেয়র বলেন:—ইহা যে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক প্রচারকার্য, তাহা বুঝিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ বহুবার আনীত হইয়াছে, প্রতিবারই কর্পোরেশন অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। স্যার চার্লস্ যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যদি সত্য থাকিত, তাহা হইলে ঐ সময়ে কেন তিনি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? ঐ সময় তাহার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং সরকারেরও তাঁহার উপর যথেষ্ট আস্থা ছিল। আমি শিক্ষা-বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে,—চাকুরি পাওয়ার পর বিপ্লববাদ সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছে এরূপ কোন লোককে চাকুরি দেওয়া হয় নাই; তবে সেই বৎসর পূর্বে একটি ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত এক ব্যক্তিকে চাকুরি দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি কোন কালে যদি বিপ্লববাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে চাকুরি দেওয়ার পক্ষে বাধা কি? বাংলার ভূতপূর্ব গবর্নর লর্ড লিটন ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারে মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন; পরে তিনি স্বীকারোক্তি করায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সরকারী চাকুরিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষে কি ইহা অসঙ্গত হইয়াছে, না হইয়া থাকিলে এই ধরনের অভিযোগের মূল্য কি?

"মেয়র বলেন—আমি পূর্বেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি যে,—কর্পোরেশন এই সকল অভিযোগ খণ্ডন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিবে, নাগরিকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারিবে। এই বিষয়ে কর্পোরেশনের সাফল্যই সম্ভবতঃ কোন কোন লোকের মনে হিংসার জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। আমরা যতদিন পর্যন্ত যথাযথভাবে আমাদের কর্তব্য সমাধান করিয়া যাইতে পারিব, ততদিন পর্যন্ত আমরা সগর্বে সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রবচনের উল্লেখ করিবার অধিকারী থাকিব—"উহারা অনেক বলিয়াছে, অনেক বলিবে, যত পারে বলুক।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩২)

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তাঁহার আশ্রমবাসী উনআশি জন সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে লইয়া লবণ-সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ করেন। ডাণ্ডি অভিমুখে মহানায়কের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গুর্জর হইতে পূর্বে বঙ্গদেশের মেঘনা-সৈকত অবধি সমগ্র দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মহাত্মাজীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিদ্যুদ্‌বেগে পরিব্যাপ্ত হইল দেশময়। জনগণের নিকট অপরাধী স্বৈরাচারী বিদেশী রাজার দুর্বলচিত্তে শঙ্কা জাগিল। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার তৃতীয় মাসেই গান্ধীজী বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৪ই মে তারিখের অল্‌ডারম্যান ও কাউন্সিলারদিগের সভায় মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন—অহিংসার দেবদূত মহাত্মা গান্ধীকে এই পৌর প্রতিষ্ঠান পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রণতি নিবেদন করিতেছে এবং তাঁহার অভিযানের অভূতপূর্ব সাফল্যে ও তাঁহার কারাবরণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইল।

বিপ্লবী দধীচির আত্মবলিদানে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ডালহাউসি স্কোয়ারে মহাকরণে (রাইটার্স বিল্ডিং) বেলা দ্বিপ্রহরের পরে বাংলা সরকারের তদানীন্তন ইনস্পেক্‌টার জেনারেল অব্‌ প্রিজন্স্‌ লেফটেনেণ্ট-কর্নেল সিম্‌সন তিন জন সশস্ত্র বিপ্লবী যুবকের রিভলভারের গুলিতে নিহত হন। ঘটনার কিছু কাল পরে অস্ত্রধারী পুলিসবাহিনী আসিয়া রাইটার্স বিল্ডিং বেষ্টন করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত থাকে

এবং একদল উপরে উঠিয়া বিপ্লবীদের ধরিবার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিবর্ষণ চলে; তাহাতে কোন পক্ষেই হতাহত হয় নাই। বিপ্লবীদের সমস্ত গুলি ফুরাইয়া গেল। অধিনায়কের আদেশ, কোন অবস্থাতেই শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ নহে, বরং আত্মবিলোপ। দুর্ধর্ষ বিপ্লবীত্রয়—বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দিনেশ গুপ্ত মারাত্মক বিষ পটাসিয়াম সাইনাইড্ পান করিলেন এবং বিনয় ও দিনেশ বিষপানের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলিও ছুঁড়িলেন। সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ পঞ্চদশ-বর্ষীয় বাদলের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। পাঁচ দিন পরে বিনয়ের প্রাণ-বিয়োগ হইল হাসপাতালে। দিনেশের তখন মৃত্যু হইল না। সুস্থ হইবার পরে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলের বিচারে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুআরি তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। হাইকোর্টে আপীলে বিচারপতি বাকল্যাণ্ড সেই দণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখেন।

৭ই জুলাই প্রাতঃকালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দিনেশের ফাঁসি হইল। মৃত্যুঞ্জয় বিপ্লবী বীর প্রফুল্ল-চিত্তে "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল···জীবনের জয়গান।" সেই দিন কলিকাতায় হরতাল পালন করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক মহতী জনসভায় বিপ্লবী দধীচির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইল। কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের এক সভায় দিনেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, আত্মোৎসর্গ ও আদর্শনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক হইতে এবং কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে দিনেশ তাঁহার জীবনাদর্শকে সার্থক করিবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহা সমর্থন করিতে পারা যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার ব্রত পালনে অন্তিমকাল পর্যন্ত যে সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তৎপ্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারি না। এই পর্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দিনেশ প্রফুল্ল-চিত্তে ফাঁসুড়ের ফাঁস গলায় পরিয়াছে; এবং তাঁহার কণ্ঠ হইতে যে শেষ বাণী ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা 'বন্দে মাতরম্'। হাইকোর্টের বিচারপতি বাকল্যাণ্ড তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, ওই যুবক আত্মস্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় নাই। বস্তুতঃ পক্ষে বিচারপতি বাকল্যাণ্ড কেবল ইতিহাসের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। আমরা এই প্রকার বহু

ইতিহাসের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। আমরা এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত বহুবার পাঠ করিয়াছি—যেখানে অনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়া যাঁহারা এক পুরুষে দণ্ডিত হইয়াছেন, পরবর্তী পুরুষে তাঁহারা সেই কার্যের জন্যই শহীদ বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। অতএব এই যুবক তাঁহার জীবনাদর্শকে সার্থক করিবার জন্য যে সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

যে সকল দেশভক্ত জন্মভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি ডাঃ রায়ের শ্রদ্ধা যে কত গভীর, তাহা পূর্বোক্ত ভাষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ভাষণে তাঁহার সৎসাহসের পরিচয়ও মিলিবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা

কবিগুরুর সপ্ততি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কর্পোরেশন কর্তৃক তাঁহার সংবর্ধনা ডাঃ রায়ের মেয়র-পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর (১১ পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা নাগরিকগণের এক সভায় মহানাগরিক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন :—

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি-প্রতিভা সমগ্র সভ্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই স্থানেই তাঁহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম-জীবনের সাধন-ক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম-ক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জন সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জন-সমাজে সম্মান লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্বতোমুখী

প্রতিভা বঙ্গ-ভাষাকে অপূর্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনা-প্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে এবং তোমার লেখনী-নিঃসৃত অমৃতধারা বাঙালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-গুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

বন্দে মাতরম্।

কলিকাতা,
১১ই পৌষ, ১৩৩৮।

তোমার গুণ-গর্বিত
কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়,
মেয়র।"

পাঠান্তে বিধানচন্দ্র কবিগুরুকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলে উত্তরে তিনি কহিলেন :—

"একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবি সংবর্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে, আরোগ্যে, আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক—পুরবাসীর দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি, সকল ধর্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক, এই আমি কামনা করি।"

ওই দিন বাংলার জনসাধারণের পক্ষেও কবিগুরুকে জনসভায় অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। সেই জন্য "রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদ" নাম দিয়া বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া পূর্বেই একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাহাতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কবি, কামিনী রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। সেই পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

কর্পোরেশন কর্তৃক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংবর্ধনা

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দ্বিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র বঙ্গদেশে জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনও তাঁহাকে সংবর্ধিত করিয়াছিল। ১০ ডিসেম্বর কর্পোরেশনের উদ্যোগে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আচার্যদেবকে মানপত্র দানে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় রচিত মানপত্র মেয়র পাঠ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাহাতে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য কর্পোরেশনকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, ৬৪ হাজার টাকার বেতনভোগী শাসন-পরিষদের সদস্যগণ ছাড়াও আমাদের চলে, কিন্তু শিক্ষকদিগকে ছাড়া আমাদের চলে না। কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৪০ হইতে ৫০ হাজার বালক-বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। কর্পোরেশন উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর বালক-বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে কিরূপ চেষ্টা করিতেছে, সেই বিষয়টির প্রতি একজন শিক্ষক হিসাবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি। অনুন্নত সম্প্রদায়ের অনেকে শিক্ষকতা-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা যে কর্পোরেশনের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষাদান কার্যে প্রতি বৎসর সাড়ে এগার লক্ষ টাকা ব্যয়ও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। কিন্তু একজন শিক্ষক স্বরূপ আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য মেয়রের মারফত কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানাইতেছি।

আচার্যদেব তাঁহার ভাষণে আরও বলেন:—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জন্যই কর্পোরেশনকে নিজেদের বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো চটি পায়ে দিয়া ঢুকিতে পারি। কর্পোরেশন শহরের হাসপাতালগুলিতে এককালীন ৪ লক্ষ টাকা এবং নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর

২ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিয়া থাকেন, ইহাও উল্লেখযোগ্য বিষয়। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আজকাল এ দেশের চিকিৎসকগণ বহুল পরিমাণে জনহিতকর কার্যে যোগদান করিতেছেন; ইতিপূর্বে এরূপ বড় একটা দেখা যাইত না। কিন্তু এখন বড় বড় চিকিৎসকদের আমরা জন-সেবকরূপে দেখিতে পাইতেছি। এই সম্পর্কে স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ আন্‌সারী, ডাঃ দেশমুখ এবং আমাদের মেয়র মহাশয়ের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরদিন আচার্যদেবের সম্মানার্থে কর্পোরেশনের অফিস এবং তদধীন সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বেতন বৃদ্ধি

পুরসভায় ডাক্তার রায়ের মহানাগরিকত্বের (Mayoralty-র) কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। পূর্ব হইতেই বিষয়টি কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবর্ধনা-সভায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করায় কংগ্রেসী দলের নেতা বিধান চন্দ্রের পক্ষে বেতন-বৃদ্ধির বিবেচনাধীন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সুবিধা হইল। এগার দিন পরেই ২০শে ডিসেম্বরের অল্‌ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের সভায় বেতন-বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডাঃ বিধান রায় প্রথম বার কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইবার কালে তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন। দ্বিতীয় বারের জন্য তাঁহার মেয়র নির্বাচন কালে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিঃ জে. এন. মৈত্র এবং মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক। এইবার শ্রীসন্তোষকুমার বসু ডাঃ রায়ের নাম প্রস্তাব করেন। ডাঃ রায় নির্বাচিত হইলেন ৪২ ভোটে, মিঃ মৈত্র এবং মৌলবী হক পাইলেন যথাক্রমে ২৬ ভোট ও ৮ ভোট। প্রথমবারের কার্যকাল শেষ হইয়া গেল কাউন্সিলার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডাঃ রায়ের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনের ইতিহাসে তাঁহারা এই প্রথম দেখিতে পাইলেন মেয়র দ্বিপ্রহরে অফিসে আসিয়া অপরাহ্ণ তিনটা পর্যন্ত কাজ করিতেছেন। জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাঃ রায়ের কাজ করার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থাকিলেও পুরসভার ব্যাপক ও সমস্যা-সংকুল কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নবাগত। তৎসত্ত্বেও তিনি সাফল্যের সহিত তাঁহার কর্তব্য-কার্য সম্পন্ন করিয়া সমস্ত দলের প্রশংসা লাভ করেন। দ্বিতীয়বার মেয়রের

কার্য সমাপনান্তে বিদায় লইবার কালে অল্‌ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের সভায় বিপক্ষদলের পক্ষে মিঃ পি. এন. গুহ, মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ ক্যাম্বেল ফরেস্টার প্রভৃতি ডাঃ রায়ের প্রশংসা করিলেন। মিঃ গুহ বলেন যে, এমন কোন উপলক্ষ কখনও হয় নাই, যাহাতে মেয়রের কোন সিদ্ধান্তে বা সভার কার্য পরিচালনায় আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারিত। মিঃ বিশ্বাস বলিলেন যে, কৃতজ্ঞতা ও গুণগ্রাহিতার সহিত তিনি স্বীকার করিতেছেন ডাঃ রায় তাঁহার ভুল বুঝিতে পারা মাত্রই তাহা সংশোধন করিতেন। মিঃ ফরেস্টার বলেন যে, মেয়র অতি উত্তমরূপে ("extremely well") তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং কেহই তাঁহার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পান নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কংগ্রেসী নেতৃমণ্ডলে আসন লাভ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিলেন গান্ধীজী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের নেতার ('লীডার'-এর) পদে তিনি গান্ধীজীর নির্দেশে অধিষ্ঠিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর যোগ্য শিষ্যের শিরে 'ট্রিপ্‌ল্‌ ক্রাউন' বা ত্রিমুকুট পরাইয়া দিলেন। সেই মহান নেতার জীবনাবসানের কিছুকাল পর হইতে বাংলাদেশের পাঁচ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতাকে এক সঙ্গে মিলিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে কাজ করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত; চারজন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার এবং একজন কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রভাবশালী সদস্য। তাঁহারা 'বিগ্‌ ফাইভ্‌' অর্থাৎ বৃহৎ পঞ্চক বলিয়া অভিহিত হন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামীকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল দেশবিশ্রুত বৃহৎ পঞ্চক। প্রথম জন যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব, চতুর্থ জন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং পঞ্চম জন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বড় জমিদার। হয়তো বা অনেকের মনে এরূপ ধারণা থাকিতে পারে যে, উল্লিখিত পঞ্চনেতা পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আধিপত্য লাভ বা বিস্তারের অভিপ্রায়ে, কিংবা তাহা অব্যাহত রাখার জন্য একটি ক্ষুদ্র অথচ বলিষ্ঠ সঙ্ঘ গড়িয়াছেন। কিন্তু ওইরূপ ধারণা ঠিক নহে। বস্তুতঃ পক্ষে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একমত হইয়া কাজ করিতে করিতে আপনা হইতেই ওই দলটা গড়িয়া উঠিয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমনের কিছুকাল পরে বাংলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল,—একটি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সমর্থক এবং অন্যটি সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক। সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) 'বিগ্‌ ফাইভ্‌'-এরও সমর্থন পাইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলার দুইটি প্রধান বিপ্লবীদলের মধ্যে 'অনুশীলন' ছিল যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে এবং 'যুগান্তর' ছিল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। তবে ওই ভাবে পক্ষাবলম্বনের ব্যাপারে দুইটি দলের বিপ্লবীদের মধ্যে কতক

ব্যতিক্রমও ছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের দুইটি দলের (যতীন্দ্রমোহনের এবং সুভাষচন্দ্রের) মধ্যে ব্যতিক্রম-শ্রেণীর অর্থাৎ স্বাধীন মতের অনুগামী বিপ্লবীর সংখ্যা ছিল সামান্য। গান্ধীজীপন্থী দলের পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছিলেন দেশপ্রিয়। এই স্থলে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে,—রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে আদর্শ, মত বা পথের পরিবর্তনের দরুন, কিংবা অন্যান্য হেতুতে দলের ঐক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কয়েক বৎসর পরে বৃহৎ পক্ষের ঐকমত্য (unanimity) নষ্ট হওয়ায় নেতৃবর্গের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। এদিকে যতীন্দ্রমোহনের বন্দী থাকা অবস্থায় মৃত্যু হইবার কিছুকাল পরে বিপ্লবী দল দুইটির সদস্যগণের সংহতিও ভাঙ্গিয়া যায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে দুইটি দল থাকিলেও দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় দল সম্মিলিতভাবে কাজ করিত। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে ৪৩তম অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে দুই দলই মিলিত হইয়া কাজ করিয়াছিল। কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র; এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (জি. ও. সি.) নির্বাচন করা হইল সুভাষচন্দ্র বসুকে। কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন নলিনীরঞ্জন সরকার। উভয় দলের সম্মিলিত কার্য, ঐকান্তিকতা ও কর্মনিষ্ঠার ফলে কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইল। সফলতার প্রশংসা যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাপ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রায়ের, তাহা যতীন্দ্রমোহনও স্বাভাবিক উদারতাবশতঃ নিজেই প্রকাশ্যে বলিয়াছেন। কংগ্রেসের ন্যায় একটা শক্তিশালী সর্বভারতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনকে সুসম্পন্ন করিতে হইলে যে শ্রমশীলতা, ধৈর্য, কর্মনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি সংগঠনী ক্ষমতার প্রয়োজন, ওই সমুদয়ের কোনটিরই অভাব ছিল না ডাঃ রায়ের মধ্যে। দলাদলির সংকীর্ণ মনোভাব হইতে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া স্বাভাবিক ঔদার্যের সহিত তাঁহার উপর ন্যস্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উভয় দলের আন্তরিক সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হন নাই। কর্তব্য-কার্য বণ্টনের জন্য যে সকল কমিটি সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশমতে গঠিত হইয়াছিল, সেইগুলির সম্পাদক তিনি বাছাই করিলেন এমনভাবে যে, দুই দলই

তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। বাছাই করার কালে তিনি যোগ্যতা এবং সততার মাপকাঠি দিয়া সম্পাদকগণের গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনের এবং বিশেষ করিয়া শিল্প-প্রদর্শনীর জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়া গান্ধীজী অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিকূল মন্তব্য আমাদের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসের নেতা এবং কর্মীগণের মধ্যে তাঁহার যশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই বৎসরই তিনি সর্বপ্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসন পাইলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে। তদবধি ডাঃ রায় বহু বৎসর পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-রূপে ভারতের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছেন। বর্তমানেও তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আছেন।

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্'-এর পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করার জন্য একটি প্রভাবান্বিত দল দাবি জানাইল। সেই দলের পুরোভাগে ছিলেন—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শরৎ চন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি জননায়কগণ। জওহরলালজী ছিলেন সেই বৎসর কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী। এই দাবিকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের মধ্যে বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠিলে গান্ধীজী মধ্যস্থ হইয়া তাহা মিটাইয়া দেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল; কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যদি 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' প্রদান করে, তাহা হইলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবে। পূর্বোক্ত প্রস্তাবটির সারমর্ম এবং উত্থাপন ও গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গতকল্য বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে মহাত্মা গান্ধী পূর্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন—"সর্বদল সম্মেলনের কমিটির রিপোর্টে যে শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া কংগ্রেস উহাকে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে করিতেছেন; এবং ব্যবস্থাগুলিতে কার্যতঃ কমিটির সদস্যগণ সকলেই একমত হইয়াছেন দেখিয়া কমিটিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছে; এবং মান্দ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব অব্যাহত রাখিয়া রাজনৈতিক অগ্রগতি হিসাবে, বিশেষতঃ দেশের শক্তিশালী দলগুলি ইহাতে যথাসম্ভব একমত হইয়াছেন, এইজন্য কমিটির

রচিত শাসনতন্ত্রখানি অনুমোদন করিতেছে। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেন, তবে তৎকালীন অবস্থা সাপেক্ষে কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিবে; কিন্তু যদি ঐ তারিখের মধ্যে উহা গৃহীত না হয়, অথবা ঐ তারিখের পূর্বেই যদি ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট উহা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে দেশকে করপ্রদান বন্ধ করিতে বলিয়া এবং অন্যান্য কার্যের দ্বারা অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করিবে। এই প্রস্তাবানুসারে কংগ্রেসের নামে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতে কাহারও বাধা থাকিবে না।" "মহাত্মাজীর প্রস্তাব ১১৮-৪৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই বাংলার প্রতিনিধি।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯২৮ খ্রীঃ ২৯শে ডিসেম্বর)

পূর্বোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং শরৎচন্দ্র বসু বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া গান্ধীজী যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রারম্ভেই শ্রীজওহরলাল নেহেরুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল। তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী হইয়াও কেন তৎকালে সভায় আসেন নাই, গান্ধীজী তাহার কারণও বর্ণনা করেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেও প্রস্তাবটি অপরিবর্তিত ভাবেই গৃহীত হইল।

কংগ্রেসের সেই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ভারতের জনমতের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক ঘোষণায় প্রচার করেন যে, 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' ভারতীয় শাসন-সংস্কারের লক্ষ্য। সেই ঘোষণায় ইহাও প্রচারিত হইল যে,—সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ভারতের সমস্ত রাজনীতিক দলের সম্মতিতে ভারত-শাসন সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা হইবে; এবং সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য লণ্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হইবে। কিন্তু ইতোমধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের মতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। বড়লাটের ঘোষণার সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ঘোষণার সম্পূর্ণ সঙ্গতি ছিল না। কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রচারিত সদিচ্ছায় সন্দিহান হইল। কংগ্রেসের উপর সেই অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর) গৃহীত প্রস্তাবে। শ্রীজওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইল যে,—পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের কোন প্রয়োজন নাই।

লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই বাংলার কংগ্রেসীদের মধ্যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির (অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির) সদস্য নির্বাচন লইয়া সুভাষচন্দ্রের দল এবং সেনগুপ্তের দলের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। উভয় দলের পক্ষভুক্ত এবং সমর্থক সদস্যগণের অধিকাংশই লাহোরে গিয়াছিলেন। কিন্তু আপসে মিটমাট না হইলে সমস্ত সদস্য উল্লিখিত কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন না। ডাঃ রায় 'বিগ্ ফাইভ্'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সুভাষ বসুর দলের সমর্থক হইলেও দলাদলি পছন্দ করিতেন না। দলাদলি চলিতে থাকিলে যে রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হয়, তাহা অন্যান্য নেতার মতো তিনিও অবগত ছিলেন। তবে রাজনীতিক কাজে নামিলে একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে; কিন্তু দলভুক্ত হইলেই যে দলাদলিতে জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে, ইহা কাজের কথা নয়। ডাঃ রায় লাহোরে যাইয়া বাংলার কংগ্রেসীদের দলাদলি রফা করিতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাংলা কংগ্রেসের দলাদলি অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিগণেরও সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উভয় দলই বুঝিলেন যে, দলাদলি না মিটিলে বাংলার মর্যাদা তো নষ্ট হইবেই, পরন্তু আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। দুইটি বলিষ্ঠ রাজনীতিক দলের বিবদমান সহকর্মীগণের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া মিলন ঘটাইতে হইলে কতটা ধৈর্য, বুদ্ধি-বিবেচনা, কৌশল, আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন তাহা রাজনীতি-ক্ষেত্রের কর্মীমাত্রই জানেন। ডাঃ রায়ের ওই সমুদয় গুণের অভাব ছিল না। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে কিভাবে যে গৃহবিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকার ২৯শে ডিসেম্বর (১৪ই পৌষ ১৩৩৬ সাল রবিবার) তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় ডবল কলম হেডিং-এ অর্থাৎ দুই স্তম্ভ ব্যাপী শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে শিরোনামা-সমেত সেই বিবরণ উদ্ধৃত হইল :—

"নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বাঙ্গলার কংগ্রেসী কলহ"

"ডাঃ বিধান রায়ের আপস প্রস্তাব"

"লাহোর অধিবেশনের জন্য সাময়িকভাবে গৃহীত"

"নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে দুই দলের যোগদান"

লাহোর ২৮শে ডিসেম্বর

"বেলা ২॥০ টার সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পুনরায়

বিষয় নির্বাচনী-সমিতির অধিবেশন হয়। সভার কার্য আরম্ভ করার পূর্বে সভাপতি অনিবার্য কারণে বিলম্ব হইবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন; এবং তৎপর তিনি বাংলার কংগ্রেসী কলহ সম্পর্কীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন, এই সম্পর্কে যে ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে, উহা কতকটা বিধি-বহির্ভূত, কিন্তু সংশোধনের অসুবিধা অনেক বেশী। সভা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারেন। তিনি অতঃপর সভাকে সুপারিশ করেন যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে আপস প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন, উহা সভার গ্রহণ করা কর্তব্য।

"ডাঃ বিধান রায়ের প্রস্তাব

"ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি-সংখ্যা অতিক্রম না করিলেও বাংলার পুরাতন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণকে এবং নবনির্বাচিত সদস্যগণকে একযোগে বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে কাজ করিতে দেওয়া হউক। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি-সংখ্যা ৪৮, কিন্তু বর্তমানে লাহোরে নূতন এবং পুরাতন লইয়া মোট ৩৮ জন উপস্থিত আছেন। কাজেই এ বিষয়ে কোন বাধাবিপত্তি নাই। ডাঃ রায় বলেন যে, দুঃখের বিষয়, বাংলার কংগ্রেসী নির্বাচন লইয়া কিছু মতানৈক্য ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে দুইটি বিধিসম্মত বিবেচনা করিতে হইবে; একটি বিষয় হইল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুরাতন সদস্যগণকে কাজ করিবার অধিকার দান, অপর বিষয় হইল বাংলার নব-নির্বাচিত সদস্যগণ। এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে সভাকে বিবেচনা করিতে হইবে। এই বাংলার কংগ্রেসী কলহ সম্বন্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, আমি আমার বাংলার সদস্যগণের এই সমস্যার একটা মীমাংসার জন্য অনুরোধ করি। আমরা ইহাও জানি যে, আমি যে সমাধানের উপায় নির্দেশ করিব, উহা কতকটা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক বিধি-বহির্ভূত যদি কিছু করিতেই হয় তাহা হইলে মূল প্রতিষ্ঠান দ্বারাই তাহা করা কর্তব্য। পণ্ডিত মতিলালের নির্দেশ অনুসারে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতিকে বাংলার পুরাতন প্রতিনিধিগণকে এবং নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে যোগদান করিবার অধিকার দিতে অনুরোধ করিতেছি। বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে বাংলার নির্দিষ্ট প্রতিনিধির সংখ্যা ৪৮, কিন্তু বর্তমানে লাহোরে বাংলার মাত্র ৩৮

জন নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির সভ্য আছেন, কাজেই এ বিষয়ে কোনই অসুবিধা হইবে না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কর্তৃক বাংলার এই কংগ্রেসী কলহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

"বিধি-বহির্ভূত প্রস্তাব

"পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাকে সম্বোধন করিয়া বলেন ডাঃ রায়ের প্রস্তাব বিধি-বহির্ভূত সত্য, কিন্তু ইচ্ছা করিলে বিধি-সম্মত করিয়া লইতে পারি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সকল ব্যাপারকে বিধি-সম্মত করিয়া মানিয়া লওয়া কর্তব্য।"

প্রস্তাবটি যথারীতি গৃহীত হইল।

পরের দিন বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে উত্তেজনা

পরবর্তী দিবস (২৯শে ডিসেম্বর) লাহোরের জাতীয়তাবাদী প্রভাতী সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার দলভুক্ত ২৭ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যের এক বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ায় পূর্ব দিনের গৃহীত আপস-প্রস্তাবটি নিষ্ফল হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। ওই বিবৃতি প্রকাশ করায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অপমান হইয়াছে এবং তাহা শিষ্টাচার-সম্মত হয় নাই ইত্যাদি অভিযোগ আনা হইল সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহার দলের স্বাক্ষরকারী ২৭ জন সদস্যের বিরুদ্ধে। সেই দিনের বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন উল্লিখিত বিবৃতির প্রতি। ইহা লইয়া তুমুল তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁহার নিজের পক্ষে এবং দলের স্বাক্ষরকারী সদস্যগণের পক্ষে কৈফিয়ত দিতে উঠিয়া বলেন :—

"গতপরশ্ব সভা ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর আমরা ঐ বিবৃতি দিয়াছি, কিন্তু গতকল্য প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, আজ প্রকাশিত হইয়াছে। বিলম্বে প্রকাশের জন্য আমরা দায়ী নহি। সংবাদপত্রের উহা না প্রকাশ করা উচিত ছিল।"

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার উহা প্রকাশের জন্য সুভাষচন্দ্রকে দুঃখ প্রকাশ করিতে বলিলে তিনি তাহা করেন। ইহা লইয়া কিছুক্ষণ বিতর্ক চলে। ডাঃ রায় ব্যাপারটি বুঝাইতে উঠিয়া বলেন—গতকল্য এই কলহ সম্পর্কে সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং সভা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, ঐ অপরাধের জন্য তিনিই দায়ী। ডাঃ রায় আরও বলেন—

আমি জানিতাম যে ২৮ জন সদস্য স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয়াছে; পরে তদন্ত করিয়া উহা জানিতে পারি যে, উহা গতকল্য প্রকাশিত হয় নাই। সেইজন্যই আমি সভায় উক্ত আপস-প্রস্তাব তুলিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় আজ উক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার অপরাপর বন্ধুগণের নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, এই কংগ্রেসী কলহ নিষ্পত্তির ভার পণ্ডিত মতিলালের হস্ত হইতে অপর কাহারও হাতে তুলিয়া দিবার অনুমাত্র ইচ্ছাও সুভাষবাবুর বা তাঁহার বন্ধুদের নাই। তাঁহারা এখনও চাহেন যে, পণ্ডিত মতিলাল কর্তৃক এই কলহের মীমাংসা হউক; যদি কোন পক্ষ পণ্ডিত মতিলালের বিচার মানিয়া না লয়, তখন সেই দল নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে আপীল করিতে পারে।"

উল্লিখিত বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সংকলিত হইয়াছে। তৎপরবর্তী দিবসও (৩০শে ডিসেম্বর) নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে ট্রিবিউন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি সম্পর্কে চার ঘণ্টার উর্ধ্বকাল আলোচনা চলে। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাহাতে যোগ দিয়া সভাপতির নিকট আবেদন জানান বিষয়টি যেন আর অগ্রসর না হয়, ওইখানেই উহার নিষ্পত্তি হউক। পরিশেষে ডাঃ রায়ের পরিশ্রম, চেষ্টা এবং আন্তরিকতার সুফল ফলিল। বিবৃতি প্রকাশের দরুন সুভাষচন্দ্র যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়াছিলেন, ডাঃ রায় তাঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন।

২৯শে তারিখের বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের যে বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকার পরের দিনের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, দুইটি স্তম্ভ জুড়িয়া উহার শিরোনামা ছিল এই :—

"সুভাষচন্দ্র বসুর অশিষ্ট আচরণ
"পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহরের অপমান
"বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে উত্তেজনা"

৩০শে তারিখের নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের বিবরণ পরবর্তী দিবসের সংখ্যায় বাহির হইল এই শিরোপা পরিয়া :—

"পণ্ডিত মতিলালের অপমানের জের
"ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সুভাষচন্দ্রের রেহাই
"নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তুমুল আলোচনা"

আনন্দবাজার পত্রিকা যে তৎকালে গান্ধীপন্থী ছিল, তাহা পূর্বেই

উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে সমর্থন করিয়া আসিয়াছে সুভাষচন্দ্রকে। এমন কি যখন তাঁহার দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার পরে, অবিলম্বে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করার প্রস্তাবে কংগ্রেস সম্মত হয় নাই এবং সেইজন্য তাঁহার সহিত কংগ্রেসের বিরোধ ঘটে, তখনও তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছেন। ওই পত্রিকার মতো প্রভাবশালী ও লোকপ্রিয় সংবাদপত্রের সমর্থন থাকায় সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক্'-এর বিরোধিতা যথেষ্ট জোরালো হইয়াছিল। এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সুভাষচন্দ্র কর্তৃক কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ ডাঃ রায় সমর্থন করেন নাই।

লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ২৬শে জানুআরি সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা-দিবস পালন করা হইল। সেই অনুষ্ঠানের জন্য রচিত স্বাধীনতার সংকল্প-বাণী ওই দিন জনসভায় পঠিত ও গৃহীত হইয়াছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনও ছিল অনুষ্ঠানের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে ২৬শে জানুআরি স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানের উপসভাপতি ললিতমোহন দাশগুপ্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতার সংকল্প-বাণী পাঠ করেন; কেননা সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু তিন দিন পূর্বে (২৩শে জানুআরি) রাজদ্রোহের মামলায় দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। স্বাধীনতা-দিবস পালন উপলক্ষে ভারতবর্ষের গ্রামে ও নগরে সর্বত্র অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। কংগ্রেসপন্থী লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার সংকল্প লইয়া প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

লবণ আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আশ্রমবাসী ৭৯ জন সত্যাগ্রহী সহ আহমদাবাদ সত্যাগ্রহ আশ্রম হইতে ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ করেন ১১ই মার্চ। সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল ভারত নব উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। গান্ধীজী পদব্রজে দুই শত মাইল দূরবর্তী ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়া ৬ই এপ্রিল বঙ্গীয় সত্যাগ্রহীবাহিনী সহযোগে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভঙ্গ করেন। যাঁহারা কারাবরণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে তিনি আহ্বান করিলেন লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে। সে আহ্বানে সাড়া দিতে লাগিলেন প্রতিদিন বহুসংখ্যক নরনারী। দেখিতে না দেখিতে আন্দোলন ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ঝটিকার বেগে। ৫ই মে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করিয়া বন্দী করা

হইল। প্রত্যেক প্রদেশে আন্দোলনের গতি রোধ করিবার জন্য ভারত-সরকারের নির্দেশমতে প্রাদেশিক সরকার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। দমন-নীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগেও দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের দুর্নিবার বেগ সরকার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২৩ শে জানুআরি বাংলাদেশের বারোজন নেতা ও কর্মী রাজদ্রোহের অভিযোগে আলিপুরের (চব্বিশ পরগনা জেলা) 'অপর জেলা শাসক' মিঃ কে. এল. মুখার্জি কর্তৃক এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং কর্মসচিব কিরণশঙ্কর রায়, বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত এবং কর্মসচিব পুরুষোত্তম রায় প্রভৃতি। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট রাজনীতিক বন্দী-মুক্তিদিবস পালন করা হইয়াছিল। তজ্জন্য রাজদ্রোহের মামলার সৃষ্টি হয়। রায়দানকালে আদালতে উর্মিলা দেবী, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রী জে. সি. গুপ্ত, বসন্তকুমার মজুমদার প্রভৃতি নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের পরে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি নেতাদের গ্রেফতার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। বাংলার আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপর। তিনি বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মীগণের সাহায্যে ও সহযোগিতায় সেই দুঃসাধ্য কর্তব্য দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন চলিতে থাকাকালে। ডাঃ রায় ওই সকল অধিবেশনে যোগদান করেন। আন্দোলন দমনের অভিসন্ধিতে ভারতসরকার তৎকালে যে প্রেস অর্ডিনান্স্ জারী করিয়াছিল, তাহা সভ্যতার উপর জুলুম বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাবে নিন্দা করে এবং যে সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সেই অর্ডিনান্সের বিধান মানিয়া চলিতে সম্মত হয় নাই, তাহাদের মর্যাদা-বোধ ও সৎসাহসের প্রশংসা করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে কমিটি ট্যাক্স বন্ধের অভিযান আরম্ভ করার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিল। ওয়ার্কিং কমিটির পূর্বোক্ত অধিবেশন হইয়াছিল এলাহাবাদে মে মাসে।

পরের মাসে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সামরিক বিভাগে এবং পুলিস বিভাগে যে সকল ভারতীয় নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হয় যে,—উভয় বিভাগের ভারতীয়গণের স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য অন্যান্য ভারতীয়গণের মতো চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য, এবং নিরস্ত্র ও নিরুপদ্রব জনগণের উপর নির্মম আক্রমণ তাঁহাদের কর্তব্যকার্যের অঙ্গীভূত নহে। আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে এপ্রিল মাসে পেশোয়ারে অহিংসা-পন্থী লাল-কোর্তা ('রেড্ শার্ট') পাঠান সত্যাগ্রহীদের সাঁজোয়া গাড়ী ('আর্মার্‌ড্ কার্‌স্') হইতে গুলি চালাইয়া ব্যাপকভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। পাঠান সত্যাগ্রহী দলের একজনও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পশ্চাতে সরিয়া যান নাই। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বীরের ন্যায় আত্মবলিদান করিলেন। সেই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক একটা স্পেশ্যাল কমিটি নিযুক্ত হয়। ওই হত্যাকাণ্ড নিতান্ত অন্যায়রূপে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কমিটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, ওয়ার্কিং কমিটি আগস্ট মাসে দিল্লী অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিল।

তৎকালে বিদেশী সরকারের নিগ্রহ-নীতি এমন ভাবেই অনুসৃত হইতেছিল যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কারাবরণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিয়াই কংগ্রেসের কায পরিচালনা করিতে হইত। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে গ্রেফতার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল; তাঁহার পরে কারাদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল সর্দার বল্লভভাই পেটেল এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের উপর। কংগ্রেসের বিধি অনুসারে সংগ্রাম চলিতে থাকাকালে পদাসীন সভাপতি কারাগমনের পূর্বে তৎপদে পরবর্তী সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের শূন্য পদে নূতন সদস্য মনোনীত করিয়া যাইতেন।

পণ্ডিত মতিলাল আগস্ট (১৯৩০খ্রীঃ) মাসে নাইনী জেলে কারাদণ্ড ভোগকালে গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার কাশির সঙ্গে রক্ত পড়িতেছিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারে যুক্তপ্রদেশের গবর্নমেণ্ট ডাঃ এম. এ. আন্সারি এবং ডাঃ বিধান রায়কে ওই জেলে যাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে অনুরোধ করেন। উভয়ে এলাহাবাদ হইতে নাইনী জেলে যাইয়া পণ্ডিতজীকে পরীক্ষা করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল

করিলেন। ডাঃ আন্সারি দিল্লী চলিয়া গেলেন। ডাঃ রায় লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ পাইলেন যে, সরকারী ডাক্তাররা পণ্ডিতজীকে পরদিন পরীক্ষা করিবেন। সেইজন্য তিনি এলাহাবাদে থাকিয়া যান এই ভাবিয়া যে আলোচনার্থ তাঁহার ডাক পড়িতে পারে।

ইহার পর ২৭শে আগস্ট নয়া দিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আন্সারির ভবনে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্য ডাঃ রায় তথায় গেলেন। সেই দিন অপরাহ্নে কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকা কালে মিসেস্ কমলা নেহরু এবং মিসেস্ হংস মেটা ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণকে পুলিস গ্রেফতার করিল :—ডাঃ এম. এ. আন্সারি (সভাপতি), মথুরাদাস ত্রিকমজী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ভিঠলভাই পেটেল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, দীপনারায়ণ সিং, চুনীচাঁদ, সর্দার মঙ্গল সিং, চৌধুরী আবদুল হক এবং রাজা রাও (সম্পাদক)। ওই দশ জন সদস্যকে স্থানীয় জেলে লইয়া যাওয়া হয়। কারাগারের সীমানার মধ্যে প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটাইয়া তাঁহাদের রাখা হইল। পর দিন (২৮শে আগস্ট) জেলের ভিতরেই জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাদের বিচার করেন। কংগ্রেসী নেতারা সত্যাগ্রহ-নীতির অনুসরণ করিয়া মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। বেআইনী জনতায় মিলিত হওয়ার অভিযোগে প্রত্যেকে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

[তারকা-চিহ্ন দুইটির মধ্যস্থিত বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকার ২৮শে ও ২৯শে আগস্টের সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ হইতে সংকলিত।]

ষোড়শ অধ্যায়

কারাগারে বিধানচন্দ্র

বেআইনী ঘোষিত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির পূর্বোল্লিখিত দশ জন সদস্যের কারাদণ্ডের পরে যে সকল কংগ্রেস-নেতা ডাঃ আন্‌সারি কর্তৃক সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ২৯শে আগস্টের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়। নিম্নে ওয়ার্কিং কমিটির নূতন সদস্যবর্গের নাম প্রদত্ত হইল:—(১) চৌধুরী খালেকুজ্জমান, লক্ষ্ণৌ, (সভাপতি), (২) পণ্ডিত হরকরণ নাথ মিশ্র, লক্ষ্ণৌ, (৩) কে. ভি. আর. স্বামী, রাজমহেন্দ্রী, (৪) এস. ভি. কৌজল্‌গী, বিজাপুর, (৫) এ. এম. খাওজা, এলাহাবাদ, (৬) ইসমাইল গজনবী, অমৃতসর, (৭) শরৎচন্দ্র বসু, কলিকাতা, (৮) এস. এ. ব্রেল্‌ভি, বোম্বে, (৯) অধ্যাপক আবদুল বারি, পাটনা, (১০) আসফ আলি, দিল্লী, (১১) আবদুল্লাহিল বাকী, দিনাজপুর, (১২) ভেল্‌জী. এল. নাপ্পু, বোম্বে, (কোষাধ্যক্ষ), (১৩) গোবিন্দকান্ত মালব্য, এলাহাবাদ।

দিনদশেক পরে ডাঃ বিধান রায় এবং দীপনারায়ণ সিংকে দিল্লী কারাগার হইতে স্থানান্তরিত করা হইল। পুলিসসাহেব দুই জনকে একখানি মোটরগাড়ীতে করিয়া জেল হইতে আনিয়া রেলস্টেশনে প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা গাড়ীতে উঠাইয়া দেন। দীপনারায়ণ সিংকে হাজারীবাগ রোড্‌ স্টেশনে যথাসময়ে নামিতে হইল। তথা হইতে তাঁহাকে লইয়া যায় হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেলে। ডাঃ রায় বর্ধমানে পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহার বড় দাদা শ্রীসুবোধ রায়কে। তিনি কোন সূত্রে পূর্বেই গোপনে খবর পাইয়াছিলেন যে, সেই দিন বিধানকে কলিকাতা আনা হইবে। উভয় ভ্রাতার মধ্যে কথাবার্তা হইল, সঙ্গীয় পুলিস কর্মচারী তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। হাওড়া স্টেশনে বিধানচন্দ্র গাড়ী হইতে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই মাল্য-ভূষিত হইয়া এবং পুষ্প-স্তবক উপহার পাইয়া অভিনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। তৎকালে সেই জেলে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর কানাই লাল গাঙ্গুলী, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। ডাঃ রায় জেলে আসিয়া কারাধ্যক্ষ মেজর পাটনীকে বলিলেন যে, তিনি বিনাশ্রম

কারাদণ্ডের কয়েদী হইলেও তাঁহার পক্ষে উপযোগী কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন, কোন কাজ না করিয়া তিনি বৃথা সময় কাটাইতে পারিবেন না। কারাধ্যক্ষ ১২০-টি শয্যা-সমন্বিত জেলে হাসপাতালের ভার লইবার জন্য ডাঃ রায়কে বলিলেন। যে কার্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল, তাহা সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীর উপযোগী। বিনাশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীকে সাধারণতঃ ওই কার্যের ভার দেওয়া হয় না। ডাঃ রায় সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি জানাইলেন। মেজর পাটনী তাঁহার নাম সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীর কর্ম-তালিকায় ভুক্ত করিয়া নিলেন। তবে অবস্থা বিবেচনায় আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি যে, উল্লিখিত ব্যবস্থা করার পূর্বে মেজর পাটনী কারা-বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া সম্মতি নিয়াছিলেন। ওই বিবরণ আমরা শুনিয়াছি ডাঃ রায়ের বড় দাদার কাছে। ডাঃ রায়ের কারাবাস কালে তিনি প্রতি রবিবারেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে জেলখানায় যাইতেন, কোন কোন দিন পরিবারের অন্যান্যেরাও সঙ্গে যাইতেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কয়েদীর মোট সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার, এবং তন্মধ্যে অর্ধেক রাজনীতিক নেতা ও কর্মী।

ডাঃ রায়ের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিয়া থাকেন। কয়েক মাস কারাবাসকালে তিনি পরাধীন ভারতের কারা-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইলেন। হাসপাতালের কার্য পরিচালনা উপলক্ষে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েদীর সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে ভালো করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসক-মণ্ডলীর প্রবর্তিত কারা-শাসন-ব্যবস্থায় দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের কিংবা মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধনের কোন চেষ্টা ডাঃ রায় দেখিতে পান নাই। সেই ব্যবস্থায় মানবতা-বোধের যে অভাব ছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর বিধান-মন্ত্রী-পরিষদের শাসনকালে পশ্চিম-বঙ্গে কারা-শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল কালোপযোগী সংস্কার সাধিত হইয়াছে, তাহাতে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায়ের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ দানও যে রহিয়াছে, তাহা বলিলে ভুল হইবে না। কারাগারে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য আরম্ভ হইত ভোর পাঁচটার সময়। তখন তিনি জনকয়েক কারাবাসী সহকর্মী সহ কারাগারের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রতিদিন এইভাবে তিনি এক মাইল হাঁটিতেন। হাসপাতালের কার্য তিনি এরূপ নিষ্ঠা ও

দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, রোগীদিগের মৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় কমিয়া গেল। ডাঃ রায় টাইফয়েড নিমুনিয়া ইত্যাদি কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনমতে নিজের চেষ্টায় বাহির হইতে ঔষধাদি আনাইয়া নিতেন। কেননা জেলখানায় প্রয়োজনীয় ঔষধাদি পাওয়া যাইত না। ডাঃ রায় ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাঁহার বড় দাদা শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়কে দিতেন; তিনি নিজে টাকা দিয়া বাহির হইতে ঔষধাদি খরিদ করিয়া কারাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতেন। কারা-কর্তৃপক্ষ ডাঃ রায়ের কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কারাধ্যক্ষের সুপারিস মতে গবর্নমেণ্ট তাঁহার প্রশংসনীয় কার্যের জন্য কারাদণ্ডকালের ছয় সপ্তাহ মকুফ করিয়া দেন।

কারাবাসী সহকর্মীগণের মধ্যে ডক্টর কানাই লাল গাঙ্গুলী জার্মান ভাষা ভালো জানিতেন। তিনি বহু বৎসর জার্মানীতে ছিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় তিনি ডক্টরেট প্রাপ্ত হন। ডক্টর গাঙ্গুলী বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রেও সুপরিচিত। প্রথম যৌবনে রাজনীতিক কর্মজীবনে তাঁহার যাত্রা আরম্ভ হয় বৈপ্লবিক সাধনার দুর্গম সংকটসংকুল পথ ধরিয়া। তিনি বরিশাল শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বিপ্লবীদলে ছিলেন। কারাবাস-কালে ডাঃ রায় নিয়মিতভাবে জার্মানভাষা শিখিতে লাগিলেন ডক্টর গাঙ্গুলীর নিকট। চরিতকারের অনুরোধে তাঁহার বৈপ্লবিক জীবনের সহযাত্রী ডক্টর গাঙ্গুলী বিধানচন্দ্রের কারাবাস সম্পর্কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
"স্মৃতি-লেখা

"১৯৩০ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী চালিত লবণ-সত্যাগ্রহ আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে বিপুল আলোড়ন এনেছিল, তখন বাঙলার প্রায় সকল খ্যাতনামা নেতাই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ঐ জেলের স্পেশাল ইয়ার্ডে এক একটি কুঠরিতে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি সকলেই থাকতেন। আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল এইরকম একটা কুঠরিতে স্থান পাবার। ডাঃ জে. এম. দাসগুপ্ত থাকতেন হাসপাতালে, আর খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশ দাশ-গুপ্ত থাকতেন ভিন্ন স্থানে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ থাকতেন দমদম জেলে। স্পেশাল ইয়ার্ডে নেতাজী ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্র

মোহনের কুঠরি দুটি ছিল পাশাপাশি। আমরা সকলে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এই দুটি কামরার সামনের বারান্দায় সমবেত হতাম, আর কত আলোচনাই না হত!

"হঠাৎ একদিন স্পেশাল ইয়ার্ডে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই আকস্মিক ঘটনা আমাদের সকলকেই বিস্মিত করলে, কারণ আমরা ভাবতেই পারি নি যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও সত্যাগ্রহ করবেন। কেউ তাঁর কাছ থেকে এটা প্রত্যাশাও করে নি। কিন্তু পরে শুনলুম, তিনি ঠিক সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন নি। সেই সময়ে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হয়েছিলেন। এই কমিটির এক অধিবেশন দিল্লীতে আহূত হয়, তিনি সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ইংরাজ সরকার অধিবেশনে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করে। বিচারে ডাঃ রায়ের ছয় মাসের বিনাশ্রমের কারাদণ্ড হয়। তারপরই তাঁকে দিল্লী থেকে কলিকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়।

"ডাঃ রায় জেলে এসে প্রথমেই তাঁর কুঠরিটিকে নানা আসবাবপত্রে ভরে ফেললেন। ভাল খাট, ধপধপে বিছানা, মশারি, চেয়ার, টেবিল, সুন্দর সুন্দর পরদা ইত্যাদির দ্বারা ঘরটা নিমেষে সুসজ্জিত হয়ে গেল। চিকিৎসা-জগতে তাঁর তখন শ্রেষ্ঠ খ্যাতি। তখন ডাক্তার নীলরতন সরকার জীবিত ছিলেন, তবু ডাঃ রায় তখন ভারতবর্ষের চিকিৎসকমহলে প্রথম স্থান না হ'ক, দ্বিতীয় স্থান তো নিশ্চয়ই অধিকার করতেন। আর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অজ্ঞাত, অখ্যাত ইংরাজ সরকারের চাকুরে, একজন নামমাত্র ডাক্তার। তিনি তো তাঁর বন্দী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একরকম অধীনতা স্বীকার করে কৃতার্থ হলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

"অল্পকালের মধ্যেই প্রায় দেখা যেত, স্টেথিস্কোপ কাঁধে ছয় ফুটেরও উচ্চ দীর্ঘ-বপু ডাঃ রায় জেল-কম্পাউণ্ডে এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন, আর তাঁর পেছনে পেছনে চলেছেন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর পাটনী। মনে হ'ত, জেলের সকল ব্যবস্থা ডাঃ রায় করতে আরম্ভ করে দিলেন। এমন কি দেখেছি, ৺ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রায়ই জেলে আসতেন— ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে বা অন্য কোন কাজে। শুধু একটি বিশেষত্ব দেখলুম, কোন রাজনৈতিক আলোচনায় ডাঃ রায় কখনো যোগ দিতেন না।

"নিত্য ভোরে দেখতাম, ডাঃ রায় ও তাঁর পেছনে পেছনে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী স্পেশাল ইয়ার্ডের সামনে প্রাচীর-ঘেরা মাঠটুকুর মধ্যে

দীর্ঘকাল ধ'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অর্থাৎ জেলের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে যতটুকু সম্ভব প্রাতর্ভ্রমণ ক'রে স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা করছেন। আমিও কখনো কখনো এই প্রাতর্ভ্রমণে যোগ দিতুম। সমস্ত ক্ষণই নানা রকমের আলোচনা হ'ত, কিন্তু একটা বিশেষত্ব এইটুকু দেখতুম, যে তিনি রাজনৈতিক আলোচনা করতেন তো নাই, এমন কি কোন রাজনৈতিক নেতারও আলোচনা করতেন না। তাঁর আর একটা বিশেষত্ব এইটুকু দেখেছিলুম, তিনি আলস্যে কখনো সময় নষ্ট করতেন না।

"যেদিন জেলে এলেন, সেইদিনই আমাকে ডেকে বললেন, "আপনার কাছে আমি কিন্তু রোজ দুপুরে খাওয়ার পর এক ঘণ্টা জার্মান শিখব।" বলাই বাহুল্য, আমি আনন্দের সঙ্গে রাজী হলুম। ডাঃ রায় প্রায় ছয় মাস জেলে ছিলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, এই ছয় মাসের মধ্যে একদিনও তাঁর জার্মান শেখা বন্ধ থাকে নি। এই ছয় মাসে তিনি জার্মান ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এটা নিশ্চয় কৃতিত্বের কথা।

ডাঃ রায়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্যে আমাদের সকলেরই তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। জেলের আবহাওয়ায় আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু অসুস্থতা হ'ত, ডাঃ রায়ের উপস্থিতি ও সহৃদয় চিকিৎসা আমাদের নিরাময় করতো ও পরম সান্ত্বনা দিত। সর্বশেষে বলতে বাধ্য হলুম, ডাঃ রায়ের রাজনৈতিকক্ষেত্রে আসা চিকিৎসা-শাস্ত্রের পক্ষে ক্ষতি হয়েছে। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত।"

এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ডাঃ রায়কে কারা-কর্তৃপক্ষ আপনা হইতেই কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দিয়াছিলেন। তিনি নিজের শয্যা-দ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিতেন। দুই বেলায়ই তাঁহার আহার্য বাড়ী হইতে পাঠানো হইত। সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঘরের দরজা তালা-চাবি দিয়া বন্ধ করা হইত না। দেখা-সাক্ষাতের জন্য রবিবার নির্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনার্থীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয় নাই।

ডাঃ রায়ের সহকারাবাসীগণের মধ্যে বর্ধমানের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও গান্ধীপন্থী নির্যাতিত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যের নাম ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। জীবনী-লেখকের অনুরোধে তিনি ডাঃ রায়ের কারাবাস-কালের যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"কারাবাসে ডাঃ রায়"

"১৯৩০ সালের নভেম্বর মাস। দমদম জেল থেকে আলিপুর জেলে এলাম।

কয়েক মাসের অত্যধিক পরিশ্রমে বড্ড ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। জেলখানায় এসেই শরীরটা ভেঙ্গে পড়ল। বাইরে কাজের মধ্যে থাকলে হয়তো ঠিকই থাকতাম। ভিতরে এসেই বিপদ হল, শরীর আর চলতে চাইল না। এমনই হয়। পথ যতই শেষ হয়ে আসে ক্লান্তি ততই বাড়তে থাকে। বাড়ীর দুয়ারে এসে আর পা উঠতে চায় না।

বর্ধমানে কটা দিন এক রকম কাটল। এক গাদা ছেলে এসে জেল ভর্তি করে ফেলেছে। দমদমে স্পেশাল জেল হয়েছে। বড়রা যাঁরা ছিলেন তাঁদের সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছোটগুলি রয়ে গেছে। তাদের নিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশ একটু মুশকিলে পড়েছেন। একসঙ্গে এত লোকের ব্যবস্থা করবার মত তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। নানারকম অসুবিধা হচ্ছে। ছেলেরা নিজেরা সে অসুবিধা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। জেলখানায় সবাই নূতন। কেমন করে কি করতে হবে কারও ধারণা নাই। পদে পদে গোলমাল বাধছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বটে, নিজেদের মধ্যেও বটে। এই গোলমাল মিটিয়ে শৃঙ্খলা বিধান করতে বেশ কয়েক দিন লাগল। এইসব চুকিয়ে একটু হাঁফ ছাড়বার মত অবস্থা হতেই বদলির আদেশ এল। দমদমে আর একটা জেল খোলা হয়েছে—দমদম এডিশনাল স্পেশাল জেল। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য।

সরকার বাহাদুর দয়া করেছিলেন। বর্ধমান সদরে এস. ডি. ও. ছিলেন শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ; রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের ছেলে। তাঁর শ্রেণীবিচার ছিল না। তিনি ছোট বড় সকলের জন্য এক ব্যবস্থাই করতেন। নির্বিচারে তৃতীয় শ্রেণী। এতে একটা সুবিধা হয়েছিল। বড়রা ছোটদের সঙ্গে থাকতে পেরেছিলেন। ছোটদের আরও শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। বাইরে কয়েক দিনের শিবির-জীবনে কতটুকুই বা শেখাতে পারা গেছে? জেলের ভিতরে একসঙ্গে থাকবার জন্য বড়রা তাদের ভাল করে শেখাবার সুযোগ পেলেন। এই শিক্ষা আমাদের কর্মীদের ভবিষ্যৎ জীবনে খুব কাজে লেগেছে।

কাজের সুবিধা ছাড়াও এর ফলে আর একটা সুবিধা হয়। রাজনৈতিক কয়েদীদের সাধারণ কয়েদীদের মত করে রাখবার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছিল। সরকার নিয়ম করলেন, শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে কয়েদীদের

শ্রেণী-বিভাগ করা হবে। এ নিয়ম শুধু রাজনৈতিক কয়েদীর জন্য নয়; সকল কয়েদীর জন্যই। রাজনৈতিক কয়েদীদের আলাদা করে দেখতে তাঁরা রাজী ছিলেন না। সরকারের এই নিয়মের ফলে যাঁরা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন, তাঁরা কেউ প্রথম, কেউ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলে গণ্য হলেন। আর সব তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীর দলে রয়ে গেল।

আমাদের অনেকেরই এটা ভাল লাগেনি। এক সঙ্গে কাজ করলাম, একই অপরাধ, একই শাস্তি। কিছু বেশী লেখাপড়া শিখেছে বা বাবার কিছু টাকা আছে বলেই একজন বেশী সুখ-সুবিধা পাবে, আর একজন তা নয় বলে বঞ্চিত হবে; এটা বড়ই বিসদৃশ বলে মনে হত। কেবলই মনে হত, বেরিয়ে এসে আবার মুখোমুখি দাঁড়াব কেমন করে? বর্ধমানের সরকার আমাদের এই লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ছোট বড় সকলে মিলে একসঙ্গে সমানে কষ্ট ভোগ করব, এর মধ্যে একটা আনন্দও ছিল।

জ্বর গায়েই বর্ধমান থেকে দমদমে এলাম। এসে তো চক্ষুস্থির! বর্ধমান জেলে যদি বা কোন ব্যবস্থা ছিল, এখানে কিছুই নাই। একটা ফাঁকা মাঠে তারের বেড়ার মধ্যে খানদুই পুরানো পাকা বাড়ি আর কয়েকখানা চালা ঘর, দর্মার বেড়া, খড়ের চাল। তারই মধ্যে বাংলা দেশের চারদিক থেকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের এনে গাদাবন্দী করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, এমন কি অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলেও যে ব্যবস্থার জেলখানায় কোন দিন অভাব হয় না, সেই পাহারার ব্যবস্থাও নাই। অল্প কয়েক দিন হল জেল খোলা হয়েছে, কোন ব্যবস্থাই তখনও হয়ে ওঠে নি। এই অবস্থায় যা হয় তাই হল। শরীরটা ক্রমেই বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ল। জ্বর এবং তার সঙ্গে কঠিন রক্তামাশয়। অতুল্যর সঙ্গে হুগলীর একটা দল তার কয়েক দিন আগে এসেছে। এই অবস্থার মধ্যে যতটুকু ব্যবস্থা করা সম্ভব তারা করতে চেষ্টা করল। তা সত্ত্বেও অসুখ ক্রমেই বাড়তে লাগল। আমাশয় একটু কমতে না কমতেই সাইনোভাইটিস দেখা দিল। আর বিছানা থেকে উঠবার সামর্থ্য রহিল না। ওজনে ১১৬ পাউণ্ড থেকে ৭২ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুবান্ধবেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

প্রেসিডেন্সি জেল-হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার কথা বললেন জেল-কর্তৃপক্ষ। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা তখন ঐ খানেই করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে পাঠানো বন্ধুদের ইচ্ছা নয়। তাঁরা চান আলিপুরে পাঠাতে। সেখানে হাসপাতালের ব্যবস্থাও ভাল। তা

ছাড়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখন সেখানে আছেন। জেল-হাসপাতালের চিকিৎসার ভার তাঁরই উপর। আলিপুরের হাসপাতাল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য। জেল-কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছুতেই সেখানে পাঠাতে রাজী নন।

পাশেই দমদম স্পেশাল জেল। অসুখের খবর সেখানে গিয়ে পৌছেছে। যতীন্দ্রমোহন রায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বড়দের অনেকেই তখন সেখানে। অসুখের খবর পেয়ে তাঁরা সবাই খুব চিন্তিত হয়েছেন। তাঁরাও চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে আমাকে আলিপুরে পাঠানো হয়। অনেক চেষ্টার পর কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন।

বৈকাল বেলায় আলিপুরে এসে পৌছলাম। আসবার কথা বন্ধুরা আগেই শুনেছিলেন। আসার খবর পেয়ে সকলেই এসে পড়লেন। প্রথমেই এলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি তখন হাসপাতালেই আছেন। এপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য কারমাইকেল হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সদ্য সেখান থেকে ফিরেছেন। একটু পরেই সম্ভবতঃ খবর পেয়েই, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এসে পৌছলেন।

বিধানবাবুকে তার আগে কোন দিন দেখি নি। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর অসামান্য খ্যাতির কথা বাংলা দেশের আর সকলের মত আমিও শুনেছি। আলিপুর জেলে যেতে পারলে তাঁর কাছে থাকতে পারব এবং তাঁর চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি সেরে উঠব, এই মনে করেই আলিপুরে এসেছি। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে দেখতে পেয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল। প্রথমেই চোখে পড়ল তাঁর চেহারা। মূর্তিমান স্বাস্থ্য। এমন না হলে চিকিৎসক! দেখলেই রোগী উৎসাহিত হয়ে ওঠে, তার অর্ধেক রোগ সেরে যায়। ছেলেবেলায় রাজসাহী কলেজে পড়তাম। আমাদের হোস্টেলে চিকিৎসা করতেন এসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তাঁরও চেহারা এমনই ছিল। তিনি তখন আসতেন তাঁর পায়ের শব্দ পেয়েই মনে হত সেরে গেছি। বিধানবাবুকে দেখে আমার উপেনবাবুকে মনে পড়ে গেল।

বিধানবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসলেন। মিনিট কয়েক চেয়ে দেখলেন এবং তারপর অসুখের বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। পরীক্ষাও করলেন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। একটু যেন চিন্তিত হয়েছেন মনে হল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুখখানা আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল। হেসে বললেন, "কিছু না; সেরে যাবে।" মনে হল এর মধ্যে অসুখেরই

সব কিছু দেখে বুঝে ফেলেছেন, এখন নির্দিষ্ট পথে পর পর চিকিৎসা করে গেলেই চলবে। এর পরেও তাঁর মধ্যে এই জিনিসটি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। তখন বিভিন্ন জেল থেকে আলিপুর হাসপাতালে অনেক দুরারোগ্য রোগী আসত। বোধ হয় ডাঃ রায় আছেন বলেই তাদের আলিপুরে পাঠানো হত। রোগী এলেই ডাঃ রায়ের কাছে খবর যেত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হতেন। কয়েক মিনিট স্থির হয়ে রোগীর দিকে চেয়ে থাকতেন এবং তার পর ধীরে ধীরে রোগীকে পরীক্ষা করতেন। দুয়েক মিনিট চুপ করে থেকে হাসিমুখে কর্তব্য নির্দেশ করতেন। এই স্বল্প সময়-টুকুর মধ্যেই কেমন করে জানি না, তিনি যেন রোগের গতি-প্রকৃতি সব ধরে ফেলতেন। তারপর এ সম্বন্ধে আর কোন দিন তাঁকে চিন্তা করতে হত না। বর্ধমান কলেজে আমাদের একজন অধ্যাপক ছিলেন। কোন ছেলের দিকে চাইলে এক-দৃষ্টিতে তার ভিতর পর্যন্ত যেন দেখতে পেতেন। কেউ কোন প্রশ্ন করতে উঠলে তার একটা কথা শুনেই তিনি সব বুঝে নিতেন। ছেলেদের অসুবিধা বুঝবার তাঁর একটা সহজাত শক্তি ছিল। চিকিৎসার বিষয়ে বিধানবাবুর সম্বন্ধে আমার এই কথাই মনে হয়েছে।

আমার বেড্‌টা ছিল ঘরের একেবারে শেষে। প্রতিদিন রোগী দেখবার সময় সকলের শেষে আমার কাছে আসতেন। হাসপাতালে তখন নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ছিল না। ওয়ার্ড থেকে সকলেই সকল সময় হাসপাতালে আসতে পারত। তাই সকাল হলেই বন্ধুবান্ধবেরা হাজির হতেন। প্রফুল্ল সেনের তো কথাই ছিল না। তিনি হাসপাতালে ছিলেন, দিবারাত্রিই কাছে থাকতেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও সবকিছু নিজের হাতে করতেন। অন্যান্য বন্ধুদেরও বিরাম ছিল না। সারা দিন একজন না একজন আছেনই। বেশী ভিড়টা হত সকালে বিকালে। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তী, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল গাঙ্গুলী এবং আরও অনেকে আসতেন। রোগী দেখা শেষ করে বিধানবাবু যখন আসতেন, এক একদিন তিনিও তারই মধ্যে বসে যেতেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকমের গল্পগুজব হত।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। তখন আমি অনেকটা ভাল হয়েছি, আমার জন্য বন্ধুদের চিন্তাও অনেকটা কমেছে। সুতরাং আড্ডাটার জোরও বেড়েছে। আলোচনার শেষ ছিল না। তার বিষয়ও বিচিত্র। স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতলের এমন জিনিস ছিল না, যা নিয়ে আমরা আলোচনা না

করতাম। যেদিন যা নিয়েই আলোচ্য হক না কেন, বিধানবাবু তাতে যোগ দিতেন এবং তার প্রত্যেকটি কথায় মধ্যেই গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত। দেখে শুনে মনে হয়েছে তিনি শুধু চিকিৎসা-শাস্ত্রেই পণ্ডিত নন, আরও অনেক শাস্ত্রেই তাঁর চিকিৎসা-শাস্ত্রের মত গভীর পাণ্ডিত্য আছে।

আর একটা জিনিস যা চোখে পড়েছে তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি। একদিনকার কথা মনে আছে। আলিপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন মেজর পাট্‌নী আই. এম. এস., তিনি হাসপাতালের কিছু দেখতেন না। সব ভারই ছিল ডাঃ রায়ের উপর। স্বদেশী অ-স্বদেশী সব রোগীকেই তিনি দেখতেন। তখন সব নিয়ে ১১০ জন রোগী ছিল হাসপাতালে। সকালবেলায় রোগী দেখার সময়ে হাসপাতালের ডাক্তার ডাঃ রায়ের সঙ্গে থাকতেন। সেদিন রোগী দেখা শেষ করে ডাঃ রায় আমার বেড্‌এর কাছে বসেছেন। এমন সময় হাসপাতালের ডাক্তার বঙ্কিমবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার! না, সেদিন তাঁর হাসপাতালে আসতে দেরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ডাঃ রায় এসে গেছেন। বঙ্কিমবাবুকে না দেখে ডাঃ রায় একাই রোগী দেখতে আরম্ভ করলেন এবং এক এক করে সব রোগীকেই দেখে শেষ করেছেন। বঙ্কিমবাবু অপরাধীর মত মুখ নীচু করে বললেন, তাঁর আসতে দেরি হয়েছে। ডাঃ রায় বললেন তাঁর জন্য কিছু অসুবিধা হয় নাই। তিনি রোগীদের টিকিটগুলি আনতে বললেন। টিকিট আনা হলে ডাঃ রায় একে একে ১ থেকে ১১০ পর্যন্ত সমস্ত রোগীর কার কি ওষুধ এবং পথ্য হবে সব বলে গেলেন।

মানুষটিকে আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আর এত বড় মানুষ! তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অনেকবার মনে হয়েছে, তিনি থাকতে থাকতে যদি হাসপাতাল থেকে বেরুতে পারতাম, তাহলে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারতাম। তাঁকে আরও ভাল করে দেখারও সুযোগ হত। কিন্তু তা আর হল না। আমি হাসপাতাল থেকে বেরোবার আগেই তিনি জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক মনে নাই। বোধ হয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অসুস্থ হয়ে কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ডাঃ রায়কে দিয়া চিকিৎসা করাবেন। সেইজন্য সরকার তাঁর জেলের মেয়াদ শেষ হবার আগেই তাঁকে ছেড়ে দেন।

হাসপাতালের বাইরে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কাছে ডাঃ রায়ের কথা শুনতাম। খুব সকালে উঠতেন এবং দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে

আসতেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে নিজের হাতে পায়খানা ধুতেন। নিমের কাঠি দিয়ে দাঁতন করতেন, টুথব্রাশ টুথপেষ্ট ব্যবহার করতেন না। খানিকক্ষণ খুব জোরে জোরে হাঁটতেন এবং তারপর পড়তে বসতেন। পড়তেনও খুব জোরে জোরে। কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতাই এই সময়টায় তিনি সাধারণতঃ পড়তেন। ইতিমধ্যে হাসপাতালে যাবার সময় হত। হাসপাতালে রোগী দেখা ছাড়াও আরও কাজ ছিল। আন্দোলনের টানে অনেক ছোট ছোট ছেলে জেলে এসে গিয়েছিল। তাদের অসুখ করলেই বিপদ। না খাওয়ানো যায় ওষুধ ও না দেওয়া যায় পছন্দমত পথ্য। ডাঃ রায়ের অনেকখানি সময় যেত তাদের পিছনে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওষুধ খাওয়াতে হত। হাসপাতালের রান্না খাবার তারা খেতে পারে না। ডাঃ রায়ের বাড়ি থেকে যে খাবার আসে তা থেকে তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে তেল মেখে স্নান করতেন। সাবান তিনি কমই মাখতেন। জেলখানার খাবার তিনি খেতেন না। তিনি প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের বাইরে থেকে খাবার আনার অধিকার ছিল। তাঁরও বাড়ি থেকে খাবার আসত। সাহেবী খানা নয়, খাঁটি বাঙ্গালী খাবার—ভাত, ডাল, সুক্ত, মাছের ঝোল। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে আবার পড়তে বসতেন। এই সময়টায় তিনি ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলীর কাছে জার্মান পড়তেন। কানাইবাবুর কাছে শুনেছি তার পড়ার উৎসাহে ইস্কুলের ছেলেরাও হার মেনে যেত। বৈকালবেলায় আবার একবার হাসপাতালে আসতেন। জেলখানায় সব দলের লোকই আছে। জেলের ভিতরে আর কোন কাজ নাই। তাই স্বাভাবিকভাবেই দলাদলিটা বেশি হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে নবাগতদের মধ্যে থেকে সকলেই লোক সংগ্রহের চেষ্টা করে। এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে খানিকটা রেষারিষিও হয়। আলিপুরেও হোত। ডাঃ রায় এ-সকলের মধ্যে যেতেন না। পড়াশোনা এবং চিকিৎসা, এই নিয়েই তাঁর সময় কাটত।

"ডাঃ রায়ের কারাবাস প্রসঙ্গে"

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের তৎকালীন সিনিয়র ডেপুটি জেলার সিউড়ী (বীরভূম) নিবাসী রায়সাহেব শ্রীঅনিলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথিত বিবরণ তথাকার যশস্বী চিকিৎসক ডাঃ শ্রীকালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম. বি. লিখিয়া নিয়াছেন এবং গ্রন্থকারকে গত ১১।১।৫৭ ইং তারিখ পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখানে তাহা প্রকাশিত হইল :—

…"ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্পেশাল ইয়ার্ডে রাখা হয়। এইটি একটি দোতলা ইউরোপীয়ান ব্লক। এই স্থানে নেতাজী সুভাষ, স্বর্গীয় জে. এম. সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভারত-বিখ্যাত নেতারা অবস্থান করিতেন। ডাক্তার রায়কে জেল-হাসপাতালে কয়েদী রোগীদের দেখিবার ভার দেওয়া হয়; কেননা তিনি ভারত-বিখ্যাত ডাক্তার। তদানীন্তন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। আমি সেই সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সিনিয়র ডেপুটি জেলার ছিলাম এবং জেলের ভিতরের চার্জে ছিলাম। সমস্ত পলিটিক্যাল প্রিজনারদিগকে আমাকে দেখিতে হইত। ডাক্তার রায়ের খাবার তাঁহার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ী হইতে আসিত। এই খাবারের নমুনা ডেপুটী জেলার টেস্ট করিতেন। একদিন রাত্রে তাঁহার খাবার জেল আফিসে আসার পর উক্ত ডেপুটী জেলার খাবার টেস্ট করিতে করিতে সমস্ত খাবার খাইয়া ফেলেন এবং আমাকে খবর দেন। আমি আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া ডাক্তার রায়ের নিকট স্পেশাল ইয়ার্ডে গিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলি। তিনি বলিলেন—আমাকে বললে ডেপুটী জেলারের জন্য আলাদা খাবার আনিয়ে দিতাম। আমি তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার খাবারের জন্য ফোন করি, এবং জানাই যে যত রাত্রিই হউক, আমি খাবার লইবার জন্য জেল-আফিসে উপস্থিত থাকিব। কারণ রাত্রি সাড়ে ৯টার পর কোন খাবার লইবার আদেশ ছিল না। যাহা হউক রাত্রি সাড়ে দশটার সময় খাবার আসে, এবং আমি উহা লইয়া ডাক্তার রায়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিই। তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অবস্থানকালীন বহু মূল্যবান ঔষধ জেল-হাসপাতালে দান করেন। জেলের প্রত্যেক অফিসার তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি সকলের সহিত মধুর ব্যবহার করিতেন। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইয়া আমার স্ত্রীর চিকিৎসা তাঁহাকে দিয়া করাইয়াছিলাম। একটি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র খুব দামী ছিল বলিয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি সেইটি আমি যাহাতে বিনামূল্যে পাই, তার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

"যদিও ডাক্তার রায়ের বিনা পরিশ্রমে ছয় মাসের কারাদণ্ড হইয়াছিল তথাপি তিনি জেলে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া জেলের আইন অনুযায়ী রেমিশন পাইতেন। জেল-আইনে একটি বিধান আছে যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন কয়েদীকে এক বৎসর কালের কিংবা উহার কতক কালের মধ্যে ত্রিশ দিন স্পেশাল রেমিশন দিতে পারেন। সেই বিধানটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকল জেল-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন। একমাত্র আমি বলিয়াছিলাম যে, ছয় মাসে ডাক্তার রায় ত্রিশ দিন স্পেশাল রেমিশন পাইতে পারেন। পরে এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের সহিত পত্রালাপ হইলে আমার মতটি সমর্থিত হয়। ডাক্তার রায় ত্রিশ দিন স্পেশাল রেমিশন পাইয়া যথাকালে জেলখানা হইতে মুক্তি পান।

"খালাস হওয়ার পর তিনি একটি বহুমূল্য ঘড়ি জেলে দান করিবার জন্য একদিন জেল-গেটে আসিয়া আমাকে খবর দেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলে আমাকে ঘড়িটি দানের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিতে বলেন; কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘড়িটি লইতে অরাজী হওয়ায় তিনি ঘড়িটি ফিরাইয়া লইয়া যান; আমি জানি না এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা এখন তাঁহার মনে আছে কিনা।"

সপ্তদশ অধ্যায়

বিধানের জীবনে গান্ধীজীর প্রভাব

নানা দিক দিয়াই গান্ধীজীর জীবন ও কার্যাবলীর মধ্যে অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার আদর্শ ও নীতি, মত ও পথ, আচার ও ব্যবহার এবং রচনা ও বাণী অভিনব এবং বিচিত্র! বর্তমান জগতে— স্বদেশে, বিদেশে, স্বজাতি ও পরজাতির নিকট তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। যুগের চাহিদা মতে বিভিন্ন ভাব এবং পন্থার গ্রহণ, বর্জন ও সংস্কার অর্থাৎ সমন্বয়-সাধন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে তাঁহার জীবন-দর্শনের অঙ্গীভূত করিয়া নিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব জীবন-বেদ রচিত হইয়াছে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের উৎকৃষ্ট বস্তুর মিলনে। সত্য এবং অহিংসা হইল সেই জীবন-দর্শন ও জীবন-বেদের শিরস্ত্রাণ। গান্ধীবাদের ইহাই মর্মার্থ।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানবের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য গান্ধীজীই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অহিংসাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই অমোঘ অস্ত্রের শক্তি ও সাফল্য আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে। ওই মহাস্ত্রের আবিষ্কারক ও প্রয়োগকর্তা মহানায়ক গান্ধীজী ভারতে মুক্তি-যুদ্ধের অগণিত যোদ্ধাকে প্রেরণা দিয়াছেন— ত্যাগ স্বীকার, দুঃখ-বরণ ও আত্মবলিদানে। বহু উচ্চশ্রেণীর নেতার জীবনেও তিনি বিস্ময়কর বিবর্তন ঘটাইয়াছেন! সেই নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথমেই আমাদের স্মরণে আসিবে—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও তদীয় পুত্র শ্রীজওহরলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীবাসন্তী দেবী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীনেলী সেনগুপ্তা, শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), ভিঠলভাই পেটেল ও সর্দার বল্লভভাই পেটেল, সরোজিনী নাইডু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ খান সাহেব ও খান আবদুল গফ্ফর খান (সীমান্ত গান্ধী), ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, মাওলানা মজহরল্ হক প্রভৃতির নাম। পূর্বোক্ত শ্রেণীর নেতৃবর্গের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার জীবনের উপরও গান্ধীজী যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর গুণগ্রাহী, অনুগামী, ও ভক্ত জনের তিনি অন্যতম। সেই মহনীয় অধিনায়কের অহিংসা-মহাস্ত্রের অমোঘতায় বিধানচন্দ্রের বিশ্বাস অবিচলিত। তাঁহার মনে এই ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অহিংসার পথেই ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। সেইজন্য স্বাধীনতার অভিযানে তিনি গান্ধীজীর পদানুবর্তন করিয়াই চলিয়াছেন, যদিও সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল গভীর। গান্ধীজীর প্রতি বিধানের যে কিরূপ ভক্তি, অনুরাগ ও বিশ্বাস আছে, তাহা তিনি নিজেই সবিশেষ অবগত ছিলেন। কঠোর অনশন-ব্রত পালন উপলক্ষে সেইজন্য বিধানকে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে হইত। বিধানের প্রতিভা, স্বদেশানুরাগ, সমাজ-হিতৈষণা ইত্যাদি গুণের জন্য গান্ধীজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাজের সেবা-কার্যের মধ্য দিয়া উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বর্তমান বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে ডাঃ রায় একদিন ঘটনাক্রমে কলিকাতায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাস-ভবনে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীকে (মিঃ গান্ধীকে) প্রথম দেখিতে পাইলেন। তখন ডাঃ রায় বাংলা সরকারের অধীনে সহ-চিকিৎসক (য়্যাসিস্টাণ্ট সার্জন) পদে নিযুক্ত থাকিয়া কলিকাতায় ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল এবং হাসপাতালে কাজ করিতেন। গান্ধীজীর মাহাত্ম্য তখনও আপামর জনসাধারণের নিকট পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় নাই বলিয়া তিনি 'মহাত্মা' নামে ব্যাপক ভাবে অভিহিত হইতেন না। ডাঃ রায় গান্ধীজীকে প্রথম দেখিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয় নাই। ইহার বৎসর-পাঁচেক পরে (১৯২০ খ্রীঃ) তিনি কলিকাতায় তাঁহার বর্তমান বাসভবনের (৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের) পূর্বদিকস্থ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীকে দেখিয়াছিলেন। সেই সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিবরণ একাদশ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। ওই অধিবেশনের পরে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনাবসান হইল দার্জিলিংয়ের শৈলাবাসে। মৃত্যুর পূর্বে তথায় রোগশয্যাশায়ী দেশবন্ধুকে দেখিতে যান এবং ছয় দিন (৪ঠা জুন হইতে ৯ই জুন) তাঁহার সহিত বাস করেন। তিনি সেখানে

হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় অবস্থানকালে দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন। ডাঃ রায় তখন কলিকাতায় ছিলেন না। তাঁহার শিলং-এর গিরি-নিবাসে বিশ্রামের জন্য গিয়াছিলেন। সেই দুঃসংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি কলিকাতায় রওনা হইয়া আসেন। মহাত্যাগী অবিস্মরণীয় লোক-নায়কের মৃতদেহ কলিকাতায় আনিয়া দাহ করা হইল। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন খ্রীষ্টান, পার্সী—নানা শ্রেণীর লক্ষাধিক শোক-সন্তপ্ত পৌরজন তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ডাঃ রায় সদ্য-শোকাতুরা বাসন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দেশবন্ধুর ভবানীপুরের বাড়ীতে (বর্তমানে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন') যান। সেই সময়ে গান্ধীজীও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। ডাঃ রায়কে দেখা মাত্রই বাসন্তী দেবীর শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যে, ডাঃ রায় যদি দার্জিলিং-এ তখন উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইত না। গান্ধীজী যদিও যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ্ ডাঃ বিধান রায়ের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু ইতঃপূর্বে উভয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয় নাই। বসন্তা দেবীর শোক-বেগ প্রশমিত হইলে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ডাঃ রায়কে পরিচিত করিয়া দিলেন। দেশবন্ধুর সম্পাদিত ইষ্টপত্র ('উইল') সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের সহিত গান্ধীজী আলোচনা করিলেন। কিরূপ পরিকল্পনায় দাতার প্রদত্ত সম্পত্তি তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজে লাগানো যাইতে পারে সেই বিষয়ে গান্ধীজী জানিতে চাহিলেন বিধানচন্দ্রের অভিমত। দেশবন্ধু বিধানের সম্মতি না লইয়াই তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে একজন ন্যাস-রক্ষক ('ট্রাস্টী') মনোনীত করিয়া গিয়াছেন। বিধানের উপর দেশবন্ধুর বিশ্বাস যে কতটা দৃঢ় ছিল, তাহার কতক প্রমাণ ইহাতে মিলিবে। ডাঃ রায় গান্ধীজীকে বলিলেন যে,—তাঁহার মতে এই বাস-ভবনে একটা হাসপাতাল স্থাপন এবং সেই সঙ্গে নারীদের পরিষেবা ('নার্সিং') শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, দেশবন্ধুর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হইতে পারে। গান্ধীজী সেই অভিমত সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাবিত আরোগ্যশালা এবং পরিষেবা শিক্ষায়তনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে হইলে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। গান্ধীজী তাহা বুঝিতে পারিয়া আরও কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন স্থির করিলেন। দেশবন্ধুর স্মৃতি-রক্ষার্থ দেশবাসী নরনারীর

নিকট তিনি আবেদন জানাইলেন মুক্ত-হস্তে অর্থাদি দানের জন্য। অর্থ-সংগ্রহ-কল্পে গান্ধীজী ডাঃ রায়কে সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে যাইতে লাগিলেন। অন্যান্য নেতারাও এই সাধু প্রচেষ্টায় মহাত্মা গান্ধীকে নানাভাবে সাহায্য করিলেন। এইভাবে কয়েক দিন কাজ করায় অর্থ-সংগ্রহের কার্য অনেক দূর অগ্রসর হইল। বিধানচন্দ্রের কর্মতৎপরতা এবং ঐকান্তিকতা দেখিয়া গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইলেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গান্ধীজীর উপদেশে ন্যাস-রক্ষক পর্ষদ্ (বোর্ড অব্ ট্রাস্টীজ্) ডাঃ রায়কে পর্ষদের অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত করিলেন। 'চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল, তাহা দ্রুত-গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেশবন্ধুর স্মৃতিপূত ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য গান্ধীজী দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রায় চার বৎসর পূর্বে (১৯২১ খ্রীঃ) তিনি তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের (ভাণ্ডারের) জন্য ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরের বৎসর (১৯২৬ খ্রীঃ) ডাঃ রায় গিয়াছিলেন মধ্য প্রদেশের রায়পুরে একটি রোগীর চিকিৎসার জন্য। একটা রেলস্টেশনে নামিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন পাশের কামরায় গান্ধীজীকে। তাঁহার দিকে গান্ধীজীরও দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ডাক পড়িল। গান্ধীজী তাঁহাকে একটা চামড়ার বাক্স বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া যেন টাকা ও হিসাব পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উহার ভিতরে অনুমান হাজারচারেক টাকার জিনিস ছিল, ওইগুলি গান্ধীজী পাইয়াছেন জনগণের নিকট হইতে দানস্বরূপ। ডাঃ রায়ের সততা এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত না হইলে কখনও এইভাবে এত টাকার জিনিস কোন তালিকা প্রস্তুত না করাইয়া এবং রসিদ না লইয়া দিতেন না। ডাঃ রায় ফিরিয়া আসিয়া ওই জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট হিসাবসহ টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসার পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুআরি গান্ধীজীকে গ্রেফতার করিয়া বিনা-বিচারে বন্দী করা হইল। ইহা তাঁহার পঞ্চম বারের কারাবরণ। তাঁহাকে কারাবাসে আবদ্ধ থাকিতে হইল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে পর্যন্ত। তৎকালে তিনি হিন্দুসমাজকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটা পরিকল্পনা রচনা করিলেন। সমগ্র ভারতে কাজ করার

জন্য 'অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘ' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইল। শ্রীঘনশ্যাম দাস বিরলা নির্বাচিত হইলেন উহার সভাপতি। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক পর্ষদ্ (বোর্ড) গঠনের ব্যবস্থাও নিয়মাবলীতে রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হইল প্রাদেশিক পর্ষদ্গুলির সভাপতি মনোনয়নের। তদনুসারে বিরলাজী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপতি মনোনীত করিলেন। কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা আন্তরিকতা ও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে যত্নবান হওয়া ডাঃ রায়ের স্বভাবজাত গুণ। কলিকাতায় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে লইয়া ডাঃ রায় প্রাদেশিক বোর্ড গঠন করেন। সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রাক্তন সদস্য কংগ্রেসনেতা শ্রীসাতকড়িপতি রায়। ডাঃ রায়ের বাসভবনে (৩৬ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে) বোর্ডের কার্যালয়ের স্থান নির্দিষ্ট হইল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক বোর্ডের সদস্যগণের প্রথম সভার অধিবেশন হইল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় বোর্ডের কার্যালয়ে। ডাঃ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশের উপযোগী একটি কার্যক্রম সভায় আলোচনান্তে গৃহীত হইল। সভায় ইহা স্থির হইল যে অস্পৃশ্যতা বর্জনের নিমিত্ত সকল শ্রেণীর হিন্দুর বিশেষ করিয়া গোঁড়া দলের সহযোগিতা ও সাহায্য লাভে সঙ্ঘকে চেষ্টিত হইবে হইবে। সেই সভায় আরও স্থির হইল যে, বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক বোর্ডের পরিচালনাধীন শাখা স্থাপন করিতে হইবে।

ডাঃ বিধান রায় গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে প্রথমেই তাঁহাকে একটা বাধার সম্মুখীন হইতে হইল। শ্রী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ রায়ের সভাপতি মনোনয়নে গান্ধীজীর নিকট প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের আপত্তির প্রধান হেতু এই যে,—ডাঃ রায় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে দলবিশেষের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাঁহার সভাপতিত্বে গঠিত প্রাদেশিক পর্ষদ্ একটা বিশেষ দলের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং সেইজন্য অনেকে তাহাতে যোগ দিতে সম্মত হইবেন না। গান্ধীজী অবিলম্বে ডাঃ রায়কে একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহাদের আপত্তির কারণাদি জানান এবং মহৎ উদ্দেশ্য

সাধনার্থ সভাপতির পদ ছাড়িয়া দিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে সবিনয় অনুরোধ করেন। তিনি পত্র পাওয়ার পরই পদত্যাগ-পত্র কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সভাপতি বিরলাজীর নিকট পাঠাইয়া দেন। মহাত্মা গান্ধীকে তাহা জানাইয়া দিয়া লিখিলেন যে,—ইহাতে ত্যাগ স্বীকারের কিছুই তিনি দেখিতে পাইতেছেন না; তিনি সভাপতির পদ চাহেন নাই, কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সভাপতি বিরলাজী গান্ধীজীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহার সভাপতিত্বে প্রাদেশিক পর্ষদ্ কাজ আরম্ভ করিয়া কিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছেন; হঠাৎ তাঁহাকে কেন যে সভাপতির পদ ছাড়িয়া দিতে হইল, সে বিষয়ে জনসাধারণের নিকট একটা বিবৃতি প্রদান আবশ্যক; তজ্জন্য তিনি গান্ধীজীর পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ বিবৃতিতে প্রকাশ করার অনুমতিও চাহিয়া পাঠান। ওই পত্রে ডাঃ রায় ইহাও লিখিলেন যে,—সতীশবাবু এবং সুরেশবাবুর দল ব্যতীত আরও বহু দল বাংলা দেশে রহিয়াছে, ওই দুই জনের দল ভিন্ন আর সমস্তই প্রাদেশিক পর্ষদে যোগ দিয়াছে; তাঁহাদের আহ্বান করা সত্ত্বেও তাঁহারা আসেন নাই। গান্ধীজীর প্রতি বিধানচন্দ্রের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে কত প্রগাঢ়, তাহা ইতঃপূর্বে প্রসঙ্গতঃ একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন বিষয় তাঁহার কাছে ন্যায়সঙ্গত মনে হইলে তাহা গান্ধীজীকেও স্পষ্টভাবে খুলিয়া লিখিতে বা বলিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা-বোধ করিতেন না। ডাঃ রায়ের পত্রোত্তর পাইয়া গান্ধীজী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে সভাপতির পদত্যাগ করিতে লিখা ঠিক কাজ হয় নাই। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তারযোগে ডাঃ রায়কে জানাইলেন, তাঁহার পত্রখানা যেন বাতিল বলিয়া ধরা হয় এবং ডাঃ রায় যেন পদত্যাগপত্র অবিলম্বে প্রত্যাহার করেন। ডাঃ রায় গান্ধীজীর অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করিলেন। তারের পরে তিনি পাইলেন গান্ধীজীর পত্র—যাহাতে গান্ধীজী নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন এবং ডাঃ রায়কে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া পূর্বের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ওই পত্রে তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে,—তাঁহার পত্রের দ্বারা ডাঃ রায়কে যে মানসিক আঘাত দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেন ডাঃ রায় নিজের উদারতায় ভুলিয়া যান; সেই পত্রখানি লেখার জন্য তিনি নিজেকে সহজে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। "The mental hurt that I have caused you, you will generously forget. I shall not easily forgive myself for writing that letter to you"………

মহাত্মাজীর নির্দেশে ১৮ই ডিসেম্বর সমগ্র ভারতে অস্পৃশ্যতা-বর্জন দিবস রূপে পালন করার জন্য হিন্দু সমাজের নিকট অনুরোধ জানান হইল। পুণার বন্দী-নিবাস হইতে ৬ই ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধীর আবেদন প্রচারিত হয়। সংবাদপত্র হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"মহাত্মাজীর ইচ্ছা যে, ১৮ই তারিখ ভারতের প্রত্যেক গ্রাম শহর কিংবা নগরীতে অস্পৃশ্যতা-বর্জন দিবস রূপে প্রতিপালন করা হউক। তিনি উক্ত দিবসের জন্য নিম্নলিখিত কার্য-তালিকার প্রস্তাব করিয়াছেন :—

"প্রত্যেক স্থানে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘের কার্যের জন্য বাড়ী বাড়ী অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। হরিজনদিগের পাড়া পরিষ্কার করিয়া এবং তাহাদের জন্য অনুরূপ অন্য প্রকার কার্য করিয়া কয়েকজন উচ্চবর্ণের হিন্দু অন্য সকলকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। হরিজনগণ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধূলা ও প্রীতি-সম্মিলনীর সম্মিলিত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। হরিজন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকে লইয়া শোভাযাত্রা এবং কীর্তনের দল বাহির কারতে হইবে; এবং বিশেষ করিয়া হরিজনদিগের পাড়ায় এই উভয় শ্রেণীর হিন্দুকে একত্রিত করিতে হইবে। সর্বত্র জনসভার অধিবেশন করিতে হইবে, এই সকল সভায় অস্পৃশ্যতা পাপের স্বরূপ পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিতে হইবে, এবং দ্রুত ঐ পাপ সমূলে উচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত প্রচারকার্য চালাইবার জন্য এবং সমস্ত হিন্দুমন্দিরে বিশেষ করিয়া গুরুভায়ুর মন্দিরে হরিজনগণের প্রবেশ সমর্থন করিয়া এই সকল জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে" (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৩২ খ্রীঃ, ৭ই ডিসেম্বর)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পর্ষদ্‌ও পূর্বোক্ত কার্যক্রমকে ফলপ্রদ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিল। ১৮ই ডিসেম্বর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলা দেশেও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী দিবস সাফল্যের সহিত পালন করা হইল। সেইদিন কলিকাতায় টাউন-হলে ওই উপলক্ষে বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল, এবং বস্তিতে সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই বিবরণ ২০শে ডিসেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কলিকাতায় অস্পৃশ্যতা পরিহার দিবস"
"বস্তিতে বস্তিতে সেবাকার্য"
"পল্লীতে পল্লীতে অনুষ্ঠান"
"টাউন হলে বিরাট জনসভা"

"১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টার সময় অস্পৃশ্যতা পরিহার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় অস্পৃশ্যতা পরিহার সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতায় টাউন হলে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় তথাকথিত অস্পৃশ্যশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর লোকের এক বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল এবং সভায় প্রভূত উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বক্তাদের বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেরই মনে একটা যুগ-প্রবর্তনকারী নব ভাবের সঞ্চার হয়। সভায় নিম্নলিখিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন:—কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, সাতকড়িপতি রায়, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, মিথি বেন, শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্র দাস, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসন্তলাল মুরারকা, সীতারাম সাকসেরিয়া, বৈজনাথ কেদিয়া, পণ্ডিত জীবনলাল, ডাঃ সুবোধ বসু, ও কিরণ দাস। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

"সভাপতির বক্তৃতা

"সভাপতি মহাশয় বলেন:—আপনাদের কাছে আমার এই নিবেদন যে, আজ আমরা এক অপূর্ব মহান্ সংস্কারের কামনা হৃদয়ে লইয়া এইখানে সমবেত হইয়াছি। আমার প্রথম কথা এই যে, পূর্বে যাহা অনুভব করা যায় নাই এখন মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ফলে এই বিরাট হিন্দুসমাজে এক অপরূপ চাঞ্চল্য আসিয়াছে। আমরা এই জাগরণ আজ শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে একান্তভাবে অনুভব করিতেছি। আমরা জানি পৃথিবীর সর্বত্র কি হইয়াছে এবং কেমন করিয়া সকল জাতি মানুষের দাবিকেই একমাত্র স্বীকার লইয়া আজ কি প্রকার গৌরবের শিখরে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই অতি বিস্তীর্ণ মাতৃভূমির অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে মানুষ মানুষের অধিকারকে, মানুষের দাবিকে স্বীকার করে নাই। অতি তুচ্ছ কুসংস্কারের আবরণ দিয়া মানুষের সরস সত্তাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। আজ সেই সব অবজ্ঞাত, যাঁহারা নিম্নে রহিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন আমাদের অধিকার দাও। এই অধিকারের দাবি শাশ্বত। তাই আমরা কাহারও

জন্মগত প্রাধান্য স্বীকার করিব না। জাতীয়তা বৃদ্ধির সময় আজ ভারতবর্ষে আসিয়াছে; এখন একা উপরে উঠিতে চাহি না, হয় সকল ভ্রাতা-ভগ্নী একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া নব উদয়াচলের দিকে যাত্রা করিব, নতুবা কখনও আমার অবজ্ঞাত অনুন্নত তথাকথিত ভ্রাতা-ভগ্নীদের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া একাকী গৌরবের পথে চলিব না। আজ জারবেদা কারা-প্রাচীরের অন্তরাল হইতে এই বাণীই আমরা লাভ করিয়াছি। জীবনপণ অনশনে যে সত্য মহাত্মা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, আমাদেরও সেই সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। বন্ধুগণ! আমরা সত্যের বন্দনায় যেন পিছনে পড়িয়া না থাকি।”

“প্রথম প্রস্তাব

“সভাপতির আহ্বানে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করেন :—

“এই সভায় সমবেত হিন্দুগণ প্রত্যেকে ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে, আমরা জন্মগত অস্পৃশ্যতা বিশ্বাস করি না; যে অস্পৃশ্যতা এত কাল ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ আনয়ন করিয়াছে, অতি সত্বর উহা দূর করিয়া সাম্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

“প্রস্তাবক উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, মহাত্মাজী আমাদের অনুভবের কৃষ্ণ যবনিকাখানি উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের এই জাতি যে ক্রমশঃ অধোগতির দিকে নামিয়া যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই—প্রায় আট কোটি মানব-সন্তানকে বড় হইবার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার অধিকার দিতেছি না, হিন্দু যাহাতে মহৎ হইয়া গৌরব-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত, সেই পরম প্রয়োজনীয় সত্যকেই আমরা এ যাবৎ অস্বীকার করিয়া আসিতেছি। আজ মহাত্মাজীর জীবনরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমাদের—সেই কথা যেন বিস্মৃত না হই।

“শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া বলেন—প্রস্তাবের মৌলিক অনুভূতি নূতন নহে, কারণ পূর্বেই তাহা আমাদের কানে আসিয়া পৌছিয়াছে—

‘শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই!’

আমাদের দেশে যুগে যুগে যে সকল মহাজনের আগমন হইয়াছে, তাঁহারাও এই বাণী দিয়াছেন। তবু এই জিনিসটাকে আজ আমাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে; কেননা বিগত কয়েক শত বৎসরের অন্ধ সংস্কার আমাদের ভিতরে আশ্রয় পাইয়া এই মনুষ্যত্বের পরম দাবিকে চাপা দিয়াছে। আজ মানুষের অন্তরের চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে। এই যুগ-যুগের সঞ্চিত অন্ধকারের বিরুদ্ধেই মহাত্মাজীর পণ, মহাত্মাজীর সংকল্প। হিন্দুসমাজ! আজ তোমার পরিচয় কায়স্থ নয়, বৈদ্য নয়, নমঃশূদ্র নয়, তোমার একমাত্র অখণ্ড পরিচয় হইবে—হিন্দু। আজ সম্মুখে যে আলেখ্য দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নবারুণ দীপ্তির বিকাশ দেখিতেছি। আমাদের মহাত্মার অনশন বৃথা হয় নাই, উহা আমাদের বহু শতাব্দীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

"প্রস্তাব গ্রহণের দৃশ্য

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সভার নিকট উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মত সমর্থনের জন্য আবেদন করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবের প্রতি কথাটি সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

তদনুসারে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিরাট জনসঙ্ঘ প্রস্তাবের প্রতি কথাটি সভাপতির সহিত আবৃত্তি করিয়া গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের দৃশ্যটি অপূর্ব হইয়াছিল।

"দ্বিতীয় প্রস্তাব

তারপর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সভায় আনয়ন করেন:—

এই সভায় সমবেত সর্বশ্রেণীর হিন্দুগণ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক সাধারণ দেব-মন্দিরেই শ্রেণী বা জাতি নির্বিশেষে সকল হিন্দুরই প্রবেশের অধিকার আছে। অতএব মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কালিকটের জামেরিনকে আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি প্রতি মানবের এই ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া অচিরে গুরুভায়ুর মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করুন এবং এই সৎকার্য দ্বারা তিনি মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার অনশনের প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত করিয়া সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত খৈতান এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

"শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্র দাস

উক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, এই রকম একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আবার সভার প্রয়োজন হয়; পৃথিবীর আর কোথায়ও মানুষের দেবতা উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশের জন্য এমন সভা করার আবশ্যক হয় না। হিন্দুজাতির ইহা হীন কলঙ্কের কথা। এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। অস্পৃশ্যকে যেন টানিয়া লই, মানুষের ভিতর অবস্থিত সত্যকে যেন অবজ্ঞা না করি।

"অতঃপর সভায় উপরোক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত জীবনলাল, মিথি বেন সর্বশেষ বক্তৃতা করেন। ডাঃ সুবোধকুমার বসু সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়।

"কলিকাতার বিভিন্ন বস্তিতে প্রচারকার্য

গত রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য, সত্য মজুমদার, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু ভট্টাচার্য, সুধাংশু কর, দেবেন্দ্র ভট্টাচায, পি. দত্ত, এস. কে. তেওয়ারী, শুকদেব চৌধুরী প্রভৃতি এলবার্ট-হল হইতে বিভিন্ন বস্তি পরিদর্শন করিতে বাহির হন। তাঁহারা ২০নং রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, ৬৪।১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, ১নং গৌরীবাড়ী লেন, ১৪নং উল্টাডাঙ্গা রোড, ৩২।৪৩নং আপার সার্কুলার রোড পরিদর্শন করেন। তাঁহারা সকল বস্তিতেই সভা করেন এবং বস্তিবাসীদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য অনুরোধ করেন। প্রত্যেক স্থানেই সভার শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়, জাতিনির্বিশেষে সকলেই উহা গ্রহণ করেন।"

অনশনের মাধ্যমে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন, কোন ন্যায্য দাবির প্রতি বিদেশী সরকার অথবা জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ, কিংবা আত্মশুদ্ধি—গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনশনকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন একটা পবিত্র ব্রত-রূপে। সেই ব্রত পালন করিতে যাইয়া কোন কোন বার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখী হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজী অনশন-ব্রত পালন করিয়াছেন আঠার বার। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বারের (১৯১৩ এবং ১৯৪৩ খ্রীঃ) অনশন-ব্রত তিনি পালন করিয়াছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতে অনশন উপলক্ষে অনেক বারই ডাঃ রায় গান্ধীজীর নিকটে ছিলেন। আগস্ট-বিপ্লবের পরে গান্ধীজী

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে ২১ দিনের জন্য অনশন করেন। 'ভারত ছাড়িয়া যাও' আন্দোলন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর অন্যায়ভাবে যে দোষারোপ করেন, উহারই প্রতিবাদে ওই অনশন। ইহার আরম্ভ হইল ১০ই ফেব্রুআরি হইতে এবং সমাপ্তি হইল ৩রা মার্চ। গান্ধীজী তখন আগা খাঁ প্রাসাদে (পুণায়) বন্দী। অনশনব্রত পালনের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

..."গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। কাছে ছিলেন কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন। ডাঃ গিল্‌ডার ছিলেন য়েরোড়া জেলে, তাঁহাকে নিয়ে আসা হল পুনরায় বন্দীবাসে।

বাহিরে যখন খবর গিয়ে পৌছালো, তখন গান্ধীজীর স্বাস্থ্য খারাপের দিকে যেতে শুরু করেছে—বমির ভাব, রাত্রে ঘুম নেই। ক্রমে অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল, সামান্য যে জলটুকু তিনি পান করতেন, তাতেও কষ্ট হতে লাগলো। চারিদিক থেকে ডাক্তাররা ছুটে গেলেন—কলিকাতা থেকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার সুশীলা নায়ার, বোম্বাই থেকে সার্জেন জেনারেল মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি। নাক, কান, গলার বিশেষজ্ঞ এসে গান্ধীজীকে পরীক্ষা করলেন। সারা ভারতের জনগণের উৎকণ্ঠা শান্ত রাখার জন্য সকাল বিকালে ছ'জন ডাক্তারের স্বাক্ষর দিয়ে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য-সংবাদ ঘোষণা করার ব্যবস্থা হোল,—ডাক্তার গিল্‌ডার, মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ভাণ্ডারী, ডাক্তার সুশীলা নায়ার, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল শা। বোম্বাই সরকারের উপদেষ্টা ব্রিস্টো সাহেব এলেন গান্ধীজীর অবস্থাটা চাক্ষুষ দেখবার জন্য।

২১শে ফেব্রুআরি গান্ধীজীর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে উঠলো। বেলা ৪টার সময় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ধমনীর গতি অনুভব করা যায় না।

পরদিনও অবস্থা বিশেষ ভালর দিকে গেল না, ইউরিমিয়ার ভাব দেখা গেল। এবার বুঝি গান্ধীজী আর বাঁচেন না। সারা ভারত থম্‌থম্ করতে লাগলো, বড়লাটের দরবার থেকে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন—হোমি মুদী, নলিনীরঞ্জন সরকার, মাধব শ্রীহরি আনে।

২৫শে গান্ধীজীকে গরম জলে গা মুছিয়ে গাত্র-মর্দনের ব্যবস্থা করা হোল, কিন্তু তথাপি অবস্থা বিশেষ কিছু ভালর দিকে গেল না।

২৭শে তারিখে তিনি লোক চিনতে পারলেন না। কিন্তু ডাক্তারদের তিনি অনুরোধ করেছিলেন যখন তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন তখন যেন তাঁরা জোর করে কোন কিছু না করেন, সেইজন্য গান্ধীজীর মুখ থেকে

যখন লালা ঝরতে সুরু করলো তখন ডাক্তাররা কিছুই করতে সাহস পেলেন না, উপরন্তু গান্ধীজী এলোপাথিক চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন, তাঁর মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ করতেও ডাক্তাররা শঙ্কিত হয়েছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিলাতে চার্চিল সাহেবের কাছে 'তার' করলেন—আমি শেষ মুহূর্তে আপনার কাছে আবেদন করছি মহাত্মাজীকে মুক্তি দিন।...গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে হৃদ্যতার সম্ভাবনা আছে তা চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাবে!

কিন্তু মুক্তি দেবার জন্য ব্রিটিশের তখন মোটেই আগ্রহ ছিল না।

শোনা যায় এই সময় ভারতসরকার মহাত্মাজীর মৃত্যু অবধারিত মনে করে পুণায় প্রচুর চন্দনকাঠ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুদের ইচ্ছা সফল হোল না, গান্ধীজীর অবস্থা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হোল। ৩রা মার্চ সকাল ৯টায় তিনি যখন অনশন শেষ করলেন, তখন সমস্ত অসুস্থতা তিনি জয় করেছন, শুধু দৈহিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বললেন—গান্ধীজী আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যুর অত্যন্ত কাছে তিনি গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

উপবাস শেষ করে গান্ধীজী বললেন—জানি না ভগবান কেন আমার জীবন রক্ষা করলেন, সম্ভবতঃ তিনি আমাকে দিয়ে আরো অনেক কাজ করিয়ে নিতে চান।" উদ্ধৃতি—'আমাদের গান্ধীজী'—ধীরেন্দ্রলাল ধর।

যেখানে দুইটি মানুষের মধ্যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়, সেখানে প্রভাব-বিস্তারও একতরফা হয় না। গান্ধীজী যেমন বিধানচন্দ্রের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, বিধানচন্দ্রও গান্ধীজীর উপর সময়-বিশেষে কম প্রভাব বিস্তার করেন নাই। বিধানচন্দ্রের দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধি। সেইজন্য তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তার রায় খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। গান্ধীজী এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া ডাক্তার রায় ভারতবিশ্রুত চিকিৎসক হইয়াও গান্ধীজীর অসুস্থ অবস্থায় কাজে আসিতেন না। কিন্তু একবার ডাক্তার রায়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি এলোপ্যাথিক ঔষধ খাইলেন এবং সহজেই রোগমুক্ত হইয়া গেলেন। সেই কাহিনী 'আমাদের গান্ধীজী' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বন্দীবাসে মহাত্মাজীর ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ঘুসঘুসে জ্বর, তারই সঙ্গে আমাশয়! শোক ও নিঃসঙ্গতা তাঁর মন ও শক্তিকে বিষাদক্লিষ্ট করে তুললো।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কি একটা কাজে গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ে, বোম্বাই সরকারের অনুরোধে তিনি গান্ধীজীকে দেখতে গেলেন পুণায়। ডাক্তার বিধানকে দেখে গান্ধীজী খুশী হলেন, কিন্তু চিকিৎসা করার কথা শুনে বললেন—ডাক্তার বিধান, তোমার চিকিৎসা তো আমি নিতে পারবো না।

বিধান বিস্মিত হলেন, বললেন—আমার অপরাধ কি জানতে পারি না?

গান্ধীজী বললেন—আমার দেশের চল্লিশ কোটি দীন-দুঃখীর অসুখে যখন চিকিৎসা করতে পার না, তখন আমিই-বা তোমার চিকিৎসা নেব কেন?

বিধানচন্দ্র বললেন—এই কথা! মহাত্মাজী, আমি চল্লিশ কোটি নরনারীর চিকিৎসা করতে পারিনি একথা সত্যি, কিন্তু এই চল্লিশ কোটি নর-নারীর যিনি আশা-ভরসা, চল্লিশ কোটি পরাধীন মানুষ যাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে, চল্লিশ কোটি নর-নারীর দুঃখ লাঘবের ভার যাঁর হাতে, যিনি বাঁচলে চল্লিশ কোটি বাঁচবে, যাঁর মৃত্যুতে চল্লিশ কোটি মরবে, তাঁর চিকিৎসার ভার সেই চল্লিশ কোটি নর-নারী আমার উপর দিয়েছে, আপনি 'না' বললেই বা আমি শুনবো কেন?

গান্ধীজী বললেন—কিন্তু ডাক্তার বিধান, তোমার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা তো আমি নিতে পারি না।

বিধানচন্দ্র বললেন—মহাত্মাজী, আপনি তো বলেন যে—পৃথিবীর সব কিছু—এমন কি ধূলিকণাটি পর্যন্ত ভগবানের সৃষ্টি—একথাটা কি সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন?

মহাত্মাজী বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, সমস্তই ভগবানের সৃষ্টি!

—তাহলে মহাত্মাজী, এলোপ্যাথি চিকিৎসাও কি তাঁর সৃষ্টি নয়?

গান্ধীজী এবার হেসে ফেললেন,—তোমার উকিল কি ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল, তুমি কেন যে আইনজীবী হওনি আমি তাই ভাবছি।

—ভগবান আইনজীবী না করে চিকিৎসাজীবী করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁর সব-সেরা ভক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিকিৎসার ভার পড়বে আমার উপর। উকিল ব্যারিস্টার হয়ে হয়তো আমি অনেক বেশী টাকা উপায় করতে পারতাম, কিন্তু ভগবানের প্রিয়তম সন্তানের চিকিৎসা করার সৌভাগ্য তো পেতুম না। এইজন্যই ভগবান আমাকে ডাক্তার করেছেন।

মহাত্মাজী হেসে উঠলেন, বললেন—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, তুমি কি ওষুধ দেবে দাও, খাই।

এলোপ্যাথিক মতেই সেবার গান্ধিজীর চিকিৎসা হোল, এবং ক'দিনের মধ্যেই বিধানচন্দ্র তাঁকে নিরাময় করে কলকাতায় ফিরলেন।”

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই সকাল বেলায় গান্ধীজী কলিকাতায় আসেন হরিজন ভাণ্ডারে অর্থ-সংগ্রহের জন্য। এক ঘণ্টা বিশ্রামের পরে ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া ডাক্তারেরা বিবৃতি দেন। সারা দিন অর্থ সংগ্রহের কার্যে গান্ধীজীকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। পর দিবস তিনি কংগ্রেস-কর্মীগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় পৌর-সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। এই দিন সন্ধ্যায় ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার স্বাস্থ্য পুনর্বার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তাহাতে দেখা গেল, তাঁহার রক্তের চাপ (ব্লাড্‌ প্রেসার) সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে মোটের উপর তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক। তৃতীয় দিবস (২১শে জুলাই) অপরাহ্নে দেশবন্ধু পার্কে প্রায় দশ লক্ষ নরনারীর এক বিরাট জনসভায় গান্ধীজী বক্তৃতা দেন। কলিকাতায় কার্যসমাপনান্তে তিনি বিহার ভূমিকম্প-দুর্গত জনগণের সাহায্যদান উপলক্ষে পাটনা গেলেন ৩রা আগস্ট। ইহার দিন কয়েক পরেই (৭ই আগস্ট হইতে) তিনি এক সপ্তাহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত রূপে অনশন করিলেন। আজমীরে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের সমর্থকগণের মধ্যে একটি দল সনাতনীদের আক্রমণ করিয়া প্রহার করিয়াছিল; সেইজন্যই ওই অনশন-ব্রত পালন। তিনি অনশন করিবেন জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বোম্বে হইতে ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌তা 'তার' করিয়া জানান যে,—অনশন-কালে তাঁহারা গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে চাহেন। গান্ধীজীর নির্দেশে তাঁহার একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই জানাইলেন—তাঁহারা যেন নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, এখন আসিবার প্রয়োজন নাই; যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ডাকা হইবে। এই সম্পর্কে অমৃত-বাজার পত্রিকার ৮ই আগস্টের সংখ্যায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Dr. Bidhan Chandra Roy and Dr. Jeevraj Mehta had both offered their services during Mr. Gandhi's fast, but at the latter's instance Mr. Mahadev Desai has written to them both

urging them not to disturb their work, and assuring them that Mr. Gandhi would not hesitate to summon them if it was found absolutely essential."

কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের ডাকিবার কোন আবশ্যকতা হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর সপ্তাহ-ব্যাপী অনশনের দিনগুলি নিরাপদে কাটিয়া গেল। গান্ধীজী এবং ডাঃ রায়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ, উহার কতক নিদর্শন পূর্বোক্ত বিবরণ হইতেও মিলিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিধানের জীবনে দেশবন্ধুর প্রভাব

দাশ-পরিবার এবং রায়-পরিবার ব্রাহ্মসমাজে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী হইয়াছিল। উভয় পরিবারের মধ্যে পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিধানচন্দ্র রায় পরস্পর পরস্পরকে ভালো করিয়াই জানিতেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন যখন রাজোচিত ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির দাসত্ব-মোচনের ব্রত গ্রহণ করিলেন, তখন বিধানচন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের বহু বৎসরের অভ্যস্ত সুরাপান ও ধূমপান বর্জন তাঁহাকে বিস্মিত করিল। ইহা দেখিয়া তৎকালে কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, উহা সাময়িক; আবার অনেকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র-বুদ্ধদেবের দেশেই ইহা সম্ভব ও স্বাভাবিক। সত্যই চিত্তরঞ্জন তাহা বাকী জীবনের জন্য বর্জন করিয়াছিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে বিধানচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াইলে স্বরাজ্য দল তাঁহাকে সমর্থন করে। তৎকালে তিনি স্বরাজ্য দলে যোগদান করেন নাই সত্য, কিন্তু সেই দলের কার্যক্রমকে মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তখন দেশবন্ধুর অপূর্ব প্রভাব! ডাঃ রায়কে ভোট দিয়া জয়ী করিবার জন্য তিনি আবেদন-পত্র প্রচার করেন। তৎকালে কাউন্সিল প্রবেশ বিরোধী অর্থাৎ 'নো-চেঞ্জার' আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বরের সংখ্যায় নির্বাচন-মধু' শীর্ষক টিপ্পনীতে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বরাজ্য দলভুক্ত নহেন। কিন্তু তবু স্বরাজ্য দল তাঁহার নির্বাচন সমর্থন করিতেছেন। স্বয়ং দলপতি চিত্তরঞ্জন বিধানবাবুর গুণগান করিয়া ফরওয়ার্ডে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। বিধানবাবু নামজাদা ডাক্তার এবং তিনি মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের বিপক্ষে লড়িতেছেন—এই দুই গুণেই নাকি স্বরাজ্য দল তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি—এটা কোন্ নীতি অনুসারে হইতেছে—রাজনীতি না অর্থনীতি?"

সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়া ডাঃ বিধান রায়কে জয়ী করিবার জন্য

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের নরনারী কি প্রকার ঐকান্তিকতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন, 'নির্বাচন-মধু' হইতে তাহাও আহরণ করা যাইতে পারে। ২৩শে নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"সুরেন্দ্রনাথ বনাম ডাঃ বিধানচন্দ্রের ভোট-দ্বন্দ্বে বিধানবাবুর তরফে মেয়েরা 'ক্যানভাসিং'-এ নামিয়াছেন। সেদিন শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা এক সভায় জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন, শুনিয়াছি। আবার পরশ্ব টিটাগড়ের ভোটসভায় হঠাৎ এক বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবা আবির্ভূতা হইয়া সাশ্রুনেত্রে সকলকে বলিয়াছেন—"ডাঃ বিধান রায়কে ভোট দাও, দেশের মঙ্গল হইবে।" আমরা এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া সত্যই পুলকিত হইয়াছি।"

ভোট গ্রহণের দিন দেশবন্ধু নিজে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি যে পরিদর্শন করিয়াছেন—সেই সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া পরিবেশিত হইয়াছে। ২৭শে নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে "ব্যারাকপুরে ভোটযুদ্ধ" শীর্ষক সংবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"সমগ্র কেন্দ্রগুলির হাবভাব হইতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যুদ্ধ বেশ জোরে চলিয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ভোটকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রকেও গতকল্য ঘোরাফেরা করিতে দেখা গিয়াছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র তো নিজে ছিলেনই। স্বরাজ্য দলের সেনাপতি টহল দিতেছেন দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথও এইদিন চুপ করিয়া থাকেন নাই।"

নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া ডাঃ রায় দেশবন্ধুর নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বরাজ্য দলের সদস্য-ভুক্ত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় কাজ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর দল পরিচালনার কৌশল ও দক্ষতা এবং রাজনীতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইলেন ডাঃ রায় তাঁহার সহিত কাজ করিবার কালে। সেই মহান নেতার নেতৃত্বে ডাঃ রায়ের আস্থা অধিকতর দৃঢ় হইল। স্বরাজ্য দলের জয়লাভ সম্পর্কে দেশবন্ধুর কন্যা শ্রীঅর্পণা দেবীর লিখিত 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"এ সময় রসা রোডের বাড়ী কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে উঠলো। আহার-নিদ্রা ভুলে বাবা এই নির্বাচনে স্বীয় দলকে জয়যুক্ত করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। সাতকড়িপতি রায় এই নির্বাচনে

প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সতীশরঞ্জন দাশকে পরাজিত করে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনে পড়ে, নির্বাচনের ফল জেনে কাকা সাহেব আমাদের বাড়ী এসে বাবাকে বললেন, "আমাকে হারিয়েছ তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু খালি-পা-ওয়ালা লোক দিয়ে আমাকে হারালে?" বাবা বললেন "এই খালি-পা-ওয়ালা লোকেরাই যে দেশের প্রাণ জুড়ে আছে তা বুঝলে তো?" এর পরেই ব্যারাকপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি পরাজিত করলেন নবীন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে। সে সময়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দেশের জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তাই তাঁকে নির্বাচিত করবার জন্য রাষ্ট্রগুরুর বিরুদ্ধে পিতৃদেব সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন এই কেন্দ্রে। প্রত্যেক নির্বাচনী-সভায় উপস্থিত হয়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে নির্বাচিত করবার জন্য অনুরোধ করলেন। বিরুদ্ধ-পক্ষের কোন বক্তাকেই তিনি নিবৃত্ত করতেন না। সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। এবং তাদের যুক্তি অলৌকিক শক্তিবলে তিনি খণ্ডন করতেন। একদিন ব্যারাকপুরে এক সভায় প্রতিপক্ষের ঢিল এসে পিতৃদেবের আঙ্গুলে লেগেছিল। তিনি তাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মৃদু হেসে ধীরভাবে বলেছিলেন, 'সাহস করে সামনে এসে মার না কেন, ভাই? কেন কাপুরুষ নামের কলঙ্ক বহন করছো?" তাঁর এই আচরণে জনতা স্তব্ধ ও তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিল। সিংহের বিবরে প্রবেশ করে ডাক্তার বিধান রায়কে নিমিত্ত করে সেদিন সিংহকেই পরাজিত করেছিলেন তিনি। স্যার সুরেন্দ্রনাথ সেদিন রাজনৈতিক আসন পিতৃদেবকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, আর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জয়ী হয়ে কংগ্রেসে প্রথম প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পিতৃদেবের সহায়তায় নিজকৃতিত্ব প্রদর্শন করবার সুযোগ একদিন পেয়েছিলেন এবং যার জন্য তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী—আশা করি অন্যান্য লোকেও তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করবার সে সুযোগ পেতে তাঁর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে না। তবেই বাবার পরিশ্রম সার্থক হবে এবং বিধানচন্দ্র রায়ও যোগ্য গুরুদক্ষিণা দিয়ে ধন্য হবেন।"

ব্যবস্থাপক সভার কার্যে ডাঃ রায় অল্পকাল মধ্যে যেরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন, তাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশবন্ধু নিশ্চিত হইলেন। স্বরাজ্য দলে যোগ দিবার পূর্বে ডাঃ

রায় দেশবন্ধুর উপদেশ ও পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। দেশবন্ধুও জটিল রাজনীতিক পরিস্থিতিতে তাঁহার বিশ্বাসভাজন প্রিয় শিষ্য ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতেন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। এইভাবে দেশসেবার ভিতর দিয়া উভয়ের যে মধ্যে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল, তাহা স্নেহ, প্রীতি, বিশ্বাস, গুণগ্রাহিতা ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ। কোন দিন সেই সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ডাঃ রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর হইতে দেশবন্ধু রোগ-চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপারেও তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিতেন। ব্যারিস্টারি ছাড়িয়া চিত্তরঞ্জন দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার পর হইতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল; মাঝে মাঝে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য ডাঃ রায়কে প্রায়ই দেশবন্ধুর রসা রোডের বাড়ীতে যাইতে হইত। তৎকালে উভয়ের মধ্যে চিকিৎসক ও রোগী বলিয়া অর্থের কোন সম্বন্ধ ছিল না। যিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিকল্পে সর্বস্ব সমর্পণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের সহিত সমগ্র দেশ ও জাতির স্বার্থ জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ রায় দেশবন্ধুকে চিকিৎসা করিতেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নিতেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের দিন নির্ধারিত হইল। পূর্ববর্তী বাজেট অধিবেশনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল মন্ত্রীদের বেতনের দাবি নামঞ্জুর করায় তাঁহারা গদীচ্যুত হইয়া যান। তাঁহাদের পুনর্বার গদীতে বসাইবার উদ্দেশ্যে বর্তমান অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশবন্ধু ইহার পূর্ব হইতেই অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন; তিনি এতটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, উঠিয়া চলাফেরা করার শক্তিও নাই। রসা রোডের বাড়ীতে চিকিৎসক ডাঃ রায়ের ডাক পড়িল। দেশবন্ধু তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার আসন্ন অধিবেশনে তিনি উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীদের বেতনের দাবির সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবেন। ডাঃ রায় সম্মতি দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া দেশবন্ধু বলিলেন যে, ওই ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ডাঃ রায়কে সম্মতি দিতে হইল। অধিবেশনের দিন দেশবন্ধুকে ইনভেলিড চেয়ারে শোয়াইয়া ব্যবস্থাপক সভায় নেওয়া হইল, সঙ্গে রহিয়াছেন ডাঃ রায়। শায়িত অবস্থায় থাকিয়াই দেশবন্ধু একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এইবারেও স্বরাজ্য দলের জয় হইল, সরকার পক্ষের আনীত মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুরের দাবির প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল।

ডাঃ রায় তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগী ও দলের নেতাকে তেমনই ভাবে সঙ্গে করিয়া নিরাপদে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। ওইভাবে অসুস্থ অবস্থায় আনা-নেওয়ায় এবং বক্তৃতা দেওয়ায় দেশবন্ধুর দেহের উপর প্রতিক্রিয়া হইল, তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পাইল ; সেইজন্য তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল আরও কয়েক দিন। কিন্তু তিনি মানসিক শান্তি পাইয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর বিধানচন্দ্রের প্রতি বিশ্বাস কতটা দৃঢ় ছিল, তাহার একটা নিদর্শন মিলিবে তাঁহার সম্পাদিত ট্রাস্ট্ ডীড্ হইতে। মহাপ্রয়াণের কয়েক মাস পূর্বে তিনি চার বিঘা জমির উপর অবস্থিত তাঁহার রসা রোডের বাসভবন লোকহিতার্থে দান করিয়া যান। এখন সেখানে 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন' নামে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বিধানচন্দ্রকে না জানাইয়া এবং তাঁহার কোন প্রকার সম্মতি না লইয়া দেশবন্ধু দানপত্রে তাঁহাকে একজন ট্রাস্ট্রী বা ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বিধানচন্দ্রও তাঁহার নেতার ন্যস্ত বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সেবা-সদন গড়িয়া তুলিবার বিবরণ পরবর্তী একটি অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে। দেশবন্ধুর স্বর্গগমনের পরে বিধানচন্দ্র যখন প্রথমবার কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র স্বরূপ মহানগরের পৌরজনের সেবার জন্য যে আদর্শ ও নীতি নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। দেশবন্ধু বলিয়াছেন যে, দরিদ্রের দারিদ্র্য এবং দুর্গতের দুর্গতি দূর করা হইবে কংগ্রেস-পন্থী কাউন্সিলারদের লক্ষ্য এবং নিঃস্বার্থভাবে আন্তরিকতার সহিত করদাতাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা হইবে তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। মেয়রের দায়িত্বপূর্ণ সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালে বিধানচন্দ্র সেই আদর্শ ও নীতি হইতে কোনদিন ভ্রষ্ট হন নাই।

রাজনীতিক্ষেত্রে একই সঙ্গে কাজ করিতে যাইয়া দেশবন্ধু স্বদেশানুরাগী বিধানচন্দ্রের কর্মনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেইজন্য প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি কখনও কখনও তাঁহার উপর দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিতেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে ডাঃ রায় স্বতন্ত্র দলের পক্ষ হইতে গবর্নমেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ জানাইলেন যে, প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষি, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত উন্নতিসাধনের জন্য যেন ছোট ছোট ট্রাস্ট্ বোর্ড গঠন করা হয়। বৈদেশিক আমলাতান্ত্রিক সরকার সে অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করিতে সম্মত হন নাই।

দেশবন্ধুর চিন্তাধারায় গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা ইহার পূর্ব হইতেই স্থান পাইয়াছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কাজ করিতে নামিয়া তিনি সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বিধানচন্দ্রের ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ বিদেশী সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় দেশবন্ধু গ্রামোন্নয়ন কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়া দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। তৎকালে ওই মহান নেতা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁহার স্বদেশীয়গণের নিকট এত প্রিয় ছিলেন যে, আবেদন প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামোন্নয়ন-ভাণ্ডারে অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। অর্থ সংগ্রহের পরে দেশবন্ধু গঠন করিলেন Village Reorganisation Board বা গ্রাম পুনর্গঠন পর্ষৎ; এবং ডাঃ রায়ের অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে উহার সম্পাদক ও অন্যতম ট্রাস্টী মনোনীত করেন। ইহা হইতেও বুঝা যাইবে যে, বিধানচন্দ্রের দেশপ্রীতি, সততা এবং কর্মকুশলতায় দেশবন্ধুর কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পরে ওই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হইল 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি।'*

* ২১৩ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী ডাঃ রায়কে 'নবীন ডাক্তার' এবং দেশের জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় 'নির্বাচন-মধু' হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে পূর্বোক্ত বর্ণনা নির্ভুল নহে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি

মহাত্মা গান্ধীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য যে এক বিরাট, অহিংসাপন্থী ও শক্তিশালী বাহিনী সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহা সুস্পষ্ট দেখা গেল। আইন অমান্য আন্দোলনের পথেই মুক্তিকামী জাতি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে,—সে বিষয়ে গান্ধীজী নিশ্চিত হইলেন। ডাঃ আন্সারি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অভিমত ছিল এই—আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় কখন আরম্ভ হইবে ঠিক নাই, সুতরাং দেশকে কর্মব্যস্ত করিয়া তুলিতে এবং ব্রিটিশ সরকারের চালবাজি পুরাপুরি ধরাইয়া দিতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি কংগ্রেসের পূর্ববৎ গ্রহণ করা সমীচীন। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের সমর্থনে 'হোয়াইট পেপার' বা সুপারিশপত্র ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ করিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ডাঃ রায় এবং ডাঃ আন্সারি আলাপ-আলোচনা করিয়া একমত হইলেন। তাঁহারা কয়েক জন নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের মতের সমর্থক আরও আছেন। ডাঃ রায় কোন কাজে একবার হাত দিলে তাহা কখনও অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া দেন না। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি দেশের তৎকালীন অবস্থায় যখন পুনর্বার গ্রহণযোগ্য বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল, তখন তিনি বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতৃবর্গের মতামত অবগত হইতেও চেষ্টিত হইলেন। এই চেষ্টাতে কাটিয়া গেল দুই মাসেরও অধিক কাল। অতঃপর তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ (১৯৩৪ খ্রীঃ মার্চ) করিয়া তাঁহার অভিমতও জানিয়া নিলেন। ডাঃ আন্সারি এবং ডাঃ রায় উভয়ে মিলিয়া নয়া দিল্লীতে বিশিষ্ট নেতাদের একটা ঘরোয়া সম্মেলনের ('ইন্‌ফর্মেল কন্‌ফারেন্স্'-এর) অয়োজন করেন। নয়া দিল্লীতে ডাঃ আন্সারির ভবনে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইল ৩১শে মার্চ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চল্লিশ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডাঃ আন্সারি, আসফ আলি, বুলাভাই দেশাই, কে. এম. মুন্সী, কে. এফ. নরিম্যান, চৌধুরী খালেকুজ্জমান, সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মদনমোহন

মালব্য, সত্যমূর্তি, ডাঃ বিধান রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসী গোস্বামী, সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ।

পূর্বোক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল—দেশের তাৎকালিক পরিস্থিতি সঠিক অবগত হওয়া এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে অবিলম্বে কর্তব্য নির্ধারণ। দুই দিনের অধিবেশনে নেতৃবর্গ আলোচনান্তে একমত হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনর্বার গ্রহণ করা সমীচীন; তবে মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদন ব্যতীত ওই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা হইবে না।' অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতার দিল্লী হইতে ১লা এপ্রিল তারিখে কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে প্রেরিত যে সংবাদ ৩রা এপ্রিল প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Whether Ansari-Roy-Desai trio will be as powerful as Matilal-Das-Patel trio was, when the first Swaraj Party was formed, remains to be seen." অর্থাৎ—প্রথম স্বরাজ্য দল গঠিত হইবার সময়ে মতিলাল-দাশ-পেটেল ত্রিনেতা যেমন শক্তিমান ছিলেন, আন্সারি-রায়-দেশাই ত্রিনেতা তদ্রূপ হইবেন কিনা তাহা এখন বলা যায় না—ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবার জন্য ডাঃ আন্সারি, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বুলাভাই দেশাই ৩রা এপ্রিল প্রাতঃকালে নয়া দিল্লী হইতে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন তাঁহারা তথায় পৌছিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অপরাহ্নে প্রায় ছয়টার সময়ে। তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইল তিন ঘণ্টার উর্ধ্বকাল অর্থাৎ রাত্রি সোয়া নয়টা পর্যন্ত। পরের দিন সকালবেলায় নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে আইনসভায় প্রবেশের নীতি গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হইল। স্বরাজ্যদলকে পুনরুজ্জীবিত করার সম্মতি দিলেন গান্ধীজী। সেই দিনই (৫ই এপ্রিল) এই সম্পর্কে তিনি ডাঃ আন্সারির নামে যে পত্র লিখিলেন, তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হইল। পত্রের সারমর্ম এই যে—কংগ্রেসী নেতৃগণের মধ্যে যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন না, অথচ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁহারা দেশের কল্যাণসাধনার্থ ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে পারেন। পত্রের শেষাংশে গান্ধীজী লিখিয়াছেন :—এই দলের কার্যে সাহায্য করিতে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিব। আমার ক্ষমতায় যতটা সাহায্য করা

সম্ভবপর, আমি ততটা সাহায্যই করিব। "I shall be at the disposal of the party at all times and render such assistance as it is in my power to give." অতঃপর ডাঃ রায় স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে এক বিবৃতি প্রচার করেন। ৭ই এপ্রিলের সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই বিবৃতি হইতে জানা যায়—স্বরাজ্য দলকে পুনর্বার উজ্জীবিত করার কথা রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গারই প্রথম বলেন এবং ডাঃ রায়ের সঙ্গে তিনি প্রথমে সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। ইহার কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তারপর ডাঃ রায় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ওই সম্পর্কে ডাঃ আন্সারির সহিত আলোচনা করেন। উভয়ে স্থির করিলেন নয়া দিল্লীতে আগামী মার্চ (১৯৩৪ খ্রীঃ) মাসের শেষে একটা ঘরোয়া কনফারেন্স ডাকিবেন। তৎপূর্বে ডাঃ রায় গান্ধীজীর সঙ্গে ১৮ই মার্চ পাটনায় সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইল। গান্ধীজী বলিলেন যে, তিনি তাঁহার আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যক্রম পরিবর্তন করিবেন না, তবে গঠনমূলক কার্যক্রম সমর্থন করিবেন; গান্ধীজীর মতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া কাজ করাও গঠনমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

দেখা যাইতেছে—ডাঃ রায়ই প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া স্বরাজ্য দলকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তিনি প্রয়াসী হইয়া কাজে না নামিলে এত সহজে ও এত সত্বর ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি গৃহীত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার ওই প্রচেষ্টা হইতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁহার আস্থা কিরূপ দৃঢ়। কনফারেন্স ডাকিবার পূর্বেই তিনি গান্ধীজীর সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়া নিয়াছিলেন, যদিও তৎকালে তিনি তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন নাই। ডাঃ রায়ের রাজনীতিক জীবনে গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতি তাঁহার অবিচলিত আনুগত্যের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছে। আমাদের মতে, ওইরূপ আনুগত্যের প্রধান কারণ এই যে,—গান্ধীজী ভারতের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় নেতা হইয়াও নিজের মত এবং পথকেই গোঁড়ার মতো আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেন না; যুক্তিসঙ্গত মনে হইলে তৎস্থলে অপরের মত এবং পথকেও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেন। কোন প্রকার পূর্বধারণার বশবর্তী না হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অপরের যুক্তিকে যাচাই করিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল সেই মহানায়কের। ওই দুর্লভ গুণ বিধানচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল,—এইরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ-লাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যক্রম পারবর্তিত করিলেন না সত্য, কিন্তু দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় তাহা স্থগিত রাখিলেন। পাটনায় অবস্থানকালেই তথা হইতে ৭ই এপ্রিল (১৯৩৪ খ্রীঃ) ওই সম্পর্কে তিনি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি পাঠাইলেন। ৮ই এপ্রিলের সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন যে,—স্বরাজের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হইল ; এবং কংগ্রেসপন্থীগণকে বলিলেন, তাঁহারা যেন জাতিগঠনাত্মক কার্যাবলীতে, সাম্প্রদায়িক ঐক্য সাধনে এবং অস্পৃশ্যতা অপসারণে সময় নিয়োগ করেন। পূর্বোক্ত ঘোষণায় প্রায় চার মাস পরে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বেনারসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিল সর্দার বল্লভভাই পেটেলের সভাপতিত্বে। ২৭শে জুলাই হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইয়া ৩০শে জুলাই সমাপ্ত হইল। মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, আবুল কালাম আজাদ, যমুনা লাল বাজাজ, জয়রাম দৌলতরাম, কে. এফ. নরিম্যান, সর্দার শার্দুল সিং, মাধব শ্রীহরি আনে প্রভৃতি নেতৃবর্গ অধিবেশনে যোগদান করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীরাজাগোপালাচারিয়া বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সাধারণ কর্মসচিবদ্বয় ভুলাভাই দেশাই এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। পূর্বোক্ত চার জন নেতাই ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ সম্পর্কে পাঁচ ঘণ্টা আলোচনা চলিল। কংগ্রেস ইতঃপূর্বে সেই রোয়দাদের বিরোধিতা করে নাই কিংবা সমর্থনও করে নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং মাধব শ্রীহরি আনে ওই নীতির বিপক্ষে ছিলেন। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় পূর্বোক্ত নীতি মানিয়া চলা সমীচীন, ইহাই নীতির সমর্থকগণ মালব্যজী ও আনেজীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মতের কোন পরিবর্তন ঘটিল না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডাঃ আন্সারি, ডক্টর আলাম, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইতঃপূর্বে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বোম্বে অধিবেশনে যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল, তাহা কোনরূপ পরিবর্তিত হইল না। ওয়ার্কিং কমিটিতে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য থাকায় কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ্ গ্রহণও করিতে পারে না কিংবা বর্জনও করিতে পারে না।

মালব্যজী এবং আনেজী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য-পদে ইস্তফা দিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ্ সম্পর্কে কংগ্রেসের গৃহীত না-গ্রহণ না-বর্জন নীতির প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় আইনসভার পরবর্তী নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'কংগ্রেস ন্যাশান্যালিস্ট্ পার্টি' নামে একটি দল গঠন করেন। ৩০শে জুলাই ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হইল। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড এবং ওয়ার্কিং কমিটির একটি যুক্ত অধিবেশনও বসিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যগণকে তাঁহাদের কার্যে তাঁহার পূর্ণ সমর্থনের আশা দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই উপদেশও প্রদান করেন যে, পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্যের উপর যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব বিস্তারিত না হয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচন ওই বৎসরেই নভেম্বর মাসে। ডাঃ রায় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অন্যতম কর্মসচিব (সেক্রেটারী) রূপে সেইজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। বাংলা দেশের জনমত কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ্-সংক্রান্ত নীতির বিরোধী ছিল। এমন কি কংগ্রেস-পন্থীদিগের মধ্যেও অনেকে কংগ্রেসের অনুসৃত না-গ্রহণ ও না-বর্জন নীতির বিরোধিতা করিয়াছেন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ডাঃ রায়কে নির্বাচন অভিযান চালাইতে হইয়াছিল। তিনি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্মে তোমার অধিকার, ফলে কোন অধিকার নাই—গীতার ওই শাশ্বতী বাণী ডাঃ রায়ের কর্মজীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিলে হয়তো ভুল হইবে না। অক্টোবর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ইত্যাদি শহরে এবং নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা শহরে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকার্য উপলক্ষে গমন করেন। প্রত্যেকটি শহরে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দেন। প্রচারকার্যে ডাঃ রায়ের সহকর্মী-রূপে আমরাও তাঁহার সঙ্গে ওই সমুদয় স্থানে গিয়াছিলাম এবং চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার জনসভা ব্যতীত অন্যান্য জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছিলাম। চট্টগ্রামে বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার রায়চৌধুরী ভ্রাতৃগণের (শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও

৺বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর) এবং সেই পরিবারের তরুণ কংগ্রেস-সেবক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ রায় চট্টগ্রামে ছিলেন বার-তের ঘণ্টা, তথায় তিনি রায়চৌধুরী পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কয়েকটি রোগী দেখিবার আহ্বান আসিলে তিনি দর্শনী ও সময় নির্ধারণ ইত্যাদির ভার দিলেন সুধীনকে। দর্শনী বা ফী বাবত প্রাপ্ত সমস্ত টাকা (৮০০৲) তিনি তাহাকে দিয়া আসিলেন কংগ্রেসের নির্বাচনকার্যের আংশিক ব্যয়নির্বাহের জন্য।

৮ই নভেম্বর অপরাহ্ণে যাত্রামোহন হলে চট্টগ্রাম-শহরবাসীগণের এক বিরাট জনসভায় ডাঃ বিধান রায় বক্তৃতা দিলেন। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ জে. কে. ঘোষাল। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা-সংক্রান্ত কংগ্রেস-নীতির বিরোধীদল সভায় গোলযোগ সৃষ্টির দ্বারা ডাঃ রায়ের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতে থাকেন। বক্তৃতা বন্ধ হইল না দেখিয়া বিরোধীপক্ষের কিছুসংখ্যক যুবক ডাঃ রায়কে লক্ষ্য করিয়া ঘুঁটে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। ডাঃ রায়ের পার্শ্বের চেয়ারে আমরা উপবিষ্ট ছিলাম। ঘুঁটে ছুঁড়িয়া মারার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা উঠিয়া দাঁড়াই। ক্ষণকালের জন্য ডাঃ রায় বক্তৃতা বন্ধ করেন এবং গোলযোগকারী যুবকদের লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে যাহা বলিলেন, তার সারমর্ম এই—এমনি করে আমাকে ঘুঁটে ছুঁড়ে মারলেই আমি ভয়ে পালিয়ে যাব না। ঘুঁটে কেন, পাথর ছুঁড়ে মারলেও যাব না। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনসভা ডাকা হয়েছে, সকলের সম্মতিতে এখানকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর আহ্বানে আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের তরফ থেকে বক্তৃতা দিচ্ছি। এ আমার ন্যায্য অধিকার। তাতে জোর-জবরদস্তি করে বাধা দিলেই আমি হটে যাচ্ছি না। নির্বাচনের পূর্বে সমস্ত দলই জনসাধারণের কাছে নিজ নিজ ব্যক্তব্য বলে থাকেন। আধুনিক যুগে সকল সভ্য দেশেই এ নীতি মেনে চলা হয়। যাঁরা এ নীতি লঙ্ঘন করেন কিংবা করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা গণতন্ত্রের শত্রু। ওই সতেজ ও সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে সুফল ফলিল। গোলযোগ বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পর ডাঃ রায় বিনা বাধায় অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। উল্লিখিত স্থানগুলি ব্যতীত বাংলার আরও কয়েকটি স্থানে তিনি কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার-কার্য চালাইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করিতে পারে নাই।

বিংশ অধ্যায়

প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি-পদে

১১ই অক্টোবর (১৯৩৪ খ্রীঃ) কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য সদস্যগণের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হইলেন ১১৩-৮৬ ভোটে। সুভাষচন্দ্র বসু তখন ইউরোপে অবস্থান করিতেছিলেন; ইহা সত্ত্বেও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁহার নাম ডাঃ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে প্রস্তাব করেন। তৎপূর্বে প্রস্তাব করা হইয়াছিল ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের নাম, কিন্তু তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সম্মত হন নাই বলিয়া তাঁহার স্থলে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হয়। ডাঃ বিধান রায়ের নাম প্রস্তাব করেন রাজসাহীর সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র এবং সমর্থন করেন মৌলবী জালালুদ্দিন হাসেমী। সহসভাপতি নির্বাচিত হইলেন সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র এবং গাইবান্ধার মৌলবী মহিউদ্দিন। শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় এবং কিরণশঙ্কর রায় যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। পরবর্তী দিবসের (১২ই অক্টোবর তারিখের) সংবাদপত্রে পূর্বোক্ত নির্বাচনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একটিকে ডাঃ বিধান রায়ের দল এবং অন্যটিকে সেনগুপ্তের দল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে ডাঃ রায়ের সম্মতি না লইয়া এবং তাঁহাকে পূর্বে না জানাইয়া সভাপতি নির্বাচন করা হইয়াছিল। তবে তিনি সেই পদ গ্রহণে আপত্তি করেন নাই। অতঃপর ডাঃ রায় যথাসময়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইলেন; এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও তাঁহাকে সদস্য মনোনীত করা হইল।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচনকালে শরৎচন্দ্র বসু কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। নির্বাচনের সময় নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই ডাঃ রায় কারাগারে শরৎবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শরৎবাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি নির্বাচন-প্রার্থী হইলেন কংগ্রেস ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে এবং জয়লাভও করিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহার কারামুক্তি হইল। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 'বিগ্ ফাইভ্' বা বৃহৎ পঞ্চকের এক বৈঠক বসিল। একাধিক বিষয়ে শরৎবাবুর সহিত অবশিষ্ট চার জন ডাঃ বিধান-

রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী এবং নলিনীরঞ্জন সরকার একমত হইতে পারেন নাই। ওই দিন 'বিগ ফাইভ্'-এর জোট ভাঙ্গিয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ভবিষ্যতে পুনর্মিলন হইল না। বাংলা দেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে দলাদলি জোরালো হইয়া উঠিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মতানৈক্য অধিকতর প্রবল হইল। প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচন উপলক্ষে দলাদলি ও মতবিরোধ বাড়িয়া গেল। প্রার্থী মনোনয়নের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্য হইতে ডাঃ রায়, শরৎচন্দ্র বসু এবং আরও দুই জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। ডাঃ রায় কমিটির চেয়ারম্যান (সভাপতি) নির্বাচিত হইলেন। কিঞ্চিদধিক দুই শত প্রার্থীর মনোনয়ন লইয়া কোন মতান্তর ঘটে নাই। গোলযোগের সৃষ্টি হইল চারজন প্রার্থীর মনোনয়ন সম্পর্কে। সভাপতির কাস্টিং-ভোটে সেই চার জন প্রার্থী মনোনয়ন পাইলেন। কিন্তু শরৎবাবু কমিটির সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নিকট উহার পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেন। বোর্ড আদেশ দিলেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় অবশিষ্ট চার জন প্রার্থীর মনোনয়ন-কার্য সম্পন্ন হউক। তদনুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সাধারণ সভার অধিবেশন বসিল। ডাঃ রায়ের কাস্টিং ভোটে যে চার জন মনোনয়ন পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই ওই অধিবেশনে পুনরায় মনোনীত হইলেন। সাধারণ সভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত শরৎ-বাবুর প্রতিকূলে যাওয়ায় তিনি তাহা মানিয়া নিতে রাজী হইলেন না। তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট আবেদন করেন। ওয়ার্কিং কমিটির মতে বিষয়টি আপস-মিটমাট করিয়া দেওয়া উচিত। সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেসকে নির্দেশ দিলেন—উভয়পক্ষ হইতে দুই জন করিয়া আপস মনোনীত করার বিষয় যেন পুনর্বিবেচনা করা হয়। সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের পরে ওইরূপ নির্দেশ দান ডাঃ রায়ের মতে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। সেই কারণে তিনি মনোনয়ন কমিটির সদস্য-পদে ইস্তফা দিলেন। প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচন-অভিযান পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইল শরৎবাবুর উপর।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইল। জনাব মৌলবী ফজলুল হক বাখরগঞ্জ জেলায় নিজের গ্রামাঞ্চলে নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইলেন। তৎকালে তিনি ছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির

নেতা। সেই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস হক সাহেবকে সমর্থন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার পার্টির পক্ষ হইতে কংগ্রেস পার্টির নেতা শরৎচন্দ্র বসুর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, বাংলায় কংগ্রেস-পার্টির সঙ্গে মিলিয়া তিনি মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠন করিতে প্রস্তুত আছেন। শরৎবাবু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। হক সাহেব এইরূপ প্রস্তাবও করিলেন যে, শরৎবাবু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী এপ্রিল মাসের অধিবেশনে অনুমোদনসাপেক্ষে যদি সম্মতি দেন, তাহা হইলেও তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু শরৎবাবু তাহাতেও রাজী হইলেন না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। তবে এইরূপ শর্ত দেওয়া হইল,—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আশ্বাস পান যে, কংগ্রেসীদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রী-পরিষদ্‌কে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইবে, তাহা হইলে কংগ্রেস শাসন-কার্যের দায়িত্ব লইবে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের বড়লাট পূর্বোক্তরূপ আশ্বাস দিলে অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসী দল মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠন করিয়া শাসনকার্যের দায়িত্ব লইল। কিন্তু ইতোমধ্যে জনাব মৌলবী ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলিয়া মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠন করিলেন। সুতরাং বাংলায় মুস্‌লিম লীগের হাতেই শাসনভার চলিয়া গেল।

রাজনীতিক কার্যের চাপ কমিয়া যাওয়ায় ডাঃ রায় চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অধিকতর সময় ও শক্তি নিয়োগ করার সুযোগ-সুবিধা পাইলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বেশির ভাগ সময়ই কাটিল চিকিৎসা-ব্যবসায়ের কার্যে। কেবল কলিকাতা মহানগরীতে তিনি সেই কাজে নিযুক্ত থাকেন নাই, ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে চিকিৎসার কার্যে তাঁহার আহ্বান আসিতে লাগিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা পৌরসঙ্ঘ (কর্পোরেশন), বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে কাজ করিয়াছেন, তৎ-সমুদয়ের বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কার্যের সঙ্গে ডাঃ রায়ের তেমন কোন সম্বন্ধ ছিল না। তখন বাংলাদেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে দলাদলি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করাই ছিল ইহার প্রধান কারণ। মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়ন পাইয়া তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু পরের বৎসর (১৯৩৯ খ্রীঃ) তিনি গান্ধীজীর মনোনয়ন ব্যতীতই ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার সঙ্গে সভাপতির পদের জন্য

প্রতিযোগিতা করিলেন এবং তাহাতে জয়ী হইলেন। তজ্জন্য কংগ্রেস উচ্চ নেতৃমণ্ডলের ('হাই কমাণ্ড্'-এর) সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিল। সেই বৎসর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। ওই উপলক্ষে গান্ধীজী কলিকাতায় আসেন এবং সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানের ভবনে বাস করেন। ডাঃ রায় তথায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদ গ্রহণ করিতে বলেন। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে দলাদলি প্রবল থাকায় তিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদান করিতে অনিচ্ছা জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর কথা অমান্য করিতে পারেন নাই। পুনরায় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রায়ের উপর একটা দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার আসিয়া পড়িল। তিনি অল্-ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সভাপতির কর্তব্যকার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সময় নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। তিনি সেই পদে ১৯৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তোলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইল দ্বিতীয় মহা বিশ্ব-যুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নীতিরও পরিবর্তন ঘটিল। তদানীন্তন ভারত সরকারের বিঘোষিত যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও নীতির সহিত কংগ্রেস একমত হইতে পারিল না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে আইন-সভাগুলি বর্জনের নীতি গৃহীত হইল। যে দুইজন সদস্য সেই নীতির বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ রায় একজন। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদে ইস্তফা দিলেন। কমিটির অধিবেশনের পরে ওই সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হইল। তিনি যুক্তি ও দৃঢ়তার সহিত আপন অভিমত ব্যক্ত করিলেন। ডাঃ রায় বলেন যে, ওই যুদ্ধ সর্বব্যাপক বলিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকার উপায় নাই, কোন-না-কোন ভাবে সকলকেই উহাতে জড়াইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে জাতীয় অগ্রগতি সাধনের জন্য যতটা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভবপর হয়, ততটাই সদ্ব্যবহার করা দেশবাসীর পক্ষে সমীচীন। তাঁহার মতে যুবকগণকে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য গবর্নমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করা জননায়কগণের উচিত; তবে এইরূপ শর্ত রাখিতে হইবে যে, সামরিক শিক্ষা-সমাপনান্তে যুবক-বাহিনীর পরিচালনাভার

ন্যস্ত করা হইবে এমন একটি জাতীয় পরিচালক-সঙ্ঘের উপর,—যাহা গঠিত হইবে দেশবাসীগণের দ্বারা। কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃমণ্ডলী ডাঃ রায়ের মত সমর্থন করিলেন না। নূতন ওয়াকিং কমিটি গঠিত হইল মওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে। ডাঃ রায় মওলানা সাহেবকে কমিটি গঠনের পূর্বেই অনুরোধ করিলেন—তাঁহাকে যেন সদস্য মনোনীত না করা হয়। ১৯৪০ এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের কার্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকার সামরিক বিভাগের জন্য চিকিৎসা-বাহিনী গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করেন। সেই বিষয়ে কর্তব্য স্থির করার জন্য তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করিলেন। ভারতসরকারের অনুরোধ রক্ষা করিতে গান্ধীজী ডাঃ রায়কে সম্মতি দিলেন। ডাঃ রায়ের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ভারতসরকার চিকিৎসক-বাহিনী গঠন করেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় চিকিৎসক-বাহিনীর যে সকল ন্যায্য দাবি পূরণ করা হয় নাই, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ডাঃ রায়ের চেষ্টায় সেই সমুদয় পূরণ করা হইল। কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা সুসম্পন্ন করার জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করা ডাঃ রায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চিকিৎসক-বাহিনী গঠনের কার্য ভারতসরকার দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেন—ডাঃ রায়ের মতো একজন বিচক্ষণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও জনপ্রিয় নেতার সাহায্যে ও সহযোগিতায়। ভারতসরকার সেইজন্য তাঁহাকে উচ্চ প্রশংসা জানাইয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে ভারতের পক্ষ হইতে মালয়ে প্রেরিত মেডিকেল মিশন ডাঃ রায়ের অন্যতম জনকল্যাণকর প্রশংসনীয় কার্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মালয় ভ্রমণান্তে ভারতে ফিরিয়া আসেন। চিকিৎসক এবং ঔষধাদির অভাবে মালয়ের অধিবাসীগণের দুর্দশা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি ডাঃ রায়কে অবিলম্বে একটি মেডিকেল মিশন গঠন করিয়া ঔষধাদি ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সহ পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ডাঃ রায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া নেহরুজীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় সেই কঠিন কার্য সমাধা করিলেন। নেহরুজী মেডিকেল মিশন গঠনের জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে আবেদন প্রচার করেন, তাহাতে দেশবাসী আশানুরূপ সাড়া দিয়াছিল। মিশনের সেবাব্রতী সদস্যগণ মালয়ের দুর্গত অধিবাসীগণের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সেবাকার্য সম্পন্ন করিয়া প্রায় সাত মাস পরে ১৫ই আগস্ট

ডাঃ রায়ের অনুমতিক্রমে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা মেডিকেল মিশনের মালপত্রাদি সহ প্রথমে ডাঃ রায়ের ৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাসভবনে উঠিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন না, ছিলেন তাঁহার শিলঙের বাসভবনে। তাঁহারা মালপত্রাদি তথায় রাখিয়া নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান।

পরের দিন ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের তথাকথিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। তখন বাংলাদেশের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল মিঃ সুরাবর্দির নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ মন্ত্রী-পরিষদের উপর। দাঙ্গাকারী মুসলমানেরা ডাঃ রায়ের বাড়ীও আক্রমণ করিয়াছিল। দরজা জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া নীচের তলায় প্রবেশ করে, মালপত্র লুণ্ঠন করে এবং পরে আগুন লাগাইয়া দেয়। ডাঃ রায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুকুমার রায় পুলিসের সাহায্য চাহিয়া পান নাই; পরে তিনি গবর্নরের সেক্রেটারীকে ফোনে জানাইলে প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী হিন্দুগণও দলবদ্ধ হইয়া ডাঃ রায়ের বাড়ী রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হইল। আক্রমণকারী মুসলমানেরা সরিয়া পড়ে। কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদ পাইয়াই ডাঃ রায় শিলঙ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন বিমানযোগে কলিকাতা-শিলঙের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবস্থা ছিল না। ব্যারাকপুর পৌঁছিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় পৌঁছিতে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। তিন সপ্তাহ কাল তিনি অন্যান্য শান্তিপ্রিয় নেতা ও কর্মীদের সহিত মিলিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ডাঃ রায় শত শত নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ করিবার দ্রুত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিপন্ন ব্যক্তিদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। এই সমুদয় কাজ করিতে যাইয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি দেশনায়ক-রূপে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে বিরত হন নাই।

একবিংশ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও বিধানচন্দ্র

কবিগুরুর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিধানচন্দ্রের পিতামাতা অঘোর-প্রকাশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ধর্ম-সাধনায় তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ ও পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষির চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহনের ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্রের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল গভীর। একবার (১৮৮৬ খ্রীঃ জুন) অঘোর-প্রকাশ দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পথে কাসিয়াঙে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রমে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং অন্যান্য ধর্মবন্ধুদের সহিত পতি-পত্নী উভয়ে তথায় উপাসনায় যোগদান করেন। প্রতাপচন্দ্রের উপাসনা তাঁহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহার পরে তাঁহারা মহর্ষির দর্শন পান। সেই বিবরণ প্রকাশচন্দ্রের লিখিত 'অঘোর-প্রকাশ' গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

…"তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তথায় ছিলেন। একদিন তাঁহাকে দেখিতে যাইবার প্রস্তাব হইল। তোমার ইচ্ছা ছিল, সকলের সঙ্গে হাঁটিয়া যাইবে। যখন গৃহ হইতে যাত্রা করা হয়, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অন্যান্য গুরুজনগণ মীমাংসা করিলেন, নারীর পক্ষে পদব্রজে যাওয়া অবিধেয়। তাই তোমাকে ডাণ্ডিতে যাইতে হইল। তাঁহাদের এই আদেশ পালন করিতে গিয়া তোমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তুমি ডাণ্ডিতে চড়িয়া কিছুদূর গিয়া পরে হাঁটিয়া চলিলে। মহর্ষির উজ্জ্বল ভাব, তাঁহার উৎসাহ ও আমাদের প্রতিজনের প্রতি সম্ভাষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলে। আমাকে তোমাদের রাখিয়া কিছু আগেই মতিহারী চলিয়া আসিতে হইল। তোমরা ২২শে জুন ফিরিয়া আসিলে।"…

মহর্ষির তিরোধানের (১৯০৫ খ্রীঃ জানুআরি) পরে ভক্ত প্রকাশচন্দ্র একবার শান্তি-নিকেতনে যাইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত 'অঘোর পরিবার' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাবধি সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি পূজনীয় অতিথিকে স্বাগত জানাইলেন সশ্রদ্ধ সমাদরে। আতিথেয়তা বিদগ্ধ ঠাকুর পরিবারের বৈশিষ্ট্য। ইহাও তিনি জানিতেন যে, পূজ্যজনের পূজার ব্যতিক্রম

হইলে অমঙ্গল হইয়া থাকে—'প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।' সুতরাং তদ্বিষয়ে কবিগুরুর পক্ষে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে নাই। প্রকাশচন্দ্র পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি-পূত শান্তি-নিকেতনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের সহিত কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নির্মল আনন্দ উপভোগ করেন। কবিগুরু ছিলেন প্রকাশচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ; উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় চৌদ্দ বৎসর। প্রকাশচন্দ্র তাঁহাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

গুণগ্রাহী ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সহিত অঘোর-পরিবারের যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, বিধানচন্দ্র তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। বরং তিনি উহাকে আরও ঘনিষ্ঠ এবং গাঢ় করিয়া তুলিলেন। লোকাতীত প্রতিভার অধিকারী বিশ্ববরেণ্য কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ গুণগ্রাহিতায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রতিভাশালীর প্রতিভা এবং গুণীজনের গুণ তাঁহার নিকট হইতে উপযুক্ত সমাদর পাইত। বিধানচন্দ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরূপে যে প্রতিভার পরিচয় দেন, অধ্যাপকরূপে যে সুখ্যাতিলাভ করেন, জনসেবকরূপে বিবিধ জনসেবার ক্ষেত্রে নিরলস ও নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যেভাবে লোকপ্রিয় হন এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কর্মকুশলতা, আদর্শ-নিষ্ঠা ও সৎসাহসের বলে অল্পকাল মধ্যে যে সম্মান ও মর্যাদা পান, তাহা কবিগুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিধানচন্দ্র ধন্য হইলেন—রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পাইয়া।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের (১৯২৫ খ্রীঃ, ১৬ই জুন) পরে তাঁহার অন্তিমশয্যায় শায়িত অবস্থার ফটো তোলা হয়; এবং উহার উপরে কবিগুরু তাঁহার রচিত চার ছত্রের ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী কবিতা স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া স্বাক্ষর করেন। দেশবন্ধুর স্মৃতি-রক্ষা কমিটির পক্ষ হইতে ওই আলোকচিত্রের ব্লক করাইয়া মুদ্রিত প্রতিলিপির ব্যাপকভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছবি বিকাইয়া যায় এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন' ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। স্মৃতি-রক্ষা কমিটির পক্ষে অর্থ-সংগ্রহের জন্য ওই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্যোগী হইয়া। সেই সম্পর্কে স্বনামখ্যাত শিক্ষাব্রতী, অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বর্তমান জীবনী-লেখককে গত ১৪. ৫. ৫৭. তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আমার শুধু একটা ঘটনা জানা আছে, বলিতেছি।

চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গিয়েছেন। তাঁর একটা ছবি নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় কবির কাছে গিয়ে বললেন,—

এর উপর একটা কবিতা লিখে দিন।

ডাক্তার, এতো প্রেস্‌ক্রপশন করা নয়, কাগজ ধরলে আর চট্‌চট্‌ করে লেখা হয়ে গেল।

বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছবির উপর সেই অপূর্ব কবিতাটি লেখা হল,—

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।

আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ভবদীয়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য"

ডাঃ বিধান রায়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে কবিগুরুর যথেষ্ট আস্থা ছিল। সেইজন্য তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে স্বর্গীয় ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গে বিধানচন্দ্রকেও ডাকা হইত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর কবিগুরু বিসর্প রোগে (Erysipelas-এ) আক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হন। ডাঃ সরকার এবং ডাঃ রায়কে ডাকা হইল তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার জন্য। ওই কঠিন ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকগণ যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় তাঁহার অবস্থা বিপজ্জনক হতেই পারে নাই। দিনদশেক রোগ-যন্ত্রণা ভোগের পরে কবিগুরু নিরাময় হইলেন।

প্রায় তিন বৎসর পরের (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে) কথা। কবি গেলেন কালিম্পঙে বায়ু পরিবর্তনের জন্য। সেখানে তিনি সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্মসচিব শ্রীঅনিল চন্দ ও শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলিকাতা হইতে তিনজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমিয় বসু, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র এবং ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকারকে সঙ্গে লইয়া কালিম্পঙে পৌঁছেন ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে।

পূর্বোক্ত তিন জন ডাক্তার এবং দার্জিলিঙের সিভিল সার্জন কবিগুরুকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, অবিলম্বে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে কবিগুরু বৃক্ক-পীড়ায় (Kidney trouble-এ) ভুগিতেছিলেন। সেই দিনই পূর্বোক্ত তিন জন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। পরদিবস রবিবার (২৯শে সেপ্টেম্বর) কবিগুরু রোগার্ত দেহে শয্যাশায়ী অবস্থায় কলিকাতায় পৌছেন। তাঁহাকে য়্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে করিয়া তাঁহার জোড়াসাঁকো বাসভবনে আনা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে পরীক্ষা করেন; এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ডাঃ পি. এন. রায় এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তীও কবিগুরুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অতঃপর চিকিৎসক তিন-জনের মধ্যে আলোচনা হইল। তাঁহারা একমত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার কোন প্রয়োজন হইবে না। বিধানচন্দ্র প্রত্যহ একাধিকবার কবিগুরুকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহার উপদেশমতো প্রতিদিন রোগীর অবস্থা সম্পর্কে বুলেটিন প্রচারিত হইত। তৎকালে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন নয়া দিল্লীতে। তিনি গুরুদেবের অসুখের সংবাদ পাওয়ার পর হইতে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাইতে-ছিলেন। তাঁহার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে শুনিয়া গান্ধীজী স্বস্তি-বোধ করিলেন। মহাত্মাজী তাঁহার কর্মসচিব মহাদেব দেশাইকে কলিকাতায় পাঠাইলেন গুরুদেবের নামে একখানি পত্র দিয়া। তখনও কবিগুরুর শয্যাগৃহে কোন দর্শনার্থীকে যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু ওই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল মহাদেব দেশাইর বেলায়। গুরুদেবকে লিখিত পত্রখানি এই :—

Delhi, Oct. 1.

"Dear Gurudev,

You must stay yet a while. Humanity needs you. I was pleased beyond measure to find that you were better. With love,

Yours

M. K. Gandhi"

পত্রের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল :—

দিল্লী, অক্টোবর ১

প্রিয় গুরুদেব,

আপনাকে আরও কিছুকাল অবশ্যই থাকিতে হইবে। বিশ্বমানব

আপনাকে চাহিতেছে। আপনি পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন জানিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই। আমার প্রীতি জানিবেন। ভবদীয়

এম. কে. গান্ধী

কয়েক সপ্তাহ রোগে ভুগিয়া গুরুদেব ভগবৎ-কৃপায় ডাঃ বিধান রায়ের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রতিদিনই তাঁহার জ্বর হইতে থাকে। তিনি পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণ কর্রিতে পারিতেন না; এবং দিনের পর দিন তাঁহার দুর্বলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চিকিৎসার সময়োপযোগী ব্যবস্থার জন্য কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের পরামর্শ নেওয়া হয়। স্থির হইল প্রথমে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করা হইবে। ১লা জুলাই কলিকাতার স্বনামখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে গেলেন। তিনি ১০ই জুলাই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বেশ কাজ করিয়াছে। কিন্তু ১৩ই জুলাই কবিগুরুর অসুস্থতা পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। সেই দিন ওই সংবাদ পাইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন। ২৬শে জুলাই কবিগুরুকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা হইল; ৩০শে জুলাই চিকিৎসকমণ্ডলীর উপদেশমতে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইল। মূত্রাশয়ের (bladder-এর) অসুখের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন কলিকাতার নিম্নলিখিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ:—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জি, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র, ডাঃ ইন্দু বসু, ডাঃ অমিয় সেন, ডাঃ দীননাথ চ্যাটার্জি এবং ডাঃ কে. সি. মুখার্জি।

অস্ত্রোপচার সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হওয়ায় পরবর্তী দুইটি দিন কবিগুরুর অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। তৎপর তাঁহার অবস্থা অবনতির দিকে যাইতে থাকে। চিকিৎসকগণের বিশ্রাম ছিল না। তাঁহাদের আপ্রাণ পরিশ্রম সত্ত্বেও অবনত অবস্থার গতি রোধ করা যায় নাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁহার সঙ্গী চিকিৎসকগণের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অবধি ছিল না, কেননা তাঁহারা কবিগুরুকে ভারতীয় মহাজাতির অমূল্য সম্পদ বলিয়া জানিতেন। ৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯টার সময়ে কবির অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হওয়ায় তাঁহাকে ইন্‌জেক্‌শন করা

হয়। তারপর ৯টা ১০ মিনিট হইতে তাঁহাকে অক্সিজেন দেওয়া হইতে থাকে। বেলা ১০টায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জি উভয়ে মিলিয়া কবিগুরুকে পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ। ওই দুঃসংবাদ মহানগরীতে প্রচারিত হইয়া গেলে দলে দলে বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবির বাস-ভবনে আসিতে লাগিলেন। অন্তিমশয্যায় শায়িত কবিগুরুর শেষ দর্শন লাভের জন্য দর্শনার্থী ব্যাকুল জনতার সমাগম হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ৮১ বৎসর বয়সে বৃহস্পতিবার (১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ) বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে,—রবীন্দ্রনাথ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসীম ধৈর্য ও অপূর্ব সহনশীলতার সহিত রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন।

কবিগুরুর দেহাবসান হইল বটে, কিন্তু বিধানচন্দ্রের কর্ম-বিরতি হইল না। কেননা উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা রোগী ও চিকিৎসকের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আরও প্রসারিত হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে স্নেহ-প্রীতি এবং শ্রদ্ধাভক্তির মধ্য দিয়া নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনিও অপরাপর জননায়কদের এবং রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজনগণের মতো কর্মব্যস্ত ছিলেন।

ভারত-গগনের জ্যোতির্ময় রবি চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেলেন। সমগ্র দেশ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শোক-জ্বালা প্রশমিত হইলে দেশের গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, বিদ্বজ্জন, জননায়ক, সমাজসেবক এবং অগণিত রবীন্দ্র-ভক্তের মনে এই চিন্তা জাগিল যে,—কবিগুরুর প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে এবং ওই সমুদয়ের কালোপযোগী উন্নয়ন কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে। ওই শ্রেণীর দেশবাসীগণের মধ্যে বিধানচন্দ্র অন্যতম। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের পরে তাঁহার মনে বিশ্বভারতীয়, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ইত্যাদির কথা বেশী করিয়া জাগিতে লাগিল।

প্রায় ছয় বৎসর পরে ভারত-ব্যবচ্ছেদের অভিশাপের সঙ্গে আমরা পাইলাম স্বাধীনতা। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া (১৯৪৮ খ্রীঃ, জানুআরি) বিধানচন্দ্র কবিগুরুর প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। বিধান-মন্ত্রিসভার শাসন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন ইত্যাদিকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দান করা হইতেছে। ডাঃ রায় বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেছেন। বিশ্বভারতী যে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত

হইয়াছে তাহাতে তাঁহার অবদান কম নহে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে ডাঃ রায় যে তথ্যপূর্ণ উপাদেয় ভাষণ দিয়াছিলেন, উহার মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং কবিগুরুর আদর্শের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ভাষণের প্রারম্ভেই কবিগুরুকে প্রণতি করিয়াছেন এই বলিয়া :—

"এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসবে সকলে সমবেত হইয়া সর্বাগ্রে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ ও প্রণাম করি।"

শান্তিনিকেতনের 'পুরাতন ইতিহাস' বর্ণনা করিতে যাইয়া ডাঃ রায় ওই সম্পর্কে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে উদ্ধৃতি দেন। তাহা হইতে জানা যায়—'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে কবির মনে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের তপোবনের কল্পনা জাগিত। ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন :—

"এই কল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মনে এই ধারণা নিশ্চয়ই ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রচলিত শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে সর্বাংশে শুভ নয়। তাঁহার তৎকালীন রচনা ও বক্তৃতা হইতে আমরা একথাও জানিতে পারি, সেই শিক্ষা যে ছাত্রদের মনকে স্ট্যাটিক বা স্থাণু করিয়া দেয়, নূতন সত্য বা তথ্য আবিষ্কারের মৌলিক শক্তি হ্রাস করে এবং আত্মনির্ভরতা নষ্ট করে—এই উপলব্ধিও তাঁহার হইয়াছিল। ইহারই প্রতিকারের জন্য তিনি নগর কলিকাতার কর্মকোলাহল হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে বোলপুরের এই উন্মুক্ত অবাধ প্রান্তরে প্রকৃতির কল্যাণকর পরিবেশে সঙ্গীত শিল্পকারু ও সাহিত্যকলার মধ্য দিয়া দেশের তরুণেরা যাহাতে আত্মস্থ হইয়া ভারতের পূর্বগৌরব ফিরিয়া পায়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন। ভারতীয় ঋষিদের তপোবনের আদর্শে গুরু এবং ছাত্রেরা পরস্পর একাত্ম ও স্থিরচিত্ত হইয়া অধ্যাপন ও অধ্যয়নে নিরত থাকিবেন সেই ব্যবস্থাও তিনি করিতে চাহিলেন; চাহিলেন—অধ্যাপকেরা 'অধ্যয়নকার্যকে যথার্থ ধর্মব্রত স্বরূপে গ্রহণ' করিবেন, 'বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসিবে, এবং 'বালিকারা গোদোহন কার্য সারিয়া কুটীর-প্রাঙ্গণে গৃহকার্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ' দিবে। অতীত ভারতের যে

ইতিহাস আমরা উপনিষদে ব্রাহ্মণে পাই, তাহাতে দেখি এই তপোবন-আশ্রিত শিক্ষায় ছাত্রদের মন জীবনের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কেও সর্বদা জাগ্রত ও জীবন্ত থাকিত। তাহারা অহরহ নিজেদের পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার সাধনা করিত, জগৎ ও জীবনের জটিল সমস্যার সমাধানে তাহাদের চিন্তাধারা গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিত। তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এক দিকে এই আরণ্যক তপোবনের বাণীসম্পদ এবং অন্যদিকে কৃষিজ-খনিজ ও শিল্পজ সম্পদে ভারতবর্ষ তখন এমন খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, আমরা দেখিতে পাই ক্রমে ক্রমে নানা দেশবিদেশ হইতে ভারতবর্ষকে জয় করিবার জন্য উপর্যুপরি অভিযান চলিয়াছে। সেই গৌরবমণ্ডিত যুগে শুধু আধ্যাত্মিক শক্তিতেই নয়, পার্থিব শক্তিতেও ভারত প্রভূত পরিমাণে সম্পন্ন ছিল। সেই ভারতবর্ষ কখন কেমন করিয়া দুর্বিপাকে পতিত হইল, নিদারুণ হীনতার মধ্যে তাহার অধোগতি হইল—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালেই এই সকল প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া থাকিবে। পশ্চিমের ছকে ও ছাঁচে ফেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনে ধিক্কার জন্মাইল। ভারতীয় তপোবনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা ছাড়াও নিজেদের প্রতি আস্থাহীন মানুষদের আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার জন্য কবির মন ব্যাকুল হইল।

"সুখের বিষয়, তিনি তখন একক ছিলেন না। বঙ্গমাতার অনেক কৃতবিদ্য গুণীজ্ঞানী সুসন্তানও বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া লোককল্যাণকর একটা কিছু করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। আমি ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দরুন বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ নবজাগরণের কথা আপনাদের স্মরণ করাইতেছি। আন্দোলন আরম্ভ হইল এই ব্যবচ্ছেদের উদ্দাম প্রতিবাদে। কিন্তু অচিরাৎ এই বিদেশী ও বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। লোকে বুঝিল, এই প্রাণহীন গতানুগতিক শিক্ষাই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শাসনকর্তা স্বয়ং বৈদেশিক, সুতরাং জনমত উপেক্ষিত হইতে লাগিল, যাঁহারা তখন দেশের মুখপাত্র তাঁহারাও শিক্ষায় দীক্ষায় সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবাপন্ন, কাজেই দেশবাসীর ঐকান্তিক আবেদন রাষ্ট্র কর্তৃক সহজেই উপেক্ষিত হইল। দেশের লোক যখন বুঝিল, এই বৈদেশিক শিক্ষার মোহেই প্রধানেরা দেশের দাবি অগ্রাহ্য করিতেছেন, তখন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি পড়িল সর্বাধিক—

অর্থাৎ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানতঃ শিক্ষার আন্দোলন হইয়া দাঁড়াইল। ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, পল্লীতে শহরে আলাপ-আলোচনা বক্তৃতা আন্দোলন চলিতে লাগিল। দেশের তরুণেরা বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলামখানা" আখ্যা দিয়া তাহা হইতে বাহির হইতে চাহিল। আমি নিজে যদিও এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগ দিই নাই, তথাপি এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি নাই এবং এখনও পারি না যে, প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দুর্বল এবং মনুষ্যত্বকে খর্ব করে। সে শিক্ষায় সর্বতোভাবে মনের বিকাশ হয় না, সেই শিক্ষায় মানুষকে যন্ত্রচালিত নির্জীব পুত্তলিকামাত্রে পরিণত করে; যেটুকু তাহারা মুখস্থ করে, সেইটুকুই উদ্গীরণ করে মাত্র, আয়ত্ত ও জীর্ণ করিয়া সেই শিক্ষাকে নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না। স্বদেশী আন্দোলনের আনুষঙ্গিক এই শিক্ষা-আন্দোলনের মধ্যে এই কথাটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, ছাত্রেরা কোনও প্রকারে একটা ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া অর্থোপার্জনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে অর্থাৎ ডিগ্রিটাই লক্ষ্য, শিক্ষাটা নয়। ক্রমে ক্রমে দেশের বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নেতারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতার কথা উপলব্ধি ও স্বীকার করিলেন। তাঁহারা সমবেত হইয়া প্রতিকারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ঠিক ৪১ বৎসর পূর্বে কলিকাতার টাউনহলে বাংলা দেশে একটি আদর্শ জাতীয় বিদ্যামন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আহ্বানে সর্বজনমান্য ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হইল। বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দেশপূজ্য ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় বঙ্গীয় জাতীয় পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবৃতি-শীর্ষক দীর্ঘলিখিত ইংরেজী ভাষণ পাঠ করেন।"

ডাঃ রায়ের সমাবর্তন ভাষণের পূর্বোল্লিখিত অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে,—তিনি সংক্ষেপে শান্তিনিকেতনের অতীত ইতিহাসের কতক বিবৃত করিয়া দেশের শিক্ষার তৎকালীন অবস্থা ও ব্যবস্থার নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কবিগুরুর মত ও পথ যে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে, সে বিষয়েও বক্তা নিঃসন্দেহ। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষণ হইতে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়া ডাঃ রায় বলিতেছেন :—

"আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ উহারও ঠিক চৌদ্দ বৎসর পূর্বে, এমন কি তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও নয় বৎসর আগে, তাঁহার সুবিখ্যাত "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিও সেই ১৫ই আগস্টের (১৯০৭) মহতী সভায় উপস্থিত থাকিয়া "জাতীয় বিদ্যালয়" নামক প্রসিদ্ধ ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াও তাঁহার মনে নূতনতর বৈজ্ঞানিক ও কারুশিল্পসঙ্গত শিক্ষার সহায়তায় ছাত্রদের জীবনযুদ্ধে জয়ী দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনেপ্রাণে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন।...

"শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রথম পর্ব, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ দ্বিতীয় পর্ব, ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের তৃতীয় বা শেষ পর্ব বিশ্বভারতী।"

কবির উক্ত ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্টের ভাষণের মধ্যেই বীজাকারে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাটি কিভাবে ছিল তাহা ডাঃ রায় কবির ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় "এই বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইতে আরও দীর্ঘ তেরো বৎসর সময় লাগিল।" ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১৩২৬) কবি সর্বপ্রথম এইভাবে নাম-প্রস্তাব করিলেন—

"আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।"

"এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

ইহার মাস কয়েক পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই (১৮ই আষাঢ়,

১৩২৬ সাল) আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার প্রায় আড়াই বৎসর পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ ১৩২৮ সাল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে এবং সারা বিশ্বের বহু মনীষীর উপস্থিতিতে কবি সর্বসাধারণের হস্তে তাঁহার বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।"

ডাঃ রায় দেশবাসীকে বিশ্বভারতীর গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং ক্রমবিকাশের কথাও সংক্ষেপে শুনাইলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন :—

"জনসাধারণের হাতে বিশ্বভারতীকে সমর্পণের পর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রায় কুড়ি বৎসর ইহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতির গুণে, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের উদারতায় কবির জীবদ্দশায় ও তাঁহার তিরোধানের পরও এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তবুও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব কি? এই সভায় এমন অনেকে উপস্থিত আছেন; যাঁহারা ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন অথবা এখনও যুক্ত আছেন; যাঁহারা এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেকে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের কাছে আমার এই প্রশ্ন—এখানকার শিক্ষা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কোনও তারতম্য কি তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন? অন্যত্র অবিলম্বিত শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা এখানকার প্রণালী যে উচ্চতর সে ধারণা কি তাঁহাদের মনে দৃঢ়? বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রেরা কি এমন কিছু পাইয়াছেন যাহা অন্যত্র দুর্লভ? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বকবি; তাঁহার ভাব-দৃষ্টিতে যাহা উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এই প্রতিষ্ঠানের যে ভাবী পরিণত রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা হয়তো আমাদের ধারণার অতীত। যে আবেগ এবং উদ্দেশ্য এই বিশ্বভারতী স্থাপনে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল তাহা আজ আমাদের বিচারের বিষয় নয়, যাঁহারা এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের জীবনে ইহা কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—সেই সাক্ষ্যই বিশ্বভারতীর সার্থকতার প্রমাণ দিবে।"

কবি-গুরুর প্রতি বিধানচন্দ্রের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁহার অখণ্ড অনুরাগ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে এই ভাষণের মধ্য দিয়া।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সুভাষচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র বসুর সক্রিয় রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হয় গান্ধী-যুগে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ২৪ বৎসর। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তৎকালে কংগ্রেস নবজীবন লাভ করিতেছিল, সমগ্র ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলিতেছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সুভাষ আই. সি. এস. হইতে পদত্যাগ করেন। সেই বৎসরের মে মাসে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (অনার্স সহ) ডিগ্রি লইয়া জুলাই মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সুভাষের আই. সি. এস. ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্তের সংবাদ প্রচারিত হইলে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে সুভাষ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে ফিরিয়া সুভাষ দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ওই তরুণ দেশসেবককে সস্নেহ সমাদরে গ্রহণ করেন। তদবধি সুভাষ ওই মহানায়কের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিতে থাকেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি স্বীয় আদর্শনিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবল, বিনয়নম্র ব্যবহার ইত্যাদি গুণে বড়-ছোট সকল কর্মীর প্রিয়-পাত্র হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের এমনই আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সকল শ্রেণীর কর্মীই কাজ করিবার জন্য উৎসাহ বোধ করিত। তৎকালে কলিকাতা মহানগরীতে স্থাপিত জাতীয় শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের পদ তিনি গ্রহণ করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদের জন্য নির্বাচন অভিযান চলিল। তৎকালে ওই দলের সমর্থিত ডাঃ বিধান রায়ের পক্ষে কয়েকটি নির্বাচনী-সভায় সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দেন এবং সহকর্মীগণকে লইয়া স্বরাজ্য দলকে জয়ী করিবার জন্য দিবারাত্রি কাজ করেন। সেই বৎসর সুভাষ ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। নির্বাচন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ডাঃ রায়ের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সুভাষের গুণাবলী বিধানচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিল বিশেষভাবে। নানা গুণের অধিকারী প্রতিভাবান তরুণ দেশসেবকের উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি

নিশ্চিন্ত হইলেন। সুভাষচন্দ্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায্য-প্রাপ্য আসনে অধিষ্ঠিত হইবার ব্যাপারে ডাঃ রায়ের নিকট হইতে যে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন পাইয়াছেন, তাহা তিনি কোন দিনই ভুলিয়া যান নাই। সুভাষের প্রতি ডাঃ রায়ের স্নেহ কত গভীর ছিল, তাহা সুভাষ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিও ডাঃ রায়কে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতো শ্রদ্ধা করিতেন। এই বিষয়ে ডাঃ রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সুভাষ রাজনীতিক জীবনে এমন উচ্চাসন পাইবেন, যাহাতে বাংলার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং বাঙালীর দেশসেবায় অবদান, ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মহিমাময় ঐতিহ্য রক্ষা পাইবে।

বিধানচন্দ্র যে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে 'বিগ ফাইভ' অর্থাৎ বৃহৎ পঞ্চকের একজন ছিলেন, তাহা পূর্বেই যথাস্থানে বলা হইয়াছে। দেশবন্ধুর তিরোধানের (১৯২৫ খ্রীঃ ১৬ই জুন) পরে সুভাষচন্দ্র 'বিগ ফাইভ'-এর সমর্থন না পাইলে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহিত প্রতিযোগিতায় কখনও জয়ী হইতে পারিতেন না। শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচরণ গোস্বামী এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ প্রভাবশালী পঞ্চনেতার সমর্থন যে তাঁহার রাজনীতিক জীবনে উত্থানকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। দেশসেবার মধ্য দিয়া বিধানচন্দ্রের সহিত সুভাষচন্দ্রের যে স্নেহ-প্রীতি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা কোনদিনই ছিন্ন হয় নাই। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে (১৯৩৯ খ্রীঃ) সুভাষ কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করিয়া আপন মনোনীত পথ ধরিয়া দেশের সেবা করিতে লাগলেন। এই বিষয়ে সুভাষের সঙ্গে ডাঃ রায় একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর হইল বটে, কিন্তু মনান্তর হইল না। ডাঃ রায়ের স্নেহ হইতে সুভাষ কোন দিনই বঞ্চিত হন নাই।

ডাঃ রায়ের নিজের বসিবার কক্ষে দুইটি প্রতিকৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে। —একটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, অন্যটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় সুভাষ ডাঃ রায়ের কত প্রিয়, কত আদরের।

ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুআরি। সেই দিনটি ছিল ভারতের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সুভাষচন্দ্র যিনি উত্তরকালে 'নেতাজী' বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার

দ্বিপঞ্চাশোত্তর জন্মদিনে (১৯৪৮ খ্রীঃ ২৩শে জানুআরি) ডাঃ রায় কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা আনন্দবাজার পত্রিকার পরবর্তী দিবসের সংখ্যায় নিম্নলিখিত শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"৫২তম জন্মদিনে বিধানের বেতার-বক্তৃতা"

নেতাজী সুভাষ নিজেই একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সকল ধর্মের মিলন-মন্ত্র সুভাষচন্দ্রের জয় হিন্দ্"

সেই ভাষণের মাধ্যমে যে মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা হইতে কতকটা বুঝা যাইবে যে, ডাঃ রায় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কি প্রকার ধারণা পোষণ করিতেন। বেতার-বক্তৃতা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আজ সুভাষের জন্মদিন। একান্ন বৎসর পূর্বে বাংলা মায়ের প্রিয় সন্তান সুভাষ জন্মেছিল। আজ মনে পড়ে তাঁদের কথা যাঁরা এসেছিলেন সুভাষের সাথে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ধ্বনিত করে বললেন—'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং মাতরম্।' আজ মনে পড়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সেই কথা—'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই। আজ বাংলাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই অপূর্ব অভিনব আহ্বান—'ব্রাহ্মণ আমার ভাই'…।

এক শতাব্দী অতীত হোল। বঙ্গভঙ্গের যুগ এলো রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সারা বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীনতার স্বর্ণপ্রদীপ জ্বেলে দিলেন। আজ মনে পড়ে আশুতোষের সেই সিংহনাদ—Give me money in one hand and slavery with other, I despise the offer.—Freedom first, freedom second, freedom always. মনে পড়ে চিত্তরঞ্জনের বাণী—If love for country is a crime I am a criminal.

দেশবন্ধু যখন বাংলার তথা ভারতের রাষ্ট্রগুরু, সুভাষ ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের সেবায় দেশের কাজে। কেমন করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন? তরুণ সুভাষ কতই বা তার বয়স? বাইশ তেইশ বড় জোর—হেলায় সে ইংরেজের দেওয়া সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলা দেশ—শ্রীচৈতন্যের বাংলা, চিত্তরঞ্জনের বাংলা, সুভাষ ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের সেবায়। তাঁর সামনে—

"অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও
জীবনের সর্বস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।

আজ মনে পড়েছে যেদিন সুভাষ ফেরে বর্মা থেকে। শরীর ভেঙেছে, মন কি উন্নত, কি তার উৎসাহ! সুভাষকে তখন খুবই কাছে পেয়েছিলাম, খুবই কাছে দেখেছিলাম, সে বোধ হয় ১৯২৭—১৯২৮ সালের কথা আজ বিশ বছর পরে ছোট একটি কাগজের টুকরোয় এ ক'টি কথা দেখেছি লেখা রয়েছে—'Freedom is life' এ ক'টি কথাই ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবন। সারাজীবন সুভাষ ঐ কথামত কাজই করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে সেকথা লেখা আছে; আজাদ হিন্দ্ ফৌজেও ঐ কথা লেখা ছিল। সুভাষের জীবনের বিভিন্ন ধারার ভেতর আজ আর আমি যাব না; তবে এই কথা অবশ্যই বলবো যে, **সুভাষচন্দ্র নিজেই একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।** অতীতের কাহিনীকেই ইতিহাস বলা হয়; বর্তমানের কাহিনীকে কেউ ইতিহাস বলে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। সুভাষ কালকের মানুষ হলেও ইতিহাসে আদৃত ও পূজিত।

সুভাষ ছিল অনেক গুণের আধার। সুভাষ বহু ভিন্নমতের লোককে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করতে পারতো। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া খণ্ডে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অদ্ভুত সাফল্য তারই জাজ্বল্য প্রমাণ। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খ্রীষ্টান এক সঙ্গে এক লক্ষ্যে এক উদ্দেশ্যে কাজ করেছিল সুভাষের সঙ্গে। **সর্ব ধর্মের লোক নিতে পারে এমন এক মন্ত্রই দিয়েছিল সুভাষচন্দ্র। সে মন্ত্র জয় হিন্দ্! ভারতের জয় হোক।**

এই মিলন-মন্ত্রে সে সকলকে দীক্ষিত করেছিল। এই মন্ত্র ভুললে চলবে না। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ভুলে যেতে হবে আমাদের; ভারতের জয় যাতে হয়, তাই করতে হবে আমাদের সকলকে।

আজ ভারত ভীষণ সঙ্কটের ভেতর দিয়ে চলেছে। দেশের স্বাধীনতা এসেছে; কিন্তু অন্ন নাই, চারিদিকে হাহাকার! তার ওপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কারও ঘর গেছে, কারও বাড়ী গেছে, স্বামী-পুত্র গেছে, মাতাপিতা গেছে,—অনেকের আবার সব গেছে। আজকের এই বিষম

সঙ্কটের দিনে বেশী করে মনে পড়ছে সুভাষের অমর কথা—'Freedom is life'.

আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি এসেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি কই? বিদ্বেষ-বিষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হবো, সুভাষের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারবো।

বাংলাকে গড়ে তোলবার কাজ এসেছে। আমাদের বাংলা ত অভাবের বাংলা নয়; আমাদের বাংলা সুজলা সুফলা, আমাদের সব আছে। শুধু একত্র হয়ে কাজ করা, এক হয়ে এক মনে আমাদের অফুরন্ত সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। আজ বাংলার সম্মিলিত চেষ্টায় অসাধ্য অনায়াসে সাধিত হবে।

সুভাষের জন্মদিবসে বাঙালী যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, আমি তোমাদের বলি এক হও, কাজ কর। এই খণ্ড ছিন্ন ভারতকে এক করে দাও। তোমরা পারবে, তোমাদেরই এ কাজ, তোমরা কর। সুভাষের মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করো। আমি সুভাষের সেই মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনছি—Unite and work ceaselessly, do not resort to fear.

"আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।"

দক্ষিণেশ্বরের অধিবাসীগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তথায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মর্মর-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। মর্মর-মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুআরি সাধারণতন্ত্র দিবসে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়। তিনি প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া পরে নেতাজীর মর্মর-মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে ২৬শে জানুআরির গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা উপস্থিত জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে— কেবল নেতাজীর মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, নেতাজী যেরূপ একাগ্রতার সহিত জন্মভূমির দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ ঐকান্তিক প্রেরণা ও ইচ্ছা লইয়া দেশ সংগঠনের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

ডাঃ রায় ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জাপান যাত্রা করেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর এবং তথা হইতে তিনি

প্রত্যাবর্তন করেন ৭ই অক্টোবর। তাঁহার জাপানে যাইবার কয়েক দিন পরে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ জানাই যে, তিনি রঙ্কোজী মন্দিরে যেন যান এবং বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর কন্যার সঙ্গে যেন দেখা করিয়া আসেন। উভয় স্থানে ফটো তোলার কথাও আমি পত্রে লিখিয়াছিলাম। রঙ্কোজী মন্দিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চিতা-ভস্ম রক্ষিত আছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ডাঃ রায় আমার চিঠি পাইবার পূর্বেই রঙ্কোজী মন্দিরে যাইয়া নমস্কার জানাইয়া আসিয়াছেন। ইহা হইতে নেতাজীর প্রতি তাঁহার স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার, আরও একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি টোকিও নগরের ইম্পিরিয়াল হোটেল হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি ১লা অক্টোবর পাইয়াছি। পত্রের অনুকৃতি (facsimile) পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কর্মবীর বিধানচন্দ্র

বিধানচন্দ্রের মাতাপিতা অঘোর-প্রকাশের জীবন ছিল কর্মময়। দৈনন্দিন জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করিয়াও তাঁহারা পরার্থে অনেক কাজ করিতেন। তাঁহাদের জীবনে কর্মের বিরাম ছিল না। কর্মসাধনা, শিক্ষাপ্রচার, সমাজসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ ও নিরলস কর্মের মধ্য দিয়া পতি-পত্নী উভয়ে যে দাগ কাটিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনদিনই মুছিয়া যাইবে না। বিধানের কর্মানুরাগও যেন উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতে তাঁহার জীবন কর্মব্যস্ত। তখন আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় তাঁহাকে অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহার্থ অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। পঞ্চম অধ্যায়ে ('মেডিকেল কলেজে বিদ্যার্থী বিধান') এবং সপ্তম অধ্যায়ে ('ইংলণ্ডে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিধানের উচ্চতর শিক্ষা লাভ') তৎসম্পর্কে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিদ্যার্থী-জীবনের সমাপ্তির পরে যখন ডাঃ রায়ের কর্মজীবন আরম্ভ হইল তখন তাঁহার কাজও বাড়িতে লাগিল দ্রুতগতিতে। কলিকাতার মতো বিরাট নগরে কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যেও চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তাঁহার পসার হইতে লাগিল। স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইল পরিশ্রমের মাত্রা। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইলেন। নূতন কর্মক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব ও কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সহিত তিনি সংযুক্ত হইলেন। ডাঃ রায়ের বয়স তখন প্রায় ৩৪ বৎসর। তাঁহার নিরলস কর্ম, সুচিন্তিত মতামত এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিবার আগ্রহ সহকর্মীগণের এবং শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় তাঁহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই; কয়েক বৎসর পরে ডাঃ রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সেই দায়িত্বপূর্ণ জটিল কাজও সুসম্পন্ন করিয়া তিনি সেই পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী কার্য ছাড়িয়া বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে (পরবর্তীকালে 'কারমাইকেল মেডিকেল

কলেজ' এবং বর্তমানে 'আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ') অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার কার্য কেবল অধ্যাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; কলেজটিকে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে একটা আদর্শ শিক্ষায়তনরূপে গড়িয়া তোলা যায়, সেই দিকেও তিনি তাঁহার চিন্তা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করিলেন। ভাবীকালে ডাঃ রায় কলেজের পরিচালক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশ করেন রাজনীতিক্ষেত্রে। তৎকালে ডাঃ রায় কলিকাতা মহানগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। চিকিৎসা-ব্যবসায় হইতে তাঁহার প্রচুর আয়, এবং তৎসঙ্গে সুনাম ও খ্যাতি তো আছেই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার কার্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। জনপ্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় কাজ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে চিন্তা ও শ্রম দুইয়েরই আবশ্যক। সেইজন্য ওই দুইটি নিয়োগ করিতে তিনি কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। তৎকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এ. কে. ফজলুল হক প্রভৃতির মতো লোকপ্রিয় নেতৃবৃন্দ সদস্যের আসনে আসীন ছিলেন। বিধানচন্দ্রের যোগ্য পার্লামেণ্টারীয়ান রূপে সুখ্যাতি লাভ করিতে বেশী সময় লাগে নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনগুলির সরকারী বিবরণ পাঠ করিলেই তাঁহার কার্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি বাড়ী হইতে লিখিয়া নিয়া বক্তৃতা পাঠ করিতেন না, উপস্থিত মতে (extempore) বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী সারগর্ভ, তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো হইত। বাজেট অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে যে কয় জন সদস্য বক্তৃতা দিবার জন্য মনোনীত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ রায়ের নাম বরাবরই থাকিত। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপনের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইত।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে আর একটি দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কার্যের ভার ডাঃ রায়কে লইতে হইল। 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন'-এর তিনি একজন ট্রাস্ট্রী বা ন্যাসরক্ষক। তাঁহাকে উহার সেক্রেটারী বা কর্মসচিব নির্বাচন করা হইল। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের সহিত তিনি কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন' যে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ডাঃ রায়ের অবদান রহিয়াছে যথেষ্ট। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল (বর্তমানে কুমুদশঙ্কর যক্ষ্মা

হাসপাতাল) যে ভারতবর্ষে একটি সুপরিচালিত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয় বলিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহার মূলে আছে এই কর্মবীরের সংগঠনী প্রতিভা, সমাজসেবার প্রেরণা, চিন্তা ও শ্রম। ডাঃ রায় অদ্যাবধি সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-পরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ভারতের বিখ্যাত সংবাদ-পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। উহার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি ডিরেক্টার বোর্ডের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দীর্ঘ কাল। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'ফরোয়ার্ড' পরিচালনায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ডিরেক্টার বোর্ডে থাকিয়া। কর্পোরেশন পরিচালনার কর্তৃত্ব কংগ্রেসের হাতে আসিবার পর ডাঃ রায় দুইবার মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং অলডারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন আট বার। তিনি কর্পোরেশনের একুশটি কমিটিতে থাকিয়া কোন-না-কোন কমিটির সভাপতি-রূপে এবং কোন-না-কোন কমিটির সদস্য-স্বরূপ মহানগরীর অধিবাসিগণের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার চারিত্রিক বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা সুসম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া ডাঃ রায় উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল (ভাইস-চ্যান্সেলার)-রূপে কাজ করিয়া কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর ডাঃ রায়ের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল। তিনি কিছুকালের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রূপেও তাঁহার কার্য উল্লেখযোগ্য। কর্মবীর বিধানচন্দ্রের কর্মে বিরাগ নাই, বিরামও নাই। তাঁহার কর্মধারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে বেগবতী নদীর স্রোতের মতো দুর্নিবার গতিতে। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া অবধি তাঁহার কর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অত্যধিক মাত্রায়। তৎসত্ত্বেও তিনি কাজ করিতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না। তাঁহার কাছে কর্মের সফলতায় কিংবা নিষ্ফলতায় কিছু আসিয়া যায় না। কর্মের উদ্দেশ্য যদি দেশের ও দশের সেবা হয়, তবে কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে ফলাফল যাহাই হউক না কেন। ইহা হইল

বিধানচন্দ্রের কর্মজীবনের সারকথা। তাঁহার ৭৫তম জন্মদিনে (১৯৫৬ খ্রীঃ ১লা জুলাই) প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলিয়াছেন ঃ—

…"দেশের ও দশের কাজে জয়-পরাজয়ের কোন মূল্য নাই। চেষ্টা করাই মানুষের জীবনে প্রধান ব্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চেষ্টা করিয়া যদি সফল না হই কোনও ক্ষতি নাই। চেষ্টা তো রহিয়াই গেল। সেই চেষ্টাই মানুষের কর্মশক্তি বৃদ্ধি করিবে। চেষ্টার ভিতর দিয়া যে শক্তি সৃষ্টি হইয়া উঠে, উহা কোন-না-কোন কাজের মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবেই।

"রাজনীতি আমি বুঝি না। এইটুকু জানি আমার সম্মুখে যে কাজ আছে, তাহা সমাধা করিতে হইবে। দেশকে আমি সেবা করিতে চাই। দেশকে উচ্চে তুলিতে চাই। জয়পরাজয় কিছুই নয়। আমার সম্মুখে যে কোন কার্যই উপস্থিত হউক না কেন, প্রথমেই দেখি উহাতে দেশের কিংবা দেশবাসীর উপকার হইবে কিনা। যে কাজ আমাদের দেশের শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে উহাতে আত্মনিয়োগ কবি। আমাদের দেশ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কার্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া অগ্রসর হইলে এক দিকে দেশের দ্রুত অগ্রগতি ও অন্য দিকে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে।"

স্বনামখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে 'অক্লান্ত কর্মোৎসাহ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রতীক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (যুগান্তর—১লা জুলাই ১৯৫৫ খ্রীঃ) তাঁহার ৭৭তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে। 'ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা' তাঁহার 'জীবনের এক অমূল্য সম্পদ' বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার মতে—

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আধুনিক ভারতের প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রতীক। পশ্চিম বাংলার এক দুর্দিনে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উদার বুদ্ধি, আশ্চর্য সংগঠন-সাধনা ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে দেশকে তিনি উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছেন দুর্যোগ থেকে সাফল্যে, দুর্গতি থেকে সমৃদ্ধির সোপানে।"

ওই সম্পর্কে আমরাও তাঁহার সহিত একমত। বিধুবাবুর সুচিন্তিত অভিমতে আমরা কোন অত্যুক্তি দেখিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"বিচিত্র কর্মতরঙ্গে উত্তাল জীবন ডাঃ বিধানচন্দ্রের। শাণিত বুদ্ধি, অপরাজেয় উদ্যম, অক্লান্ত কর্মোৎসাহ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম তাঁকে সার্থক জীবনের বরণমাল্য পরিয়েছে। জীবনে কখনো তাঁর পরাজয় ঘটেনি, এমন

অপরাজেয় ভাগ্য বড় একটা দেখা যায় না। বড়ো বড়ো কাজে যেমন তিনি অপ্রতিহত, ছোট ছোট কর্মেও তিনি সর্বদা অপরাজিত।"

ডাঃ রায়ের কর্মব্যস্ত জীবনের বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহার অকপট গুণগ্রাহী ও প্রবীণ সাংবাদিক লিখিয়াছেন :—

"সকাল আটটায় তিনি সেক্রেটারিয়েট যান। রাত্রি সাতটা পর্যন্ত সমানে চলে কাজের চক্র। ইদানীং অসুস্থতার জন্য মধ্যাহ্নভোজনের পর সামান্য সময় বিশ্রাম করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজের মধ্যে আনন্দ তাঁর জীবনের বিশেষত্ব।

"নানা মানুষ আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। নানা স্থান থেকে আসেন দেশের নানা লোক নানা রকম আবেদন নিয়ে। সবকিছুর ব্যবস্থা করতে হয়—বৈদেশিক সরকারী কর্মচারী আসেন, অন্য প্রদেশের নেতা ও রাজকর্মচারীরা তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাঁর সময় অল্প, এই স্বল্পকালের মধ্যেই সকলের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তাঁদের সকলকে সন্তুষ্ট করতে হয়।

"লোকে বলে সেক্রেটারিয়েটে নাকি 'ফিতে বাঁধা কাজের চক্র'। এ ফাইল থেকে ও ফাইলে যায়। এ দপ্তর থেকে ও দপ্তরে ঘোরে কাজের নির্দেশ। ফলে সবকিছু পেছিয়ে যায়, উচিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে না। ডাঃ বিধানচন্দ্র এই 'ফিতে বাঁধা ফাইল-চক্র' থেকে সরকারী কর্মচালনাকে মুক্ত করতে চান। অনেক সময় দ্রুত কর্মচালনার জন্য ফোনযোগেই তাঁর আদেশ ও নির্দেশ দেন, অর্ডার যথাযথ ফাইলভুক্ত হয়ে আসে পরে।

"পরাধীনতার আমলে সরকার ছিল ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিভূ। আজ স্বাধীনতা-উত্তর দিনে সরকার হচ্ছে জনসাধারণের সেবক। এই সেবা-মনোবৃত্তিটা তিনি সর্বদা সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন সরকারী কর্মস্রোতে।

"বহুবার বিদেশে গেছেন তিনি। যখন বিদেশে গেছেন পরিমুক্ত মন নিয়ে দেখেছেন বিদেশের শিল্প-উন্নয়ন-প্রচেষ্টা। দেশে ফিরে এসে স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন। পশ্চিমবাংলার কতকগুলি উন্নয়ন-প্রচেষ্টা আজ বাস্তবে রূপায়িত অথবা পরিকল্পনাবদ্ধ হয়ে আছে, তার প্রত্যেকটির মূলে আছে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ, তাঁর চেষ্টা, তাঁর নির্দেশ। মাতৃভূমির উন্নতিই তাঁর কর্মযোগের একমাত্র আদর্শ।"

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাংলাদেশে যখনই দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝটিকা ইত্যাদিতে দেশবাসী বিপন্ন হইয়াছিল, তখনই ডাঃ রায় তাহাদের ত্রাণের জন্য নিজের শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে সকল বেসরকারী আর্তত্রাণ কমিটি

গঠিত হইত, তৎসমুদয়ে যোগ দিয়া কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন।

ডাঃ রায়ের সহকর্মীদের মধ্যে সকলেই জানেন যে তিনি দিবারাত্র কিভাবে কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ডাঃ রায়ের কর্মানুরাগ ও কর্মদক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন—"দিনরাত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ডাঃ রায় যেমন পারেন, তেমন আমরা কেউই পারি না। তিনি বাড়ীতে থাকেন কতক্ষণ? সেক্রেটারিয়েটে কাজ নিয়েই তো থাকেন। He has made Secretariat his home. "অমৃতবাজার পত্রিকাতে (১৯৫৬ খ্রীঃ, ২৩শে মে বুধবার) ডাঃ রায়ের কর্মানুরাগ সম্পর্কে একবার একটা ছোট বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশ যে, একদিন (২২শে মে মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে-ছয়টায় তিনি সেক্রেটারিয়েটে আসিয়া কাজ করিতে বসিয়া গেলেন। তখন ঝাড়ুদারদের ঝাঁট দেওয়ার কাজও শেষ হয় নাই। সরকারী দপ্তরখানায় তিনি আসেন সকলের আগে, চলিয়া যান সকলের শেষে। অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টার ওই ব্যাপারটিকে আদর্শস্থানীয় কর্মানুরাগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"Exemplary Love Of Work

(By A Staff Reporter)

He does not go by normal routine—nevertheless the time of the arrival of the Chief Minister Dr. Roy at the Writers' Buildings on Tuesday was a surprise even for those prepared to see him working through his files in odd hours. When the Chief Ministers' car drew under the Secretariat's portico it was half past six in the morning and even the sweepers had not then completed their cleansing. But then, for Dr. Roy often, the first to arrive and last to leave the Secretariat, no hours are odd hours for office work."

ডাঃ রায় যে কর্মবীর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে কর্মযোগী বলিলেই ঠিক হইবে। ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো তিনি তাঁহার কর্তব্যকর্মের মধ্যে সমাহিত হইয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে এমন একনিষ্ঠ কর্মযোগীকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত-ব্যবচ্ছেদের অভিশাপের সঙ্গে আমরা পাইলাম স্বাধীনতার আশীর্বাদ। ভারতের শাসনভার আসিল কংগ্রেসের হাতে এবং পাকিস্তানের শাসনভার গেল মুস্‌লিম লীগের হাতে। নূতন ব্যবস্থায় বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসদলের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পূর্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গান্ধীজীর অনুমতি লইয়া আমেরিকায় যান। চক্ষু-চিকিৎসার জন্য তাঁহার বিদেশে যাওয়া পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন লণ্ডন হইয়া এবং লণ্ডনে দিনকয়েক ছিলেন। তথায় থাকাকালেই ভারতের কয়েকজন উচ্চস্তরের নেতা তার করিয়া ও টেলিফোন যোগে তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলেন স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে এবং পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠনে অংশ গ্রহণ করিতে। তৎকালে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিত্বগ্রহণের কোন প্রকার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং বন্ধুগণকে জানাইয়া দিলেন যে, অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে তিনি অক্ষম। আমেরিকায় পৌছিবার কিছুকাল পরে জুলাই মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ডাঃ রায়কে টেলিফোনযোগে জানাইলেন যে, সংযুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপালের পদে নিয়োগের জন্য তাঁহাকে মনোনীত করা হইয়াছে। তিনি নেহরুজীকে বলিলেন যে, একান্ত প্রয়োজন হইলে পাঁচ মাসের জন্য রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করিতে পারেন। তবে সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে তাঁহার দেশে ফিরিয়া যাওয়া হইবে না, কেননা ওই সময় পর্যন্ত তাঁহাকে চক্ষু-চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকিতে হইবে। ইতোমধ্যে তাঁহার সংযুক্ত প্রদেশে রাজ্যপাল-পদে নিয়োগ ইংলণ্ডের রাজার অনুমোদন লাভ করে এবং সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। তিনি ভারতের বাহিরে থাকায় স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুকে সাময়িকভাবে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করা হইল। ডাঃ রায় ভারতে ফিরিয়া আসিলেন ১লা নভেম্বর। তিনি অবগত হইলেন যে, মিসেস্ নাইডু রাজ্যপালের কর্তব্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন এবং সেই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখী হইয়াছেন। ডাঃ রায় রাজ্যপালের পদে ইস্তফা দিলেন এবং মিসেস নাইডুকে সেই পদে বহাল করা হইল। নয়া

দিল্লীতে ডাঃ রায় মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

নয়া দিল্লী হইতে ডাঃ রায় কলিকাতায় আসিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, ডক্টর ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী রূপে যেভাবে কাজ করিতেছেন তাহাতে কংগ্রেসদলের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে বসাইয়াছিলেন, তাঁহারা ওই অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, ডক্টর ঘোষকে দিয়া পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য চালানো সম্ভবপর হইবে না। তখন পশ্চিমবঙ্গ নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। নোয়াখালী জেলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (১৯৪৬খ্রীঃ অক্টোবর) পরে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু অধিবাসীরা দলে দলে নিজ নিজ বাস্তভিটা ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছিল। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তত্যাগীর সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডক্টর ঘোষের মন্ত্রী-পরিষদ্ সহস্র সহস্র দুর্গত উদ্বাস্তু হিন্দু নরনারীকে আশ্রয় ও সাহায্য দানের কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে জনমত ঘোষ-মন্ত্রীপরিষদের প্রতিকূলে গেল। অপর দিকে কংগ্রেস-বিরোধী কমিউনিস্ট দল এই রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সেই দলকেও তদানীন্তন সরকার দমন করিতে পারিলেন না। যে সকল কংগ্রেস-নেতা ডক্টর ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাইলেন, তাঁহাদের সহিত স্থিরীকৃত শর্তও তিনি অমান্য করেন। এই সমুদয় কারণে তাঁহার প্রতি কংগ্রেসী দলের অধিকাংশের আস্থা লোপ পাইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ডাঃ রায়কে কংগ্রেসীদের মধ্যে অনেকে অনুরোধ করিলেন মন্ত্রী-পরিষদে যোগ দিতে। তৎকালে রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে তাঁহার পুনঃ-প্রবেশের ইচ্ছা ছিল না বলিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। ডিসেম্বর মাসে ডাঃ রায়কে পুনরায় নয়া দিল্লী যাইতে হইল। তথায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিতে যান। শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য-পদ তখনও ত্যাগ করেন নাই। তিনি ডাঃ রায়কে বলেন যে, তিনি শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন, অতএব ডাঃ রায় যেন তাঁহার নির্বাচকমণ্ডলী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) হইতে সদস্য-পদের প্রার্থী হন। ডাঃ রায় তাহাতে সম্মত হইলেন এই শর্তে যে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কারণে শ্যামাপ্রসাদকে যদি কখনও নয়া দিল্লী ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হয়, তবে ডাঃ রায় পদত্যাগ করিবেন এবং শ্যামাপ্রসাদ তাহাতে আপত্তি করিতে

পারিবেন না। তদনুসারে শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিলে ডাঃ রায় সেই পদের প্রার্থী হইলেন। ডিসেম্বর মাসের (১৯৪৭ খ্রীঃ) শেষভাগে তিনি নির্বাচিত হইলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হইবার ফলেই ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ তাঁহাকে মন্ত্রী-পরিষদে যোগদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। ডাঃ রায় এই বলিয়া অসম্মতি জানান যে, শাসনকার্য পরিচালনার ভার নিতে আপাততঃ তিনি ইচ্ছুক নহেন। তবে কোন উন্নয়ন-পরিকল্পনায় তিনি বেসরকারী সদস্যরূপে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাঁহার সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধিবেশন হইবে। ইতোমধ্যে ডক্টর ঘোষের প্রতি অসন্তোষ দানা বাঁধিল। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস পরিষদ্ (পার্লামেন্টারী) দলের আস্থা হারাইলেন। পদত্যাগের জন্য তাঁহার উপর সম্মিলিতভাবে চাপ পড়িল এবং ডাঃ বিধান রায়কে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাইবার জন্য দাবি জানান হইল। ডাঃ রায়ের অজ্ঞাতসারেই ইহা করা হয়। গান্ধীজী নয়া দিল্লীতে অনশন আরম্ভ করিলেন ১২ই জানুআরি হইতে। অনশনকালে অন্যান্য বারের মতো এইবারও ডাঃ রায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেইদিনই তিনি বিমানযোগে নয়া দিল্লী যাইবেন। যাত্রার মিনিট পনর পূর্বে ডক্টর ঘোষ ডাঃ রায়কে ফোনে জানাইলেন যে, কংগ্রেস পরিষদ্ দল তাঁহাকে নেতা নির্বাচন করিয়াছেন; সুতরাং তিনি অবিলম্বে মন্ত্রী-পরিষদ্ (Cabinet) গঠন করিয়া ডক্টর ঘোষকে দায়িত্ব হইতে যেন মুক্ত করেন। ডাঃ রায় বলিলেন যে, দলের পক্ষ হইতে তাঁহাকে তখন পর্যন্ত ওই সম্পর্কে কোন সংবাদ জানান হয় নাই, অধিকন্তু নয়া দিল্লী যাত্রা তিনি কোন অবস্থায়ই স্থগিত রাখিতে পারেন না। নয়া দিল্লী পৌছিবার পরেও একাধিক নেতা তাঁহাকে বারবার ফোনে অনুরোধ করিলেন কলিকাতায় যাইয়া মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠন করিতে। তিনি বলিলেন যে, গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করিয়া সুস্থ হইয়া না উঠিলে যাইতে পারেন না। অনশন ভঙ্গ হইল ১৮ই জানুআরি; পরদিন গান্ধীজী সুস্থ হইয়া উঠিলে ডাঃ রায় তাঁহাকে কংগ্রেস-পরিষদ্ দলের সিদ্ধান্তের কথা জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, ওই দায়িত্ব নিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছুক নহেন। গান্ধীজী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, দলের যখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করা তাঁহার কর্তব্য। তিনি গান্ধীজীর সেই উপদেশ মানিয়া নিলেন।

ডাঃ রায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ডক্টর ঘোষকে এবং কংগ্রেস-পরিষদ্ দলের অন্যান্যকে জানাইলেন যে, তিনি মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন। তবে তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এবং কংগ্রেস-পরিষদ্ দলের নেতৃবর্গকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে দিতে হইবে, নতুবা তিনি কংগ্রেস-পরিষদ্ দলের নেতৃত্ব করার দায়িত্ব নিতে পারেন না। তাঁহারা ওই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নিম্নলিখিত কংগ্রেস নেতৃবর্গকে লইয়া ২৩শে জানুআরি ডাঃ রায়ের মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠিত হইল:—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (মুখ্যমন্ত্রী), প্রফুল্লচন্দ্র সেন. নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, ভূপতি মজুমদার, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, কালীপদ মুখার্জি, বিমলচন্দ্র সিংহ, হেমচন্দ্র নস্কর, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মোহিনীমোহন বর্মন, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এবং নিকুঞ্জবিহারী মাইতি। ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণের নৈরাশ্য বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইল, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু নরনারীর মধ্যে সঞ্চারিত হইল আশা। ভারত-ব্যবচ্ছেদের ফলে বাংলা ও বাঙালীর ক্ষতি হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। অধিকাংশ দেশবাসীর মনে এইরূপ আশা জাগিল যে, ডাঃ রায়ের মতো একজন স্বদেশানুরাগী, স্বজাতিবৎসল, সুদক্ষ, কর্মনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল নেতার শাসনকালে ওই ক্ষতির পূরণ হইবে অনেকাংশে। কংগ্রেসের সমর্থক ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রসমূহ বিধানচন্দ্রকে এবং তাঁহার গঠিত মন্ত্রী-পরিষদ্‌কে অভিনন্দন জানাইল।

ডাঃ রায় মন্ত্রী মনোনয়নেও সততা, দক্ষ ও অন্যান্য গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, তিনি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার পূর্বোক্ত ঘোষণার প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা ২৪শে জানুআরির সংখ্যায় "The New Ministry" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাব ওই ঘোষণা সকলের নিকটই সমাদৃত হইবে; দলনিরপেক্ষ দৃষ্টি তাঁহার শাসনকার্য পরিচালনায় সহায়তা করিবে। "The most welcome announcement of the new Premier is that he dose not belong to any party. This will be helpful to him in as much as it will enable him to maintain a detached attitude for the Government in relation to parties and groups." তাঁহার শাসনকালের বিচার

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি তাঁহার ঘোষিত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। বিধান-মন্ত্রী-পরিষদের শাসনকালে সমস্যা-সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ যে দ্রুতগতিতে নানা দিক দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, ইহার অন্যতম কারণ ডাঃ রায়ের দলনিরপেক্ষ মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে অন্যতম মন্ত্রী মনোনীত করায় অমৃতবাজার পত্রিকা পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে,—অপর মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অনেক বৎসর পর্যন্ত মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্যক্রমকে সফল করিবার জন্য নীরবে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়াছেন। গঠনমূলক কার্যে বাংলার প্রেরণা লাভ একান্ত আবশ্যক। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের অভিজ্ঞতা সংগঠনী কর্মক্ষেত্রে সরকারের অমূল্য সম্পদ হইবে। "The other Minister, Sri Prafulla Chandra Sen, has to his credit many years of silent thought, devoted service to the promotion of the constructive programme of Mahatmaji. Bengal very badly needs initiative in constructive work. The experience of Sri Prafulla Chandra Sen will be an invaluable asset to the Government in the field of constructive activity."

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫শে জানুআরির সংখ্যায় 'নূতন মন্ত্রিসভা' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইতেও কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পশ্চিমবাংলার নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত নূতন মন্ত্রিসভা স্থায়ী হউক, যোগ্যতার পরিচয় দানে সাফল্য লাভ করুক ইহাই আমরা কামনা করি।

"মাস কয়েকের মধ্যেই মন্ত্রিসভার বারকয়েক রদবদল। কেন রদবদল হইয়াছে এবং পরিশেষে ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাই বা ভাঙিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইল, জনসাধারণ তাহা সম্যক অবগত নহেন। ডাঃ রায় মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এক বিবৃতিতে এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাংলা বর্তমানে যে দুর্ভোগ ভুগিতেছে, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি, উপদলগত ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের ফলেই তাহার অধিকাংশ দেখা দিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যাহারা শাসনযন্ত্র পরিচালনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে এই সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আমরা আশা করি মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং তাঁহাদের সমর্থক পশ্চিমবঙ্গীয় আইনসভার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল এই সকল ত্রুটি পরিহার করিয়া চলিতে সক্ষম হইবেন।"

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মনোনীত মন্ত্রিগণের নামের তালিকা রাজ্যপালের নিকট দাখিল করার পর ২০শে জানুআরির সংবাদপত্রে তাঁহার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"দেশের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমার উপর যে দায়িত্ব-ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে আমি বিব্রত বোধ করিতেছি। সতের বৎসর পরে আমি পুনরায় আইনসভায় যোগদান করিয়াছি। কিন্তু উহাতে যোগদানের পরে এত শীঘ্র আমাকে যে এই প্রদেশের শাসনভার বহন করিতে হইবে, তাহা আমার ধারণাতীত ছিল। আমার এই বিব্রত বোধ আরও এই কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, চল্লিশ বৎসর কাল চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর স্বাধীন জীবনযাপন করার পরে এক্ষণে আমাকে একটি প্রদেশের বাঁধাধরা শাসনকার্যের সহিত বদ্ধ হইতে হইবে।

"আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নহি। কোন দল অথবা উপদলের সহিত আবদ্ধ থাকিতে আমি অস্বীকার করিয়াছি। আমি এই পদ গ্রহণ করিয়াছি এই কারণে যে, আমার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় হয়, পরিষদের বিভিন্ন দলের সদস্যগণ এবং জনসাধারণ এমন একটি মন্ত্রিসভার জন্য আগ্রহশীল যাহাদের দলগত অনুরক্তি থাকিবে না।"

নবগঠিত বিধান-মন্ত্রী-পরিষদকে জটিল পরিস্থিতি ও নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে এই রাজ্যের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইল সাফল্যের সহিত। এই মন্ত্রিত্বের স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় সাড়ে চার বৎসর। স্বাধীন ভারতের নয়া শাসনতন্ত্রের বিধান মতে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইল ১৯৫২খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে। কংগ্রেসদল সর্বত্র জয়লাভ করিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও কংগ্রেসদল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মন্ত্রিত্ব কংগ্রেসের হাতেই রহিয়া গেল। ২৬শে মার্চ আইনসভার নবনির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্যগণের এক সভায় ডাঃ বিধান রায় দ্বিতীয় বারের জন্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা (Leader) নির্বাচিত হইলেন সর্বসম্মতিক্রমে। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নূতন মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠিত হইল।

মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যগণের শপথ গ্রহণান্তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এক বিবৃতি দান করেন। তিনি নিজে কেন এতগুলি দপ্তরের ভার নিলেন এবং মন্ত্রী-গণের সংখ্যা এভাবে কেন বাড়াইলেন, সেই সম্বন্ধেও তাঁহার বক্তব্য বিবৃতিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

আমি গত সাড়ে চার বৎসর রাজ্যের শাসনকার্য চালাইয়াছি; একজন

মন্ত্রীর পক্ষে যতদূর অভিনিবেশ সহকারে কার্য সম্পাদন সম্ভবপর আমি তাহা করিয়াছি। কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা কয়েক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মন্ত্রীদের সংখ্যা বাড়াই নাই। রাজ্যের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। পূর্বে অর্থ দপ্তর আমার হাতে ছিল না, কিন্তু বরাবরই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কিত অবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও বিগত দুই বৎসর এই রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবত প্রতি বৎসর ১০।১১ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজ্যের উন্নতি দ্রুততর সাধিত হইবে এবং আমাদের পক্ষে আরও অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হইবে।

"রাষ্ট্রের উন্নয়নে যাঁহাদের উৎসাহ ও সামর্থ্য আছে এবং যাঁহারা এই রাজ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, তেমন একদল লোককে একত্র করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রিসভায় যে অধিক সংখ্যক সদস্য নিয়াছি, ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি স্বীকার করিতেছি। শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতিসাধনের জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আমি এই কাজ করিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুভব করি যে, সঙ্গত কাজই করিয়াছি। আমি আশা করি—এই মন্ত্রিসভা এই রাজ্যকে অধিকতর বাসযোগ্য করিয়া তুলিবেন। তাহা যদি হয় তবে আমরা সকলেই সুখী হইব।

"আমাদের দেশবাসীর নিকট আমি বলি যে, আপনারা আমাদের উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। কর্তব্য পালনে আপনারা আমাদের শক্তি দিন। চেষ্টার ত্রুটির জন্য আমরা ব্যর্থ হইব না। কেবল সাধ্যানুসারে চেষ্টাই করিতে পারি। আগামী পাঁচ বৎসরে প্রত্যেকের নিকট হইতে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করিব এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ সফল হইব।"

কতকগুলি দপ্তরের ভার নিজে লওয়া সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, অসুস্থতার জন্য শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারকে কার্যভার হইতে মুক্তি দিতে হইয়াছে। সেইজন্য অর্থদপ্তর তিনি নিয়াছেন; এবং অন্যান্য কয়টি দপ্তরও গত কয়েক বৎসর তিনি তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৭ খ্রীঃ) বামপন্থী দলগুলির সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই রাজ্যে কংগ্রেস জয়ী হইয়াছে। রাজ্য শাসন ব্যাপারে কংগ্রেস মন্ত্রী-পরিষদের অনুসৃত নীতি যে জনসাধারণের সমর্থন পাইয়াছে, নির্বাচনের ফলাফল হইতেই উহার প্রমাণ মিলিবে। ২রা এপ্রিল (১৯শে চৈত্র ১৩৬৩ সন) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভায় কংগ্রেসী

সদস্যগণের এক সভায় ডাঃ বিধান রায় সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা (Leader) নির্বাচিত হইলেন। ইহার ফলে তিনি তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গে ইহাই দ্বিতীয় কংগ্রেসী মন্ত্রী-পরিষদ। ডাঃ বিধান রায় নয় বৎসর ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। নেতা নির্বাচিত হইবার পরে তিনি দলের সভায় এক ভাষণ দান করেন। তিনি কংগ্রেস কর্মিগণকে নিজ নিজ এলাকায় যাইয়া নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, গঠনমূলক কার্যের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে তাঁহারা দেশবাসীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন।

ডাঃ রায় বক্তৃতায় আরও বলেন যে—এবার পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ৪ লক্ষ লোক ভোট দিয়াছে। তন্মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ৪৮ লক্ষ লোকের ভোট, বাকী দলগুলি পাইয়াছে ৫৬ লক্ষ লোকের ভোট। কংগ্রেসের যতই বিদ্রূপকারী থাকুক এবং যতই সমালোচক থাকুক, দেশবাসী বুঝিয়াছে কংগ্রেসই একমাত্র কাজের এবং তাঁহাদের কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা সংখ্যার দিক দিয়া আশানুরূপ অধিক আসন না পাইলেও তাঁহাদের লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

অতঃপর ডাঃ রায় নির্বাচন উপলক্ষে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া এক শ্রেণীর কংগ্রেস-কর্মীর মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেইগুলির উল্লেখ করেন এবং সংশোধন করার পন্থাও বলিয়া দেন। তিনি বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ চেষ্টা নির্বাচন উপলক্ষে এবার লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেক স্থলেই সাম্প্রদায়িকতার কথা উঠিয়াছে। গান্ধীজীর একটা আদর্শ ছিল—অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যসাধন। প্রকৃতপক্ষে হরিজনদের যদি তাঁহারা কাছে ডাকিয়া না লন, আলিঙ্গন না করেন এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতা আনিতে না পারেন, তাহা হইলে দেশ কখনও বড় হইবে না। সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। কথায় কার্যে ব্যবহারে তাঁহারা এমন কিছু যেন না করেন, যাহাতে সেই ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়।

ডাঃ রায় বলেন—দেশ যাহাতে বড় হয়, উন্নত হয়, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেস-কর্মীরা যদি নির্বাচনে নাও জিতেন, তাহাতেও কিছু আসে

যায় না। কার্যে, ব্যবহারে এবং কথায় কাহারও প্রতি যেন কোন শ্লেষ না থাকে, তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতা যাহাতে কোন প্রকারে স্থান না পায় সেইজন্য তাঁহাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

ডাঃ রায় বলেন যে, বিগত বিধানসভায় তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন কংগ্রেসের মধ্যে কথা বলিবার লোক কমই ছিল। তিনি আইনসভার সদস্যগণকে কোন-না-কোন বিষয়ে ভাল করিয়া পড়িয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অনুরোধ জানান। কে কোন্ বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশুনা করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন তাহা তাঁহাকে জানাইয়া দেন।

প্রসঙ্গতঃ তিনি ইহাও বলেন যে, তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, অনেক সদস্য বিধানসভায় আসিয়াই কিছুক্ষণ পরে সরিয়া পড়েন। এখানে ওখানে লবীতে গল্প করিয়া থাকেন। এবার যাহাতে সেইরূপ না হয়, তৎপ্রতি তিনি সদস্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাঁহাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

২৬শে এপ্রিল দার্জিলিং হইতে ১৩ জন মন্ত্রী, ৩ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১২ জন উপমন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিপরিষদ্ গঠন, তাঁহাদের নামের তালিকা এবং দপ্তর-বণ্টনের সংবাদ প্রচারিত হয়। ওই দিন প্রাতে দার্জিলিংয়ের রাজভবনে সিংহাসন-কক্ষে বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ২৮ জন সদস্যের মধ্যে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি ২৮শে এপ্রিল দার্জিলিং যাইয়া শপথ গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যগণকে শপথ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। তাঁহারা একে একে "সংবিধান ও আইন অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি অথবা বিদ্বেষ গ্রাহ্য না করিয়া সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ" করিতে অঙ্গীকার করেন।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ডাঃ বিধান রায় রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুআরি। তৎকালে সরকারের অর্থ-ভাণ্ডার প্রায় শূন্য ছিল বলা যাইতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী জাপান যাত্রার প্রাক্কালে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর মহাধিকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে একটি তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত দ্বিধা-বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ও ক্রমোন্নতি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও

রাজ্যের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার্থক প্রচেষ্টার একটি বিবরণ দিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের আইনসভার অধিবেশনে গৃহীত জমিদারি দখল, ভূমিসংস্কার আইন ও সদ্য-অনুমোদিত পঞ্চায়েত বিলকে তিনি কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের পথে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অবদান বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে—ওই সমুদয় বিধানের সাহায্যে আগামী কয়েক বৎসর এই রাজ্যের সমগ্র রূপ পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি বলেন—১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বতন আইনসভার অধিবেশন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ধারণা করিয়াছিলেন যে, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য-শাসন-ক্ষমতা কংগ্রেসের হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট ২৩৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৫০-এর বেশী আসন লাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন বিরোধী দলের ২০ জন সদস্য কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে, কংগ্রেসসরকার জন-গণের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থভাণ্ডারে কোন অর্থ ছিল না বলিলেই চলে। এমন কি সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিবার জন্যও কোন নির্দিষ্ট অর্থ রক্ষিত ছিল না। রাজ্যসরকার ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি দূর করিয়া এই রাজ্যের অর্থনৈতিক মান সুগঠিত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন—পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজ্যসরকার উন্নয়নের জন্য ৬৯ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থাপিত করেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দেন ২৬ কোটি টাকা সাহায্যদানের। রাজ্যের রাজস্ব হইতেও ২০ কোটি টাকার বেশী সংস্থান করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া কমিশন হিসাব করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য আরও যে ২৩ কোটি টাকার আবশ্যক তাহা নাই দেখা যায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার এইরূপ উন্নতি হয় যে, উহাতে কেবল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকরী করার অবশিষ্ট ২৩ কোটি টাকাই সংগৃহীত হয় নাই, পরন্তু রাজ্যসরকার পরিকল্পনার পূর্বতন বরাদ্দ অপেক্ষা আরও ৩ কোটি টাকা অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হন। ১৯৫১-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

৭২ কোটি টাকা এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট হইতে হিসাব ধরিলে এই পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নকার্যে সর্বসমেত ৯০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। কপর্দকশূন্য রাজ্যের পক্ষে ইহা কিন্তু কম কৃতিত্বের কথা নহে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন—প্রগতিশীল আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করাই আমাদের অন্যতম প্রচেষ্টা। সেইজন্য প্রথম পরিকল্পনায় সমাজসেবা, সেচ, রাস্তাঘাট নির্মাণের মধ্য দিয়া সমগ্র রাজ্যকে পুনর্গঠিত করিয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে। মূল বরাদ্দের ৩৬.১ ভাগ সমাজসেবার জন্য ব্যয়িত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ইহা অত্যন্ত আশাপ্রদ যে, দেশের জনসাধারণ নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সহযোগিতা না পাইলে কোন পরিকল্পনায়ই সরকার সফল হইতে পারিতেন না। উদ্বাস্তু সমস্যা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দুর্বল করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। প্রায় ত্রিশ লক্ষের অধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। এই রাজ্যে ইহাদের পুনর্বাসনের উপযোগী স্থান নাই। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রত্যেকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ দুই একরেরও কম। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে সুদৃঢ় নহে সেই অবস্থায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জমি সংস্থানে অসুবিধা দেখা দিতেছে। ইহার একমাত্র সমাধান হইতেছে সমবায় ভিত্তিতে কুটিরশিল্প সংগঠন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বকালে পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ উন্নতি দ্রুতগতিতে সাধিত হইয়াছে। জলসেচ ও জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, কৃষির অগ্রগতি ও খাদ্য শস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, পল্লীঅঞ্চলে পানীয় জলসরবরাহ, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষার প্রসার, শ্রমিককল্যাণ, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, শিল্পোন্নয়ন, কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়া কংগ্রেস সরকার বিগত আট বৎসরে এই রাজ্যের যথেষ্ট কল্যাণসাধন করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

এইস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় ডাঃ রায় বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। পরিকল্পনা রচনা, আর্থিক ব্যবস্থা এবং রূপায়ণ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি কেবল কর্মসচিব ও বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করেন না, নিজেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনমতে সংশোধন ব পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের নির্দেশ দেন

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আতত্রাণে বিধানচন্দ্র

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ঝটিকা ইত্যাদির আক্রমণে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিত। সেই দুর্যোগকালে বিদেশী সরকারের সাহায্য দানের অপেক্ষায় না থাকিয়া বাংলার স্বদেশহিতৈষী ও সমাজসেবকের দল আগাইয়া আসিত দুর্গত স্বদেশীয়গণের দুর্গতি দূর করিবার জন্য। অস্থায়িভাবে সমিতি বা কমিটি গঠিত হইত, তাহাতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগ দিতেন, তারপর অর্থ সংগৃহীত হইলে ওই সকল সংস্থার পক্ষ হইতে সেবকদলের সহযোগিতায় সেবাকার্য চলিত। তৎকালে যে সকল স্বদেশানুরাগী নেতা ওইরূপ সেবাকার্যে অগ্রণী ছিলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাদের অন্যতম।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হইল দ্বিতীয় মহা-বিশ্বযুদ্ধ। পরের বৎসর মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তিত হইল। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এবং আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণের মধ্যে অনেকে সেই আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করিলেন। ইহার পর সরকারের নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কারাবদ্ধ কংগ্রেসসেবকগণকে মুক্তি দেওয়া হইল। ইতোমধ্যে যুদ্ধের অবস্থা এমন দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইল যে, যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আগতপ্রায়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনের উপর জাপানীরা বিমান আক্রমণ চালায়। বোমা পড়ায় অনেক বাড়ী-ঘর বিধ্বস্ত হয় এবং শহরবাসীগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক নরনারী আহত ও নিহত হয়। সেই আসন্ন দুর্যোগের দিনে প্রশ্ন উঠে যে, ওইরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস জনরক্ষা সম্পর্কে কি পন্থা অবলম্বন করিবে? সরকারের প্রবর্তিত এ. আর. পি (Air Raid Precaution) সংস্থায় কংগ্রেসীরা যোগ দিবে কিনা—এই প্রশ্নও উঠিয়াছিল। এই সময়ে বাংলার শাসনভার ন্যস্ত ছিল ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উপর; কংগ্রেস-কর্মী শ্রীসন্তোষকুমার বসু ছিলেন সেই মন্ত্রিমণ্ডলে জনরক্ষা-মন্ত্রী। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব বিবেচনা উপলক্ষে মুক্তিলাভের পর কলিকাতায় আসিলেন। কংগ্রেস-কর্মীগণের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটি সম্মিলনের ব্যবস্থা লইল। মওলানা সাহেবের বালীগঞ্জ

সার্কুলার রোডের বাড়ীতে বাংলার কংগ্রেস-কর্মীগণ সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিলেন। শ্রীসন্তোষকুমার বসুও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মওলানা সাহেব স্পষ্টভাবে বলিলেন যে কংগ্রেস জনরক্ষায় সহযোগিতা করিবে, কিন্তু এ. আর. পি. বা সিভিক্ গার্ডে যোগ দেওয়ার যে শর্ত তাহা মানিয়া কংগ্রেস-কর্মীদের তাহাতে যোগ দিতে তিনি বলিতে পারেন না। তাহা করিতে গেলে কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের সাময়িক বিলোপ ঘটিবে ; এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা আত্মহত্যারই নামান্তর। পরন্তু সহযোগিতার জন্য তিনি স্থাপন করিলেন বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতি বা Bengal Civil Protection Committee—যাহাতে কংগ্রেসের লোক ব্যতীত অন্যান্যেরাও যোগ দিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জস্টিস্ টি. আমির আলি এই জনরক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

সমিতির কাজ হইল—দেশবাসীকে আত্মরক্ষায় শিক্ষা দেওয়া, মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সঙ্কটকালে দেশবাসী যাহাতে বিভ্রান্ত না হয় তদুপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সংঘর্ষ এড়াইয়া চলাও সমিতির কার্যের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের অসহযোগিতা-নীতি তখনও বলবৎ ছিল। একক সত্যাগ্রহের ধ্বনি (স্লোগান) ছিল—Not a man, not a pice, একটি মানুষও না, একটা পয়সাও না। কংগ্রেসের নির্ধারিত ওই নীতিতে স্থির থাকিয়া জনরক্ষা ব্যাপারে সহযোগিতায় নিপুণ পরিচালনার প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানও বিরাট ও ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। সম্মিলনে আলোচনা হইল—বাংলাদেশে কে পারে ওই কঠিন ও জটিল কাজ চালাইতে। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করিয়া তাঁহার উপব কার্যভার ন্যস্ত করা। তাহাই করা হইল। জনরক্ষা সামতির দুইটি শাখা হইল—একটি সাধারণ (General) এবং আর একটি মেডিকেল। সাধারণ শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন শ্রীভূপতি মজুমদার (বর্তমানে বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী) এবং মেডিকেল শাখার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়।

বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতি স্থাপিত হওয়ার কিছুদিন পূর্ব হইতেই ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত শরণার্থীদের সেবার কাজ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে করা হইতেছিল। এই দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কার্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল নির্যাতিত দেশসেবক বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্যের উপর। তিনি শরণার্থীদের ভারতে আসিবার পথের অবস্থা দেখিবার জন্য এবং স্থানীয়

কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন বিশ্রাম-কেন্দ্রে সেবার ব্যবস্থা করার জন্য প্রেরিত হইলেন। জাপানীদের আক্রমণে রেঙ্গুন পতনের পর জাহাজে করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতায় সরাসরি আসা বন্ধ হইয়া গেল। কলিকাতার ডক্ এলাকায় সেবার কাজ চলিতে থাকাকালেই শিয়ালদহ স্টেশনেও সহস্র সহস্র শরণার্থী আসিতেছিল। তখনও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে আসিবার প্রধান পথ চট্টগ্রাম হইয়া চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, কলিকাতা। শরণার্থীদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই জনই দক্ষিণ-ভারতীয়। উত্তর দক্ষিণ সকল অঞ্চলের শরণার্থীই হাওড়া স্টেশন দিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে যাইতেছিলেন। সেবার কার্য বিপুল আকার ধারণ করিল। ডাঃ রায়ের নির্দেশ মতে জনরক্ষা সমিতির বিরাট সেবক-বাহিনী বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া সেবার কার্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়া যাইতেছিল। যে সকল দুর্ভাগা কোন রকমে দেহটাকে টানিয়া আনিয়া কলিকাতায় পৌছার পর আর চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাদিগকে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করাইবার ব্যবস্থা হইল। হাসপাতালে আশ্রয়প্রাপ্ত ওই সমুদয় শরণার্থীর তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন কংগ্রেস-কর্মীরা।

চট্টগ্রামে জাহাজে আসা বন্ধ হইয়া গেল; বিমানযোগে কয়েক শত লোককে আনা হইয়াছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে হইল। শরণার্থীরা আসিতেছিল হাঁটা-পথ দিয়া—যে পথ দিয়া একদিন পলাইয়া গিয়াছিলেন সাজাহান-পুত্র সুজা। আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালার ভিতর দিয়া এই পথকে কোন কোন স্থানে সুজা রোড বলা হইয়া থাকে। এই পথে চট্টগ্রামের দোহাজারীতে আসিয়া শরণার্থীরা ট্রেন ধরিতে লাগিল। কাজেই তখন চট্টগ্রামে হইল প্রধান আশ্রয়-শিবির। তৎকালে চট্টগ্রামের উপর জাপানী বোমারু বিমানের আক্রমণ হইল দুই বার। সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয়-শিবিরের প্রধান অংশ সরাইয়া নেওয়া হইল সীতাকুণ্ড স্টেশনে। এই পথের জনস্রোত ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল। তখন শরণার্থীরা আসিতেছিল আপার বার্মা হইয়া মিচিনা হইতে ভারতের দিকে, উহার নীচে হইতেও টামু, প্যালেল-এর পথে ইম্ফল, কোহিমা হইয়া ডিমাপুরে (মণিপুর রোড স্টেশন) ট্রেন ধরিতে লাগিল। আবার ডিমাপুর আসিবার পথে লক্ষ্মীপুর হইতে বাম দিকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরিয়াও অনেকে আসিতে লাগিল। দুর্গম এই পথ—কিছুদূরে শিলচর। এখানে ক্রমে ক্রমে এক ফ্যাসাদ বাধিল। কাছাড়ের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন মিঃ ফ্লেচার। তিনি হুকুম দিলেন যে,—যাহাদের সহিত টাকা আছে, তাহাদের কলিকাতা পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট কিনিতে

হইবে। টাকা আছে কিনা সঠিক জানিবার জন্য শরণার্থীদের দেহতল্লাসেরও ব্যবস্থা হইল। অনেকে বাট্টা দিয়া বার্মা-নোট বদল করাইয়া নিতেছিল। তখন ভারতসরকারের বৈদেশিক সম্বন্ধের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন শ্রী এম. এস. আনে। তাঁহার একজন প্রতিনিধি মিঃ ম্যারাথে শিলচর ডাকবাংলোতে ছিলেন। তিনি ওই ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে অসহায় বোধ করিতেছিলেন। তখন শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য মিঃ ম্যারাথের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীআনেকে তার করিয়া ডেপুটি কমিশনারের হুকুমের বিষয় জানাইলেন। তিনি ওই সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ কলিকাতায় ডাঃ বিধান রায়কেও অবিলম্বে অবগত করান। ডাঃ রায় সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্র দিল্লী এবং শিলঙে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ডেপুটি কমিশনারের হুকুম বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানান। দুই দিনের মধ্যেই হুকুম বাতিল হইয়া গেল এবং সরকারপক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে, শরণার্থীগণ বিনা ভাড়ায় ট্রেনে করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম দিকে।

ইহার দুই-তিন মাস পূর্বে কলিকাতায় একদল লোক হৈ-চৈ করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল হইয়া মুসলমানদের আসিতে দেওয়া হইতেছে না। কথাটা বাজে ও অসম্ভব মনে হইলেও জীবানন্দবাবু পথে কি ব্যবস্থা আছে এবং শরণার্থীদের জন্য আরও কিছু করণীয় আছে কিনা সঠিক বুঝিবার উদ্দেশ্যে মণিপুর হইয়া টীমু প্যালেন পর্যন্ত গেলেন। মণিপুর যাইবার অনুমতি আবশ্যক, কিন্তু তাহা মিলে নাই। কোহিমায় দুই দিন অপেক্ষা করিয়া এক কৌশলে তিনি মণিপুর যাইয়া পৌছিলেন। মুসলমানদের সম্বন্ধে ওইরূপ একটা কথা রটনার সামান্য কারণ ছিল। ইম্ফল হইতে কোহিমার দিকে ৬ মাইল দূরে কোরঙ্গিয়া নামক স্থানে শিবির হইয়াছিল। একজন মুসলমান শরণার্থী ইম্ফলে বাস হইতে নামিয়া যায় এবং স্থানীয় মুসাফিরখানায় থাকিতে চাহে। কিন্তু একজন পুলিস বলে যে, ওখানে থাকার হুকুম নাই। সেই সময় কাহাকেও ইম্ফলে থাকিতে দেওয়া হইতেছিল না। সমস্ত শরণার্থীকে কোরঙ্গিয়া শিবিরে আনা হইতেছিল এবং তথা হইতে প্রত্যহ ভোরবেলায় ২৫।৩০ খানা বাস্ শরণার্থী লইয়া রওনা হইত ডিমাপুরের পথে। জীবানন্দ বাবুর সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে আলাপ-পরিচয় হয় শ্রীডোঙ্গরমল লোহিয়ার; ইনি মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির পক্ষে কাজ করিতে চাহেন। দুইজনে ইম্ফল শহরের রাজপথের পার্শ্বে কয়েকটি শরণার্থী পরিবারের সাক্ষাৎ পান; তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা রুগ্ণ

ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করাইয়া দিয়া পরিবারের অন্যান্যদের থাকিবার জন্য ধর্মশালা ও মুসাফিরখানা খুলিয়া দিলেন। কর্মীদল প্রত্যক্ষ করিল—পথে মানুষের বর্ণনাতীত দুর্দশা এবং ট্রেনে বিশৃঙ্খলা। স্থানীয় দেশকর্মীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সেবাকার্য করিতেছিলেন; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেবকেরা শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট আশানুরূপ লাঘব করিতে পারেন নাই—কোথায় লোকবল, কোথায়ই বা অর্থবল? জীবানন্দবাবু তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়া প্রতি সপ্তাহে একবার কি দুইবার কলিকাতায় ডাঃ বিধান রায়ের নিকট রিপোর্ট পাঠাইতেন, কখনও কখনও জরুরী ব্যাপারে তার-বিনিময়ে তাঁর উপদেশ লইলেন। বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতির পক্ষে তিনি ওইভাবে সারা রাস্তা ভ্রমণ করিয়া শরণার্থীদের অবস্থা দেখেন এবং বহু অঞ্চলে স্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেবাকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া জনরক্ষা সমিতির সভাপতি ডাঃ রায়, সম্পাদক শ্রীভূপতি মজুমদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তাঁহার অভিজ্ঞতা জানান।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসাম যাইবার পথে কলিকাতায় আসিলেন। ডাঃ বিধান রায় তখন কলিকাতায় ছিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে জওহরলালজীর কিছুই আসিয়া যায় না। তিনি ডাঃ রায়ের বাড়ীতেই উঠিলেন। লোকে জানে যে, ওই বাড়ীই তাঁহার দ্বিতীয় বাসভবন। তাঁহাকে ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত শরণার্থীদের অবস্থা সবিশেষ জানানো হইল। ইতোমধ্যে ফকরুদ্দিন সাহেব আসাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া নেহরুজীর সঙ্গে মিলিত হন। তাই প্রত্যক্ষদর্শী আর কাহারও তাঁহার সহিত আসাম অঞ্চলে যাইবার প্রয়োজন হইল না। পাঁচ দিন পরে তিনি আসাম হইতে ফিরিয়া আসেন। নেহরুজী শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়াই বলিলেন যে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইতে হইবে সীমান্ত অঞ্চলে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব। ওই দিনই তাঁহারা এলাহাবাদ রওনা হইবেন, পরদিন সেখানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিবে। সন্ধ্যায় ডাঃ রায়ের বাড়ীতে নেহরুজীর সহিত আলোচনা ও পরামর্শের জন্য কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা ও বিশিষ্ট কর্মী এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইলেন। মওলানা আজাদ এবং ডাঃ রায় নিজেও উপস্থিত ছিলেন। সেইবার নেহরুজীর মণিপুর পর্যন্ত যাইবার অবকাশ হয় নাই, তাই সেই স্থানের ও পথের খবরাখবর তিনি শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য হইতে জানিয়া নিলেন। তাঁহার ইচ্ছা—তিন দিনের মধ্যেই যেন প্রথম দল ডাক্তার, সীমান্ত অঞ্চলে রওনা হইয়া যান। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল, কে এই অল্প

সময়ের মধ্যে সে ব্যবস্থা করিতে পারিবে? শুধু অর্থ হইলেই তো কাজ হইবে না, ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার, স্বেচ্ছাসেবক, সাজসরঞ্জাম, ঔষধপত্র সংগ্রহ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং আরও আনুষঙ্গিক অনেক কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই সম্পর্কে মওলানা আজাদ যে মন্তব্য করিলেন, উহার মর্ম এই দাঁড়ায় যে,—এই কাজ করিবার যোগ্য একটিমাত্র লোক আছেন, তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাংলা দেশের একটা চলতি কথা আছে—'ভূতে যোগায়'। ডাঃ রায়ের কাজ সম্বন্ধেও সেই কথাটি প্রযোজ্য। তিনি কোন কার্যের ভার নিলে সব যেন 'ভূতে যোগায়।' তিনি কাজে হাত দিলে খুঁটিনাটি সবকিছু তাঁহার চোখে পড়ে। স্থঁচ হইতে মাইক্রোস্‌কোপ—কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রথম দল ডাক্তার পাঠান হইল, কিন্তু পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনের দরুন এবং অন্যান্য কারণে সেই দলকে ফিরিয়া আসিতে হইল। দ্বিতীয় দলও প্রেরিত হইল, সেই দলেব সেবকগণ শিলচরে যাইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় দলকে অধিকতর সুসজ্জিত ও সুগঠিত করা হইল। কিন্তু সেই দলকে পাঠাইতে সীমান্ত অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবস্থা গেল সামরিক বিভাগের হাতে। ইতোমধ্যে মণিপুরের উপর বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতির নির্ভীক কর্মীদল—ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবক মণিপুর রোড স্টেশনে নিজেদের শিবিরে থাকিয়া সেবাকার্য করিয়া যাইতে লাগিল। কর্মরত সেবকগণের মাথার উপর দিয়া জাপানীদের বোমারু বিমান উড়িয়া যাইতেছে, তথাপি সেবারত কর্মীগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ইত্যাদি ছিলেন জনরক্ষা সমিতির মেডিকেল শাখার কর্মী। তাঁহারা তাঁহাদের নেতা ডাঃ বিধান রায়ের বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাঁহাদের বলিয়াছেন—'যাও, সীমান্তে গিয়ে দেখিয়ে দাও পলায়নরত বিদেশী সৈন্যদের যে, তোমরা কত নির্ভীক, কেমন কর্তব্যপরায়ণ।'

এই স্থলে ডাঃ রায়ের তেজস্বিতার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে কয় মাস সেবাকার্য চলিয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্যকে দুইবার কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল প্রয়োজনীয় ঔষধ ও জিনিসপত্র লইয়া যাইতে। একবার প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডুতে জাহাজের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সিঁড়ি দিয়া তাঁহাকে সামরিক বিভাগের কর্মচারী উঠিতে দেয় নাই। তিনি কলিকাতায় পৌছিয়া ডাঃ রায়কে খবরটি লিখিতভাবে দিলে পর, তৎক্ষণাৎ ডাঃ রায় আসামের তৎকালীন চীফ্‌ সেক্রেটারী মিঃ ডেন্‌হি-কে

টেলিফোন করেন। টেলিফোনে সে কি গর্জন! বলিলেন—আপনি জেনারেল উড্‌কে বলুন যে,—আমার লোকেরা তাঁহাদেরই সাহায্য করিতেছে। এ কাজ তো তাঁহাদেরই করা উচিত ছিল, তাঁহারা ও তাঁহাদের তৈরী অর্গেনিজেসন ফেল করিয়াছে। আমার লোকের সম্মানে যদি আঘাত লাগে, তবে আমি তাহা সহ্য করিব না, সমুচিত জবাব দিব। ইহার পর আর ওই-রূপ ঘটনা ঘটে নাই, বরং জনরক্ষা সমিতির কর্মীদের কাজের সুবিধা হইয়া-ছিল অনেক। সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীই যেন বদলাইয়া গিয়াছিল।

জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশ হইতে ৬।৭ লক্ষ ভারতীয় নানা পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাঁহাদের সেবার জন্য যে কংগ্রেস মেডিকেল মিশন সীমান্তে কাজ করিতেছিল, তাহা বাংলা ও আসামের কর্মীদের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সর্বভারতীয় লোক নিয়া গঠিত দুইটি কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের প্রথমটি প্রেরিত হইয়াছিল চীনদেশে এবং দ্বিতীয়টি যুদ্ধোত্তর মালয়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রধান কর্ম-কেন্দ্র ছিল মালয়, যদিও পূর্ব এসিয়ার অনেক স্থানের ভারতীয়গণই ইহাতে যোগ দিয়াছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গঠনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যাঁহারা নিয়মিত ব্রিটিশ-ভারতীয় সামরিক বিভাগের লোক সিঙ্গাপুর পতনের পর জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং যুদ্ধবন্দী-রূপে মালয়ে আবদ্ধ থাকেন। আর দ্বিতীয়—যাঁহাদের 'সিভিলিয়ান' বলা যায়, মালয়ের সাধারণ ভারতীয়। ইঁহাদের ভিতরে নানা বৃত্তির লোক ছিলেন, তবে শতকরা আশিজন ছিলেন মালয়ের রবার বাগানের শ্রমিক। প্রথম দলের প্রায় সকলকেই ইংরাজরা পুনরায় মালয় দখল করিবার পর ভারতে লইয়া আসে এবং অধিকাংশই যুদ্ধবন্দী-রূপে নানা বন্দী-শিবিরে আটক থাকে। বাংলার প্রধান কেন্দ্র ছিল যশোহরে ঝেকড়গাছায় (এখন পাকিস্তানে) এবং বারাকপুরের নিকট নীলগঞ্জে। অফিসার কয়েকজনকে দিল্লীর লাল কেল্লায় আটক রাখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয় যাঁহারা কোনমতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের ফিরিতে হইয়াছিল মালয়েই।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যাপার নিয়া তখন সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। ফৌজের প্রধান কয়েকজনের বিচার হইতেছিল দিল্লীতে স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধী কংগ্রেসী দলের নেতা বোম্বের দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী স্বর্গত ভুলাভাই দেশাই এবং অন্যান্য

কয়েকজন ব্যারিস্টার ও য়্যাড্‌ভোকেট বিবাদীদের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। এমন কি শ্রীজওহরলাল নেহরু পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে ২৪।২৫ বৎসর পূর্বে পরিত্যক্ত ব্যারিস্টারী গাউন পরিয়া দেশাইজীর সহকারীরূপে বিচারালয়ে হাজির হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে বিচারের বিবরণ চিত্তাকর্ষক শিরোনামায় প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছিল। নেহরুজী বিদেশী সরকারকে প্রকাশ্যে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়া যদি আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের বন্দী বীর যোদ্ধাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে ভারতব্যাপী যে অসন্তোষের অনল জ্বলিয়া উঠিবে তাহা নিবাইবার ক্ষমতা ভারতের ইংরাজ শাসকমণ্ডলীর নাই। রসিদ আলি পালন উপলক্ষে কলিকাতায় ছাত্রদের উপর গুলি চালনা করা হইয়াছিল। তখন সমগ্র ভারতে জনগণের ভিতর চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ বিদ্যমান। এইরূপ অবস্থায় মালয়স্থ ভারতীয়গণের অনাহারে ব্যাধির আক্রমণে দুঃখ-দুর্দশা ভোগের করুণ কাহিনী এইদেশে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। এখানে উহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে—যাঁহারা নিয়মিত সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সৈনিক বৃত্তি জানা ছিল; সুতরাং তাঁহাদের কার্য মোটামুটি অভ্যস্ততার জন্য সহজ বলা যাইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়েরা আজাদ হিন্দ ফৌজে ও আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের নানা পদে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন; তবে তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনদানের সংকল্প লইয়া প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। মালয়ে ভারতীয়গণের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ছিল, ইহারা দক্ষিণ-ভারতীয়—তামিল ও তেলেগু। ইহাদের দিয়া জাপানীরা যাহা করাইয়াছে, তাহা হইল জঙ্গল কাটা, রাস্তা, রেলপথ ও পুল নির্মাণ করা। অমানুষিক পরিশ্রমে অনাহারে বা অল্পাহারে ইহারা অর্ধমৃত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রায় এক লক্ষ শ্রমিকের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাদের কর্মস্থানগুলির মধ্যে প্রধান মৃত্যু-কেন্দ্র ছিল শ্যাম-বর্মা রেলপথ। ইহাকে 'Death Railway' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। বিলের উপর দিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া গিয়াছে এই রেলপথ। কথিত আছে যে, এই রেলপথ তৈরী করিতে যতগুলি স্লিপার লাগিয়াছে, ততগুলি শ্রমিককে প্রাণ দিতে হইয়াছিল পথ নির্মাণের জন্য। সেই পথ নির্মাণে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছিল বা অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল, তাহারা সকলেই আসিয়াছিল মালয়ে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মালয় মেডিকেল মিশনের ব্যবস্থাপক রূপে প্রথম পরিদর্শনরত শ্রীজীবানন্দ

ভট্টাচার্য তাঁহার প্রথম রিপোর্টে ওই সমুদয় শ্রমিকের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, উহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

…"Residues of the 'Death Railway' builders are pouring into Malaya and are received at the Jitra camp situated at the extreme north of the Peninsula. They are ill-clad, ill-fed, devitalised, with sores on legs—hardly one is found without bandage on legs. They are living human skeletons."…

এই প্রকারের বেদনাদায়ক সংবাদ মালয় হইতে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একদিকে যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক বিভাগের লোকজনের বিচার লইয়া দেশময় আন্দোলন চলিতেছে, আর একদিকে তেমনই মালয়স্থিত বেসামরিক লোকজনের দুঃখকষ্টের করুণ কাহিনী আসিয়া পৌঁছাইতেছে। কংগ্রেস-নেতৃত্ব তখনও মুখ্যত রাজনৈতিক হইলেও সে রাজনীতির ভিত্তি সূক্ষ্ম-মানবতাবোধের উপর। কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে যিনি 'কঠিন মানুষ' (man of iron) বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তিনি হইলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। অন্তর ছিল তাঁহার কোমল এবং এই সূক্ষ্মবোধ সেখানে জাগ্রত হইত অধিক। এইদিকের আন্দোলনের মূল ছিল তাহাতে! তিনিই আবার স্থির করিলেন যে, মালয়ের বেসামরিক ভারতীয়দের জন্য ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্য আছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল যে মালয়ে একটি মেডিকেল মিশন পাঠাইতে হইবে। মালয় তখন সামরিক শাসনাধীন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মালয়ে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও পুনর্বসতির প্রশ্ন তখন প্রবল। দূরদেশ হইতে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ মিশন প্রেরণ সহজসাধ্য নহে। কে পারে এই কঠিন কর্মের ভার লইতে? ব্যবস্থা, ঔষধপত্র, যোগ্য ডাক্তার নির্বাচন, সাজসরঞ্জাম, এমন কি গাড়ী পর্য্যন্ত এখান হইতে পাঠাইতে হইবে। কে পারিবে এই সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত ও নিপুণভাবে করিতে? ইহা সম্ভব একমাত্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে। কোন কার্যেই "আমাকে দেওয়া হোক্, আমি করব" এইভাব তাঁহার কোনদিনই নাই। কিন্তু কঠিনতম কাজ আসিয়া পড়িলে তাঁহাকে কোনদিন 'হইবে না' বলিতে কেহ শুনে নাই। মেডিকেল মিশন পাঠাইতে হইবে,—এই কথাটার গুরুত্ব কত এবং কাজ যে কত ব্যাপক ও কত বিচিত্র রকমের তাহা বোধ হয় প্রস্তাবকেরাও সম্যক উপলব্ধি করেন নাই ইহার প্রয়োজন বা কি? ইহার জন্য তো ডাঃ বিধান রায়ই আছেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট একটি মিশন পাঠানো ঠিক করিয়া ফেলিলেন মেডিকেল এসোসিয়েসন-এর লোক লইয়া।

ইহার নেতৃত্বের ভার দেওয়া হইয়াছিল দক্ষিণ-ভারতের কর্নেল শাস্ত্রীর উপর। এই মিশন কিন্তু মালয়ে গিয়া কোন কাজই করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিছুদিন মালয়ে অবস্থানের পরেই তাঁহাদের ভারতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ডাক্তার হিসাবে বা সেবার ইচ্ছার ক্রটি তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু যে ব্যবস্থা থাকিলে, যে সকল সাজসরঞ্জাম ও ঔষধপত্র থাকিলে এবং যে ধরনের সংগঠন হইলে ওই পরিস্থিতিতে কাজ করা যায়, তাহা তাঁহাদের ছিল না। এই অবস্থা কল্পনার চোখে দেখা সম্ভব। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো প্রতিভাশালী চিকিৎসক, দূরদর্শী সংগঠক ও ব্যবস্থাপকের পক্ষেই তাহা সম্ভব। এই বুদ্ধির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে কংগ্রেস মেডিকেল মিশন প্রেরণের অনুমতি আদায় করা। ভারতসরকার মেডিকেল মিশন পাঠাইতেছেন, এই অজুহাতে প্রথমে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মালয় তখন সামরিক শাসনাধীন। অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত বলিয়া যাঁহারা পরিগণিত হইবেন, তাঁহাদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি মিলিতে পারে না। মেডিকেল মিশনের ভার তখন বিধানচন্দ্রের উপর পড়িয়াছে। সুতরাং অনুমতি জোগাড় করিয়া লইবার দায়িত্বও তাঁহার। এদিকে প্রয়োজনীয় জিনিস, ঔষধপত্র খরিদ করা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার কাজ আরম্ভ করা হইয়া গিয়াছে। ভারতের নানা স্থান হইতে ডাক্তার সংগ্রহ করার কাজও সুরু হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার অকাট্য যুক্তি দিয়া ভারতসচিবের নিকট এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে সক্ষম হইলেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস হইতে অনুমতিপত্র আসিয়া পৌছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের শেষের দিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মালয়ভ্রমণে যান। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল মাউণ্টবেটেনের সঙ্গে সমগ্র মালয় পরিভ্রমণ করেন। যুদ্ধান্তে ভারতের মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, নেহরুজীর ভ্রমণে উহার কতকাংশের নিরসন হইল। তাঁহার এই সফর সারা মালয়ে মেডিকেল মিশনের কাজ করার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

ডাঃ রায়ের নির্দেশে দুইজন কংগ্রেস-কর্মী অগ্রগামীরূপে মালয়ে গেলেন নেহরুজীর মালয় ত্যাগের দিনই তাঁহারা মালয়ে পৌছিলেন। এই অগ্রগামীদ্বয় ছিলেন ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য। ডাঃ বসু ছিলেন বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতির মেডিকেল শাখার সম্পাদক এবং বর্মা-প্রত্যাগত শরণার্থীদের সেবার জন্য যে মেডিকেল মিশন পাঠানো হইয়াছিল উহার পরিচালক। তিনি ন্যাশন্যাল মেডিকেল স্কুলের (বর্তমান কলেজ)

ছাত্র এবং ওই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মহামারীতে যখনই শিক্ষায়তনের আহ্বান আসিয়াছে, ডাঃ বীরেন বসু কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন সর্বাগ্রে। ক্ষীণকায়, নিরামিষাশী, একাহারী বীরেন বসুকে কঠিনতম কার্যে পাঠাইতেও ডাঃ রায় কোন দিন দ্বিধা করেন নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে কি যে প্রয়োজন তাহার সরজমিনে তদন্তের জন্য এমন লোক তো চাই।

ওই দুইজন অগ্রগামী সারা মালয়ে ভ্রমণ করিয়া ছয়টি সেবা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা করেন। স্থির হইল যে, প্রতি কেন্দ্রে ডাক্তাররা রোগী দেখিবেন সকালবেলায়, বারোটার পরে ভ্রাম্যমাণ ঔষধালয় (মোবাইল ডিস্পেন্সারী) লইয়া তাঁহারা যাইবেন রবারের বাগানে বাগানে। অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল এই পরিকল্পনা। ফলে মিশন সহযোগিতা পাইয়াছিল শুধু সাময়িক শাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে নহে, সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ হইতেই। সামরিক বিভাগ মিশনের ছয়টি কেন্দ্রের মোবাইল ইউনিটের জন্য বড় গাড়ী, হেড্ কোয়ার্টার্সের জন্য অফিসার্স্ কার সবই দিয়াছিল। এই যে কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্র হইতে ভ্রাম্যমাণ ঔষধালয় লইয়া সেবার কার্য—ইহা কিন্তু অগ্রগামী কর্মীদ্বয়ের পরিকল্পনা নহে; ডাঃ রায়ের উদ্ভাবিত পরিকল্পনাকে তাঁহারা রূপায়িত করিয়াছিলেন মাত্র।

মিশনের জন্য ডাক্তার সংগৃহীত হইয়াছিল ভারতের কয়েকটি প্রদেশ হইতে, তবে বেশীসংখ্যক ডাক্তার যোগাইয়াছিল বাংলা। নাগপুরের ডাঃ চোলকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন ডাইরেক্টার। তিনি চীনা মিশনে ছিলেন ডেপুটি ডাইরেক্টার। ডাঃ রায়ের পক্ষে যাঁহারা কলিকাতা অফিসে থাকিয়া ব্যবস্থা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অফিস-সেক্রেটারী শ্রীবিজয় সিংহ-নাহার, কম্যাণ্ডাণ্ট্ ক্যাপ্টেন এস. কে. রায়। বার্মা-মিশনের সময়েও ক্যাপ্টেন রায় ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইনি দেশবিশ্রুত মনীষী স্বর্গত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির জ্যেষ্ঠ পুত্র। নীরব কর্মী ছিলেন তিনি, অদ্ভুত ছিল তাঁহার কর্ম-নৈপুণ্য। কত বড় বড় কার্যে তিনি ডাঃ রায়ের সহায়ক ছিলেন; অথচ অনেকেই তাঁহাকে সামনে দেখেন নাই, কিংবা সংবাদপত্রেও তাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নাই। তিনি আত্মপ্রচার এড়াইয়া চলিতেন। নেতার যোগ্যতা ও দক্ষতার নিদর্শন মিলে কর্মী মনোনয়নে এবং উপযুক্ত কার্যে তাঁহার নিয়োগে। ডাঃ রায়ের মধ্যে সেই গুণের যে অভাব নাই, তাহা বুঝা যায় ক্যাপ্টেন রায়ের মতো একজন আদর্শ কর্মীকে দেখিয়া এবং তাঁহার কর্মের পরিচয় পাইয়া। ক্যাপ্টেন রায় ছিলেন বিধানচন্দ্রেরই নির্বাচিত একজন কর্মী।

মেডিকেল মিশন মালয়ে কাজ করিয়াছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। মিশনের সেবকবাহিনী ৬ই আগস্ট রওনা হইয়া ১৩ই আগস্ট দেশে ফিরিয়া আসে। বিধানচন্দ্রের বিপুল কর্মাবদানে বার্মা মেডিকেল মিশন এবং মালয় মেডিকেল মিশন বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। এই স্থলে আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম অগ্রগামী দল মালয়ে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রত্যেক মানুষের পায়ে ব্যাণ্ডেজ। অনাহারে বা খাদ্যপ্রাণহীন আহারে দেহের জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সেই অবস্থায় হাঁটিয়া পথ চলিয়াছে বলিয়া পায়ে ক্ষত হইয়াছে। যে ঔষধ মিশনের জন্য পাঠানো হইতেছিল, তাহাতে ওই ক্ষতরোগের প্রতিকার হয় নাই। বিষয়টির প্রতি ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। অবিলম্বে এক টিন তৈরী ঔষধ গেল বিমানে, আর ডাঃ রায়ের ওই রোগের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন গেল ডাকে। ভিটামিন ট্যাবলেটের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছিল প্যাকিং বাক্সে। আশ্চর্য ফল ফলিয়াছিল সেই ঔষধ ব্যবহারে এবং সেই ব্যবস্থা অনুসরণে। এই ঔষধ স্থানীয় লোকদের মধ্যে 'গান্ধী দাওয়া' নামে খ্যাতি ও সমাদর লাভ করে।

মালয় মেডিকেল মিশন এবং বার্মা মেডিকেল মিশনের অ-ডাক্তার জীবানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁহার কাজ ছিল প্রধানতঃ ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থায় রাজনীতিক ও সামাজিক দুইটি দিকই ছিল। মেডিকেল মিশন মালয়ে যাইতেছে এবং উহার ব্যবস্থাপক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—এই সংবাদটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পরেই ভারতের নানা স্থান হইতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নানাবিধ করুণ কাহিনী আসিয়া পৌছিতে লাগিল ডাঃ বিধান রায়ের কাছে। কেহ দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার আপনার জনের কোন খোঁজ পাইতেছে না, কেহ বা খোঁজ পাইয়াছে তাঁহার আত্মীয়টি আছেন কারাগারে, কেহ জানাইয়াছে যে, তাঁহার স্বামী বা পুত্র ওই দেশেই নূতন করিয়া ঘরসংসার পাতাইয়াছে। এই রকমের প্রতিটি চিঠির বেদনা ডাঃ রায়ের সমবেদনশীল প্রাণকে ব্যথিত করিয়াছিল। চিঠিগুলি জীবানন্দ ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। ডাঃ রায়ের নির্দেশ ছিল যে, প্রতিটি লোকের যেন খোঁজ লওয়া হয় এবং তাহাদের খবর যেন আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জীবানন্দবাবু ওই সমুদয় কাজ এবং তৎসঙ্গে সমাজসেবার কাজও করিতেন। মিশনের ডাইরেক্টর ডাঃ চোল-কারের স্বকীয় সহায়ক (পার্সন্যাল য়্যাসিস্টাণ্ট) রূপে তাঁহার উপর মিশনের আরও অনেক কার্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি আদর্শ কংগ্রেস-কর্মীর উপযোগী নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের সহিত কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৫০ সাল) অখণ্ড বাংলায় যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলিয়াও বিদিত। দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু-সংখ্যা তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ আমেরীর মতে প্রায় সাত লক্ষ ; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত পরিসংখ্যান অনুসারে মৃত্যু-সংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছিল মোটামুটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ। নিদারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। তখন চলিতেছিল দ্বিতীয় মহা-বিশ্বযুদ্ধ। বাংলাদেশের অধিবাসিগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না। দুর্গত দেশবাসীর সাহায্যার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই গঠিত হইল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। কার্যনির্বাহক সমিতিতে ছিলেন—স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা (সভাপতি), ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি) শ্রীভগীরথ কানোরিয়া (সম্পাদক), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, আনন্দীলাল পোদ্দার, সার আবদুল হালিম গজনবী প্রভৃতি। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এবং ডাঃ রায় উভয়ে একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহারা একবার বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সদর অফিসে (৮নং রয়েল এক্স্চেঞ্জ প্লেসে) যাইতেন এবং কমিটির কার্যে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেন। সেই কমিটি হইতে যে য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল বটিকা বিতরণ করা হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। সেই বটিকা প্রস্তুত করিবার ফর্মুলা ডাঃ রায় দিয়াছিলেন। ওই বটিকাকে 'বিধান বটিকা' বলা হইত।

১৯৪৩ সালে মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কংগ্রেস-কর্মীরা 'মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি' নামে একটি সেবা-সমিতি গঠন করেন। নির্যাতিত দেশ-সেবকদ্বয় শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস এবং শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক যথাক্রমে এই সেবা-সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির তমলুক মহকুমার যাবতীয় সেবাকার্য চলিল ওই কমিটির মাধ্যমে। কমিটি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের একদল ছাত্রের সাহায্য ও সহযোগিতায় ৮টি মেডিকেল ইউনিট গঠন করেন। কিন্তু সরকারপক্ষ হইতে কোন প্রকার কুইনাইন সরবরাহ না করায় মেডিকেল ইউনিটগুলির কাজে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। সম্পাদক প্রহ্লাদবাবু কলিকাতায় আসিয়া ডাঃ রায়কে সমস্ত বিষয় জানাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টার অফ্ পাবলিক হেলথ-এর সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রতি সপ্তাহে ৩৮ পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

বিধানচন্দ্রের ধর্মজীবন

বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র এবং মাতা অঘোরকামিনী উভয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চস্তরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্মজীবন পুত্রকন্যাদেরও জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অঘোর-প্রকাশ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহত্যাগ না করিলেও শেষজীবনে তাঁহারা গৃহী সন্ন্যাসীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের অনাসক্ত হইয়া সংসারে বাস, সৎকার্যের অনুষ্ঠান, সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ, পরোপকারসাধন ইত্যাদি আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বজন-পরজন অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। ওই সাধক-সাধিকার জীবনে আমরা দেখিয়াছি—দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্য কার্যগুলি তাঁহারা কিরূপ শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। সময়ের অপব্যবহার বা বৃথা সময় নষ্ট করা তাঁহাদের জীবনে কোন দিন দেখা যায় নাই। তাহাদের জীবনযাপন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মনির্ভরতা ও শ্রমশীলতা।

ওই সমুদয় গুণের কিছু কিছু বিধানচন্দ্রেও বর্তিয়াছে—যেন উত্তরাধিকার সূত্রে জনক-জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনিও ধর্মানুশীলন করিয়া আসিতেছেন। পরমেশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার জীবন-দর্শনের তত্ত্ব-কথা। পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না—এই সত্যোপলব্ধি তাঁহার জীবনের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের একটি ধর্ম-সঙ্গীত বিধানচন্দ্রের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে তিনি সেই সঙ্গীতটি আবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে আরম্ভ হয় তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবনের দৈনিক কাজ। ওই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি প্রদত্ত হইল :—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার বিচিত্র এ ভব সংসারে কর্মপারাবার পারে হে—
নিখিল ভুবনলোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥

তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

পরিবারে যে সকল ধর্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহাতে বিধানচন্দ্র প্রায়ই যোগদান করেন ; কোন কোন উপলক্ষে তাঁহাকে আচার্যের কাজও করিতে হয়। এই সমুদয় অনুষ্ঠান সাধারণতঃ তাঁহার বড় দাদা শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অঘোর-পরিবারভুক্ত নরনারীর চরিত্রের বিশেষত্ব ধর্মানুরাগ। বিধানচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী, খ্যাতনাম্নী কমিউনিস্ট নেত্রী, ভারতীয় লোকসভার সদস্যা শ্রীরেণু চক্রবর্তী (স্বর্গত সাধনচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান) পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন। প্রায় সকলেই কমিউনিস্টদের নিরীশ্বরবাদী বলিয়া জানে। কিন্তু অঘোর-পরিবারে আমরা উহার ব্যতিক্রম দেখিলাম।

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের এক কন্যা কুমারী সুধীরা রায়, এম. এ. লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিধানচন্দ্র স্বয়ং ওই ভ্রাতুষ্পুত্রীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে তাঁহার প্রাণপ্রদীপ নিবিয়া গেল। ভ্রাতুষ্পুত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন বিধানচন্দ্র। তিনিও অন্যান্য শ্মশান-বন্ধুর সহিত শব বহন করিয়া নিয়াছিলেন শ্মশানে। জ্যেষ্ঠ সহোদর শোকাভিভূত। ব্রাহ্ম রীতিতে শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের বাসভবনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়াছিল। বড় দাদার ইচ্ছা—বিধানই আচার্যের কর্তব্যভার গ্রহণ করেন। সেই অনুষ্ঠানের আচার্য-রূপে তিনি যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা সময়োচিত এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রার্থনার আরম্ভ ছিল এইরূপ :—

"হে ভগবান! লোকে বলে আমি একজন ভালো ডাক্তার, আমার নিজেরও যে ওই রকমের ধারণা কিছুটা না আছে তা নয়। কিন্তু এই কন্যাটিকে তো এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারি নি। কন্যাটির তিরোধানে আমার পূর্ব ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, ভগবানের ইচ্ছার ওপর মানুষের কোন চেষ্টা চলে না। হে ভগবান! তুমিই দিয়েছিলে, তুমিই আবার নিয়ে গেলে।......"

ভারতের সেরা চিকিৎসক বিধানচন্দ্র। শুধু স্বদেশেই নয়, ইউরোপ-আমেরিকায়ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরূপে তাঁহার সুখ্যাতি আছে। বহু জনের ধারণা—বিধানচন্দ্র রোগীর ঘরে ঢুকিয়া রোগীর দিকে চাহিলেই রোগ সারিয়া যায়। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে কত সহস্র রোগীকে যে তিনি

মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন রোগী কিংবা রোগীর আত্মীয়স্বজন রোগমুক্তির পরে ডাঃ রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আসিয়া যখনই বলিতেন যে, আপনিই তো বাঁচাইয়াছেন, নইলে কি আর বাঁচিত, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিতেন—এতো ঠিক বলেন নি; আমার কি ক্ষমতা আছে যে, একজন মানুষকে বাঁচাতে পারি? বাঁচিয়েছেন ভগবান, আমি নিমিত্ত মাত্র। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি কলিকাতা ক্রীক রো-এর একটি রোগী সম্পর্কে। তখন ডাঃ রায় তাঁহার ৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। এক ভদ্র পরিবারের হিন্দু বিধবার একমাত্র পুত্রের গুরুতর অসুখ। ডাঃ রায় রোগীটিকে দেখিয়া দোতলা হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন। হঠাৎ কান্না শুনিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ওই বিধবা মহিলা তাঁহার পুত্রের অবস্থা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। রোগীর ঘরে আবার ফিরিয়া যাইয়া বলিলেন, কাল সকালে আমাকে যেন জানান হয় রোগী কি রকম থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কান্না থামিয়া গেল, ডাক্তারের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশা মনে জাগিল, সহৃদয় চিকিৎসক বলিয়াই তো মায়ের কান্নায় তিনি উদাসীন থাকতে পারেন নাই। সান্ত্বনার একটা উপায় তাঁহার চিন্তায় উদয় হওয়া মাত্রই তিনি পুনরায় রোগীর ঘরে যাইয়া ওইভাবে কথা বলিলেন। কয়েক বৎসর পরের কথা। ওই মহিলা তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ডাঃ রায়কে নিমন্ত্রণ-চিঠি দিতে গেলেন পুত্রের শুভবিবাহে। মৃত্যুপথ-যাত্রী কিশোর রোগী কঠিন ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। আজ সে সুস্থ সবল কর্মঠ যুবক। ভদ্রমহিলা ডাঃ রায়ের হাতে নিমন্ত্রণ-চিঠি দিয়া এবং তাঁহার পুত্রকে দেখাইয়া পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কহিলেন—আপনিই তো বাঁচিয়েছেন আমার ছেলেকে, ওর বিয়েতে আপনাকে আসতেই হবে। ডাঃ রায় তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে কহিলেন—আপনি যখন ছেলেকে নিয়ে এসেছেন, তখন আমাকে যেতেই হবে। তবে একটা কথা কিন্তু ঠিক বলেন নি, আমি বাঁচাবার কে? আপনার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন পরমেশ্বর; আমি নিমিত্ত মাত্র। মহিলা বলিলেন—তা বাবা, ঠিকই বলেছেন, পরমেশ্বরই তো বাঁচিয়েছেন, আপনি নিমিত্ত। ডাঃ রায় ওই ভদ্রমহিলা ও তাঁহার একমাত্র পুত্রকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। যথাসময়ে তিনি বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া নববধূকে মূল্যবান উপহার দিলেন। তাঁহার জীবনে এই প্রকারের ঘটনা যে কত ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে।

প্রতিদিন ডাঃ রায়ের কাজ আরম্ভ হয় ভোর ৬টায়। প্রায় দশ বৎসর কাল তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে কাজ করিতেছেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের চিকিৎসা-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকে তিনি প্রত্যহ ২৫।৩০ জন রোগীকে দেখিয়া থাকেন। পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করার কার্যে তিনি আনন্দ পান সর্বাপেক্ষা বেশী। রাত্রি দশটা পর্যন্ত (মধ্যাহ্নে বিশ্রামের কতক সময় বাদে) তাঁহাকে রাশি রাশি কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়—প্রায় পনর ঘণ্টা কাল। এই মহা কর্মযোগীর কর্মানুষ্ঠানের ধারা লক্ষ্য করিলেই মনে হইবে—যেন এক প্রবীণ তপস্বী তপোমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জীবন-দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, কর্তব্যকর্ম সম্পাদনকে তিনি ধর্ম-সাধনা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করেন না। ইহা তাঁহার ধর্ম-জীবনেরই অঙ্গীভূত। তাহা না হইলে পরিণত বার্ধক্যে তিনি এইভাবে একাগ্রচিত্ত হইয়া কর্মের মধ্যে কখনও নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এখন তাঁহার কর্ম—দেশ ও দশের সেবা। ডাঃ রায় তাঁহার ৭৫তম জন্ম-দিনে (১৯৫৬ খ্রীঃ, ১লা জুলাই) জনগণের অভিনন্দনের উত্তর দিবার কালে ভাবাবেগে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা জানান যে, তিনি যেন তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ ও দশের সেবা করিতে পারেন। এইভাবে প্রার্থনা নিবেদনের মধ্য দিয়া কেবল যে তাঁহার সদিচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, ঈশ্বরে তাঁহার ঐকান্তিক নির্ভরও প্রকাশ পাইয়াছে। ডাঃ রায় আরও বলিয়াছেন—"ভারতবাসী বিশ্বাস করেন তাঁহার উপরে আরও একজন আছেন, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন ও সবকিছু নির্দেশ দেন।···ভারত ধর্মপরায়ণ দেশ। সর্বমঙ্গলময় ভগবানই আমাদের একমাত্র পরমাত্মা, ভগবানের প্রতি বিশ্বাসই আমাদের সুখ-শান্তির সহায়ক।"

সোভিয়েট নেতৃযুগল মঃ বুলগানিন এবং মিঃ খ্রুশ্চেভ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন ডাঃ রায়ের সহিত তাঁহাদের কথা প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে তর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই সোমবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"ঈশ্বর আছেন কি না?"

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অবস্থানকালে একজন সোভিয়েট নেতার সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন লইয়া বন্ধুত্বপূর্ণ বাক্য-বিনিময় হয়। এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত ডাঃ

রায় সোভিয়েট নেতার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সোভিয়েট নেতার ধারণা যে, ডাঃ রায় যদি রুশ-দেশবাসী হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই গোঁড়া নাস্তিক হইতেন।

"ডাঃ রায় তদুত্তরে বলেন, বাঙালী হইলে তাঁহারা (সোভিয়েট নেতৃদ্বয়) নিশ্চয়ই ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতেন।

"ব্যাপারটি এইভাবে স্থুরু হয়। সোভিয়েট নেতৃদ্বয় ডাঃ রায়কে রাশিয়ায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি কবে তথায় যাইতে পারিবেন, তাহা জানিতে চাহেন। ডাঃ রায় বলেন, একমাত্র ভগবানই জানেন, কবে তিনি রাশিয়ায় যাইতে পারিবেন।

"ডাঃ রায়ের এই উক্তিতে বিস্মিত হইয়া নেতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—"আপনি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন।"

"ডাঃ রায় 'হ্যাঁ, করি।' 'কিন্তু আপনি তো তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছেন না।' সোভিয়েট নেতা মন্তব্য করেন।

ডাঃ রায় বলেন—তাঁহারা শুধু আলো দেখিতে পান, বিদ্যুৎ অদৃশ্য থাকে। তৎসত্ত্বেও বিদ্যুতের অস্তিত্বে সকলেই বিশ্বাস করেন। স্থতরাং এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি এই অনুমান সত্য। অনুরূপভাবে জগৎ আছে, জন্ম ও পুনর্জন্মের ধারা চলিতেছে; মানুষ, গাছপালা এবং পুষ্পাদির নিয়মিত উন্নতি হইতেছে; ক্ষেত্রে এমন কেহ একজন নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহার নিয়মে এই সকল চলিতেছে। সেই একজনই পরম পুরুষ। তাঁহাকে যদি প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলেও তিনি আপত্তি করেন না।

"স্মিতহাস্যে সোভিয়েট নেতা বলেন—রুশ-দেশবাসী হইলে আমি আপনার মতের পরিবর্তন করিতে পারিতাম।

"হাস্য-ধ্বনির মধ্যে ডাঃ রায় উত্তর করেন—বাঙালী হইলে আপনিও স্বতঃই ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী হইতেন।

"রবিবার ডাঃ রায় তাঁহার জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে ঐ ঘটনা বিবৃত করিয়া জোরের সহিত বলেন, যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণ ভগবানে বিশ্বাস করিবে, ততদিন কম্যুনিস্ট হইবে না। ঈশ্বরহীন দেশের কথা এদেশের জনসাধারণ কল্পনাও করিতে পারিবে না।"

অর্ধশতাব্দীর উর্ধ্বকাল ডাঃ রায় চিকিৎসকরূপে কাজ করিয়া আসিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আসীন থাকাকালে (১৯৪৮ খ্রীঃ জানুআরি মাস হইতে) তিনি সেই কাজ করিতেছেন, তবে রোগীদের নিকট হইতে কোন

ফী নেন না। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরেও প্রত্যহ সকালবেলা ২৫।৩০ জন রোগীকে দেখা তাঁহার প্রথম কার্য। শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"একদিন আমাকে বলেছিলেন, মন্ত্রী হয়ে আগেকার সব কাজই তো সরিয়ে রাখতে হয়েছে সরকারী কাজের জন্য। তা হলেও আমার নিজস্ব কাজটা হাতছাড়া করি নি। আমার নিজস্ব কাজটাই রোগী দেখা। রুগ্ণ মানুষকে সুস্থ করার মধ্যেই আমার প্রকৃত আনন্দ।"

চিকিৎসকরূপে কাজ করার কালে তিনি বহু মুমূর্ষু রোগীকে আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের মধ্যে কতকগুলির সম্বন্ধ রহিয়াছে তাঁহার ধর্মজীবনের সঙ্গে। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর যাত্রা রোধ করিয়াছেন তিনি ইন্টিউইসন (Intuition) বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া। ইন্টিউইসন বলিতে বুঝায় মনের একটা শক্তি যদ্দ্বারা বিনা যুক্তিতে বা বিচার-বিশ্লেষণে সঙ্গে সঙ্গেই সত্যোপলব্ধি হইয়া থাকে। খুব কম মানুষই ওইরূপ শক্তির অধিকারী হন। অনেকের মতে এই প্রকার শক্তি ঈশ্বরদত্ত। সুতরাং ইহাকে ধর্মজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। ওই শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া তিনটি মুমূর্ষু রোগীর প্রাণরক্ষার কাহিনী নিম্নে বিবৃতি করা হইল :—

(১)

কলিকাতার এক শিক্ষিত ধনীপরিবারের একটি ২১।২২ বৎসরের যুবককে একদিন ভোরবেলায় তাঁহার শয্যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখা যায়। যুবক বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। ভৃত্যের জবানি হইতে জানা গেল যে, যুবকটি অধিক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়া শুইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই ডাকা হইল মহানগরীর তিন জন বড় ডাক্তারকে। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ এল এম. ব্যানার্জি এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আসিয়া রোগীকে অত্যন্ত যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। চিকিৎসক-প্রধানত্রয়ের মধ্যে আলোচনাও হইল। রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অতি ক্ষীণ। নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন তিন জনই মুমূর্ষু রোগীর শয্যার পার্শ্বে। অকস্মাৎ ডাঃ রায় ইন্টিউইসন হইতে অবগত হইলেন যে, রোগীর লাম্বার পাংচার (Lumber puncture) করিলে জীবন রক্ষা পাইবে। তিনি বারংবার অনুভব করিতেছেন ভিতর হইতে কে যেন বলিতেছে উহাতেই রোগী সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাঁহার প্রিয়বন্ধু ডাঃ ব্যানার্জিকে চোখের ইসারায় ডাকিয়া

রোগীর ঘরের বাহিরে আনিলেন। ইন্টিউইসনের কথা না বলিয়া তিনি কেবল তাঁহার নিজের মত জানাইলেন এবং ডাঃ ব্যানার্জি তাঁহার নিজের মতের সমর্থন করেন। তারপর দুই জনে মিলিয়া 'স্যার'কে তাঁহাদের অভিমত জানান। ডাঃ নীলরতন সরকারকে তাঁহারা 'স্যার' বলিয়া ডাকেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত একমত হন। তখন ডাঃ রায় রোগীর মাতাকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে—রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে তিনি সম্মতি দিলে তাঁহারা লাম্বার পাংচার করিয়া শেষ চেষ্টা করিতে পারেন; তাহাতে রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে কিংবা ভগবানের ইচ্ছায় বাঁচিয়া যাইতেও পারে। মাতা সম্মতি দিলেন। ডাঃ ব্যানার্জি রোগীর লাম্বার পাংচার করিলেন। আধ ঘণ্টা পরে রোগীর নাড়ীর অবস্থা ভালর দিকে পরিবর্তন হইল, ইহারও কিছুকাল পরে রোগীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। রোগীর জীবন নষ্ট হইল না। ওই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে।

(২)

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ডাঃ রায় তখন থাকিতেন ৮৪ নং হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) ভাড়াটে বাড়ীতে। বিকাল পাঁচটায় তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিজের মোটরগাড়ীতে উঠিয়া স্টার্ট দিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় দেখিতে পান যে, একটি লোক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়া ডাঃ রায়কে জানাইল যে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের (বি. সি. ঘোষের) বাড়ীতে এখনই যাইয়া একটি কলেরা রোগীকে স্যালাইন ইঞ্জেকসন দিতে হইবে। ডাঃ ঘোষ তখন আপার সার্কুলার রোডের একটা বাড়ীতে থাকিতেন। সেই বাড়ীতে এক সময়ে স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও ব্যারিস্টার স্বর্গত পি. মিত্র বাস করিতেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিকটে বলিয়া ডাঃ রায় স্যালাইন ইঞ্জেকসনের যন্ত্রপাতি সেখান হইতে চাহিয়া নেবেন স্থির করিলেন। তিনি সেই দিকেই গাড়ী চালাইয়া যাইতে ছিলেন। হঠাৎ অনুভূতি হইল—ওখানে সেসব পাওয়া যাইবে না, ডাঃ লালবিহারী গাঙ্গুলীর বাড়ীতে পাওয়া যাইবে। ডাঃ লালবিহারী তখন ছিলেন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতালেব (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) কলেরা ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। পূর্বোক্ত আত্মানুভূতি অর্থাৎ ইন্টিউইসনের দ্বারা চালিত হইয়া তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে না যাইয়া গেলেন সোজাসুজি ডাঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, সাধারণতঃ তিনি ওই সময়ে উপরের

ঘরে চলিয়া যান। ডাঃ রায় তাঁহার নিকট যাইয়া বিষয়টি জানাইলে তিনি বলিলেন যে, সমস্ত প্রস্তুত আছে, লইয়া যাইতে পারেন; একটা কলেরা রোগীকে স্যালাইন ইঞ্জেকসন দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন; এইমাত্র খবর আসিল রোগীর অবস্থা ভালর দিকে, স্যালাইন ইঞ্জেকসন লাগিবে না। তৎক্ষণাৎ ডাঃ রায় গাঙ্গুলীকে সঙ্গে লইয়া যন্ত্রপাতি সহ ডাঃ বি. সি. ঘোষের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে ঠিক সময়েই রোগীকে স্যালাইন ইঞ্জেকসন দেওয়া হইল, রোগী মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইল।

(৩)

কর্নেল ডিয়ার, আই. এম. এস. ছিলেন তৎকালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহার স্ত্রী গুরুতর পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। শিলঙের একটি নার্সিং হোমে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা করানো হইতেছিল। কর্নেল ওয়াটার্স, আই. এম. এস. রোগিণীকে চিকিৎসা করিতেছিলেন, অবস্থা খারাপের দিকেই যাইতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে কর্নেল ডিয়ার ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কবে শিলঙে যাইতেছেন? ডাঃ রায় বলিলেন—পরের সপ্তাহে। তখন মিসেস্ ডিয়ারের অবস্থার কথা জানাইয়া ডাঃ রায়কে অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য। ডাঃ রায় যেদিন শিলঙে পৌছিলেন সেইদিন রোগিণীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, ৭২ ঘণ্টা কাল রোগিণী অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছিলেন। কর্নেল ডিয়ার ডাঃ রায়কে সঙ্গে লইয়া যাইয়া রোগিণীকে দেখাইলেন। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক কর্নেল ওয়াটার্সের সহিত ডাঃ রায় যোগাযোগ করিয়া রোগিণী সম্পর্কে কথা বলিলেন। কর্নেল ওয়াটার্স মিসেস্ ডিয়ারের বাঁচিবার আশা অনেক আগেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ডাঃ রায় ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউসন করার প্রস্তাব করিলে কর্নেল এইরূপ মন্তব্য করেন যে—তাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগ সাফল্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, উহার বেশী কিছু নহে। তাঁহাকে ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউসন (দেহে রক্ত দিবার) করার কালে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি ডাঃ রায়কে বলেন যে—তাঁহার পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হইবে না, কেননা গবর্নরের সঙ্গে ১১টায় তাঁহাকে গল্ফ্ খেলিতে হইবে। ডাঃ রায় রোগিণীকে দেখা মাত্র স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞান (ইন্টিউইসন) হইতে অবগত হইলেন যে, ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউসন তাঁহার জীবন রক্ষা করিবে। নার্সিং হোমে দেহে রক্ত দিবার যন্ত্রপাতি ছিল না। ডাঃ রায় কর্নেল ডিয়ারকে সঙ্গে লইয়া গেলেন স্থানীয় আমেরিকান মিশনারী হাসপাতালে। সেখান হইতে যন্ত্রপাতি আনিয়া

তিনি মুমূর্ষু রোগিণীর দেহে ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউসন করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে মিসেস্ ডিয়ারের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে, তিনি চক্ষু মেলিয়াই তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কোথায় আছি? রোগিণী সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সারা শিলঙ শহরে প্রচারিত হইল ডাঃ বিধান রায়ের চিকিৎসার অপূর্ব সাফল্যের সংবাদ। স্থানীয় ভারতীয় সমাজে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য লইয়া কত গল্প চলিল কয়েক দিন ধরিয়া। ইউরোপীয়ান সমাজে—এমন কি গবর্নরের ভবনে পর্যন্ত কর্নেল ডিয়ারের স্ত্রীর বিস্ময়কর আরোগ্যলাভের সংবাদ লইয়া আলোচনা হইল।

ডাঃ রায়ের চিকিৎসা-সংক্রান্ত কার্যে এই প্রকারের ইন্‌টিউইসনের ঘটনা আরও অনেক আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনা ডাঃ রায়ের নিকট হইতেই শুনিয়াছি; তৃতীয় ঘটনা বলিয়াছেন তাঁহার বড় দাদা। পরে সেই বিষয়ে ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্তারিতভাবে জানিয়া নিয়াছি। প্রথম ঘটনা বলিবার দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র এবং বঙ্গীয় বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীনরেশচন্দ্র মুখার্জিও সেক্রেটারিয়েটে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে উপস্থিত ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন—গান্ধীজী একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি রোগী দেখিবার পূর্বে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন কিনা। তিনি কাহার নিকট হইতে ওই কথা শুনিয়াছেন, ডাঃ রায় জানিতে চাহেন। গান্ধীজী কহিলেন যে, একজন পত্রলেখক তাঁহাকে পত্রযোগে উহা জানাইয়াছেন। গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় বলেন যে—তিনি রোগী দেখিবার পূর্বে উপাসনা করেন না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্‌টিউইসন হইতে নির্দেশ পাইয়া থাকেন এবং সেই নির্দেশ মতে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া একটি ক্ষেত্রেও বিফল হন নাই।

ডাঃ রায়ের ধর্মজীবন সম্বন্ধে 'শিক্ষাব্রতী'-সম্পাদক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক যাহা অবগত আছেন তাহা জীবনী-লেখকের অনুরোধে লিখিয়া দিয়াছেন। নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

চব্বিশ পরগনা জেলার কলিকাতার অনতিদূরে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ পদ-রজপূত খড়দহে গঙ্গাতীরে সুন্দর মনোরম পরিবেশে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির। এক সুবিস্তৃত ভূমির উপর ঐ মন্দির এবং আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মচক্র, পাঠাগার, বিদ্যালয়, ছাপাখানা এবং হাসপাতাল। কিছু দিন আগে এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র।

যিনি এগুলি গড়ে তুলেছেন তিনিও সেইখানে বাস করেন। তিনি ছিলেন

কলিকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁর গার্হস্থ্য নাম ইন্দুভূষণ বসু, এম. ডি.। এখন তিনি সংসারত্যাগী পরম বৈষ্ণব,—অযোধ্যার "শ্রী" সম্প্রদায় ভুক্ত, শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস নামে পরিচিত।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর নিজের জায়গায় অধ্যাপকের পদে ডাঃ বসুকে বসিয়ে এসেছিলেন। তিনি ডাঃ রায়ের ছাত্র এবং সহকর্মী। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ডাঃ বসুর আয় ছিল প্রচুর, খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। সংসারিক জীবনে অর্থ, যশঃ, সম্মান অনেক কিছু তিনি পেয়েছেন। সবদিকে প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁকে ভগবান রাখেন তাঁকেই তিনি আবার তাঁরই কাজের জন্য ডেকে ঘরছাড়া করেন। তাই কলিকাতার একজন সেরা ডাক্তার আজ গৃহত্যাগী ভক্ত পরম বৈষ্ণব—নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ লোকসেবায় ব্রতী। সেবা তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে একদিন শ্রদ্ধাস্পদ বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সেই তীর্থ দর্শনে গেলাম। সঙ্গে বন্ধু শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। সেখানে গিয়ে সত্যই আমাদের মনে হল যেন তীর্থে এসেছি। যেমনি মন্দির, তেমনি বিগ্রহ, তেমনি ঐ পরম বৈষ্ণব সেবক। দেখে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি আপনা হতেই জেগে উঠল। সেবক শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস-এর সঙ্গলাভে আমরা ধন্য হলাম। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউকে বারবার প্রণাম জানালাম। আর প্রণাম জানালাম ঐ পরম বৈষ্ণবকে। আমরা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর প্রসাদ পেলাম।

অল্প সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা নানা আলোচনায় বুঝতে পারলাম কত কি জানেন তিনি। কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের ধর্মজীবন সম্পর্কে কথা উঠল। বুঝলাম তাঁর সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানেন এবং তাঁর কথা বলতে ভালো বাসেন। দুইজনের মধ্যে প্রীতি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক দীর্ঘকালের, এবং আজও তা অক্ষুণ্ণ আছে।

বললেন—"একদিন খড়দহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ডাঃ রায় যখন ডাঃ ইন্দুবাবুর নিকট শুনলেন যে তিনি Practice (চিকিৎসা ব্যবসা) ছেড়ে দিচ্ছেন, তখন ডাঃ রায় আনন্দের সঙ্গেই বললেন যে 'তুমি ভালই করছ, কারণ তিনটে P এক সঙ্গে চলে না। তিনটি P-এর অর্থ Profession, (প্রফেসান), Practice (প্র্যাকটিস) and Prayer (প্রেয়ার)'।"

আর একদিন যখন ডাঃ রায় শুনলেন, ইন্দুবাবু মেডিকেল কলেজ,

Practice, এমন কি কলিকাতার সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে খড়দহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ জীউ-এর মন্দিরে চলে যাচ্ছেন তখন ইন্দুবাবুকে একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করেছিলেন সে কথাও বললেন। ডাঃ রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা ইন্দু! তুমি কি তোমার নিজের কল্যাণের জন্য সব ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছ? না জনসাধারণের কল্যাণের জন্য?"

দুই জনের মধ্যে আর একদিন কথাবার্তা হচ্ছিল বড় ডাক্তারের প্রসঙ্গ নিয়ে। ডাঃ রায় ইন্দুবাবুকে বলেছিলেন, "জান ইন্দু! লোকে আমাকে বড় চিকিৎসক বলে, সব রোগ সারাবার সাধ্য আমার নাই, তাঁর যেটা ইচ্ছা সেটাই সারে, বাকি সারে না। আর কি জান, যেখানে চিকিৎসায় সমস্যা আসে, আমি সেখানে ভগবানের নাম করে ঔষধ দিই।"

ডাঃ রায়ের কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু কথা তুললাম—ইন্দুবাবু বললেন—'ডাঃ রায়ের কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা তাঁর সঙ্গে বহু হয়েছে।' ডাঃ রায় ইন্দুবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছেন—"দেখ ইন্দু আমি যেসব কাজ করার চেষ্টা করি, তাঁর সেবা মনে করেই সব সময় করে থাকি।"

এইসব কথার শেষে ঐ পরম বৈষ্ণব ইন্দুবাবু বললেন—"কীর্তনের প্রতি ডাঃ রায়ের যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তিনি কীর্তন এবং ভগবৎবিষয়ক সঙ্গীত শুনতে খুবই ভালবাসেন।"

সেদিন ঐ বৈষ্ণব সাধুর নিকট হতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউকে প্রণাম জানিয়ে আমরা মুক্ত মনে ফিরে আসবার সময় শুধু মনে হতে লাগল —ঐ কর্মব্যস্ত দীর্ঘাকার, রাশভারী রাজনৈতিক নেতার জীবন গড়ে উঠেছে, সেবার মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে। ডাঃ রায়ের জীবনে সেবাই ধর্ম, সেবাই কর্ম। তাঁর জীবনে ভগবানই সবার উপরে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মানুষ বিধানচন্দ্র

আমরা বিধানচন্দ্রকে দেখিলাম বাল্য ও কৈশোর হইতে যৌবন ও পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্যার্থী যশস্বী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, যোগ্য অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও অধিপাল (ভাইস-চ্যান্সেলার), কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান ও মেয়র, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, চিকিৎসক, সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক নেতা, মুখ্যমন্ত্রী ইত্যাদি রূপে তাঁহার কর্মের পরিচয় পাইলাম। এখন আমরা মানুষ বিধানচন্দ্রকে দেখিতে ও বুঝিতে প্রয়াসী হইব। তাঁহার সমবেদনাশীল মন, করুণাসিক্ত হৃদয়, দুঃখী ও দুর্গত জনের দুঃখ-দুর্গতিতে বেদনাবোধ, আর্তত্রাণে আগ্রহ এবং প্রকৃত মানুষের মতো মনোভাব ও কার্য তাঁহার মানুষ রূপটি সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং মানুষ বিধানচন্দ্র আমাদের দৃষ্টিতে সহজেই প্রতিভাত হইবেন। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ওই মানুষটি। পারিশ্রমিক দিতে অসমর্থ বলিয়া কোন রোগী ডাঃ রায়ের চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এইরূপ অখ্যাতি তাঁহার সম্পর্কে কখনও শোনা যায় নাই। রোগীর বাড়ীতে যাইয়া যখনই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন রোগী এত দরিদ্র যে, ফী নিলে রোগীর ঔষধ-পথ্যের খরচ কুলাইবে না, তখনই তিনি ফীর টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই রকমের ঘটনার অন্ত নাই ডাঃ রায়ের জীবনে। এককালে ডাঃ রায়ের শিলঙে নিজের বাড়ী ছিল। বায়ু পরিবর্তন ও বিশ্রামের জন্য তিনি বৎসরের মধ্যে দেড়মাস কি দুই মাস সেখানে যাইয়া থাকিতেন। তথায় অবস্থানকালে একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি যাইয়া দেখিতে পাইলেন—রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। রোগীর মৃত্যু হইলে দুঃস্থ ব্রাহ্মণসন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার মতো স্বজন-বান্ধব কেহ নিকটে ছিল না। ডাঃ রায় ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজে উদ্যোগী হইয়া সে ব্যবস্থা করিলেন। অর্থের ব্যবস্থা এবং লোক জোগাড় করা হইল। তিনি শব-বাহকদের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজেও শব বহন করিয়া শ্মশানে গেলেন। অত বড় একজন চিকিৎসককে শ্মশান-বন্ধুরূপে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন। ওই মৃত ব্যক্তি ছিলেন

বাংলার বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে সন্ন্যাসী সোহং স্বামী) আত্মীয়।

ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. বি. সিউড়ীর (বীরভূম) একজন যশস্বী ডাক্তার, লোকসেবক এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী। ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘকালের পরিচয়। তাঁহার নিজের জানা কয়েকটি ঘটনা তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ওই সমুদয়ের মধ্য দিয়াও মানুষ বিধানচন্দ্রকে জানিবার সুযোগ হইবে। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ঘটনাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১)

৩৬নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে বীরভূমের এক রোগিণী তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এসেছেন ভোরে। ডাঃ রায়কে দেখাবেন। সাতটা বেজে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী তখন রোগী দেখছেন। হঠাৎ শব্দ কানে গেল ভীষণ আর্তনাদের। পুলিশ রুখল, বল্‌লে—“মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে—আমার দারুণ যন্ত্রণা।” সিউড়ী হাসপাতাল হতে রোগিণী ফিরে এসেছে। ডাঃ রায়ের কানে গেল। তিনি পরিচারকদের বললেন—“ওর কি বলবার আছে জেনে এসো।” সিউড়ী হাসপাতালের একটা হল্‌দে টিকেটে লেখা—নাকে malignant tumour অর্থাৎ Cancer জাতীয়। সেইটি নিয়ে ডাঃ রায়ের সামনে ধরতেই তিনি লিখে দিলেন—“Admit Cancer Institute.” রোগিণীকে সঙ্গে সঙ্গেই ক্যান্‌সার হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

(২)

সকাল আটটা। ঘরের রোগী দেখা হয়ে গেছে। পার্সন্যাল য়্যাসিস্টাণ্ট্ সরোজ বাবু এসেছেন ফাইলের স্তূপ নিয়ে। সঙ্গে ঢুকলেন এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—“ওঁর কি চাই?” সরোজ বাবু একখানা দরখাস্ত বের করে বল্‌লেন—এঁর স্বামী টেলিফোন এক্স্‌চেঞ্জের কেরানী, যক্ষ্মারোগে ভুগছেন। যাদবপুর যক্ষ্মাহাসপাতালে ভর্তি হয়ে যে কয় দিন বেতন পেয়েছিলেন, হাসপাতালে মাসিক প্রায় দুই শত টাকা দিয়েছেন। তার পরেও সর্বস্ব বিক্রি করে হাসপাতালে দিয়েছেন। এখন ওঁর স্বামী বেতনও পান না, সংসারও চলে না। ডাঃ

রায় সেই দরখাস্তের উপর লিখলেন—"Admit free bed." এই করুণার স্রোত তাঁর অন্তরে-বাইরে নিত্যই প্রবাহিত হচ্ছে।

(৩)

একটি কুলী তার ছেলেকে নিয়ে এক কোণে বসেছিল; সঙ্গে তার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রিপোর্ট। ছেলেটির পায়ে ছিল বৃহৎ Sarcoma জাতীয় অর্বুদ। ডাঃ রায় নিজেই বললেন—কি চাও? দেখলেন দিন সাত এই দরিদ্রকে; তিনি নিজেই লিখে দিয়েছেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীটিকে ভর্তি করে রোগীর এক্স্‌রে ও রক্তাদির পরীক্ষার রিপোর্ট পাঠাতে। কাগজপত্র পড়ে বললেন—আবার কি, কি আর হবে! শুনে কুলীর মুখ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হল। তা দেখে ডাঃ রায় বললেন—আচ্ছা দেখছি। বলেই রোগীকে ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

(৪)

একটি সুদর্শন সুবেশ যুবক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, কেবল উঁকিঝুঁকি মারছেন। তিনি দেখলেন—ভিতরে বসে আছেন শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী। ছেলেটি ছুটে এসে বললে—"হরিদা! ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন?" হরিদা' বললেন—"কি দরকার? এখন আর নয়, দুপুরে পারব।" ছেলেটি বললে—আমি স্টেট্‌ ট্র্যান্স্‌পোর্টে ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়েছি। কিন্তু এক হাজার টাকার জামিন দিতে পারছি না। গ্রিণ্ড্‌লে ব্যাঙ্ক আমার বাড়ী বন্ধক রেখে surety হতে চেয়েছিল, কিন্তু ডিরেক্টার তাতে রাজী নন।" হরিদা বললেন—"আইন তাই।" ছেলেটি বল্‌লে—"তা হলে দাদা, আমার চাকরিটা চলে যাবে।" হরিদা বললেন—"আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিব।" শুনলাম—ডাঃ রায় লিখে দেওয়ায় ডিরেক্টার বাড়ী বন্ধকীতেই জামিন নিতে রাজী হলেন। ছেলেটির চাকরি হয়ে গেল। এই রকমের সহৃদয়তার ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রাণের মধ্যে; কিন্তু সব তো আমরা দেখতে পাই না।

ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। কলিকাতায়, ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন হইতে তিনি ডাঃ রায়ের সহিত পরিচিত। ,মানুষ বিধানচন্দ্র' নামক তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ দৈনিক বসুমতীর

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুলাইয়ের সংখ্যায় ডাঃ রায়ের ৭৪তম জন্মদিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে কতক উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"উনিশ কুড়ি কি একুশ সাল। আমি তখন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আদর্শ পিতৃদেবের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বাড়ী থেকে চলে এসেছি। একটা চাকরি জোগাড় ক'রে কায়ক্লেশে কলেজের মাইনেটা জোগাড় হ'ল। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বইয়ের দরকার, কেনার টাকা কোথায়? এমনিই চলছিল। হঠাৎ একদিন ডিসেকসন-হলে পরিচালকের নির্দেশ এল—কানিংহামের প্র্যাকটিক্যাল এ্যানাটমির বই সঙ্গে না আনলে তিনি আর আমাকে ডিসেকসন করতে দেবেন না। মহা সমস্যায় পড়লুম। আমার সঙ্গে একই বাড়ীতে ডিসেকসন করত বর্তমানে পি. জি. হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্নেল এন. সি. চ্যাটার্জী। তার বই নিয়ে মাসখানেক চালালুম। ইতিমধ্যে জনকয়েক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিল—আমার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় কোন রকমে একবার ডাঃ বিধানচন্দ্রকে ধরা। এক নতুন সমস্যা জাগল—তাঁর কাছে যাই কি ক'রে? যাই হোক, অবশেষে দ্বিধা কাটিয়ে ভয়ে ভয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখা হ'লে সমস্ত কথা খুলে বললুম। স্বল্পভাষী বিধানচন্দ্র উত্তরে আমাকে ক'টি কথা বলেছিলেন। তাঁর সেই দরদী কণ্ঠের ধ্বনি আজও আমি শুনতে পাই—যা জীবনের বহু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে আমায় প্রেরণা জাগিয়েছে। —"তুমি বিদ্রোহী। বাবার সঙ্গে মতের মিল হয়নি, তাই চলে এসেছ বাড়ী থেকে। বেশ! মনে রেখো, বিদ্রোহীর জ্বালা অনেক। দেখ, আমরা ব্রাহ্ম, ছেলেবেলা থেকেই আমরা বিদ্রোহী, আমরা জানি।"—আর কিছু না ব'লে তখনই একটি শ্লিপ লিখে দিলেন এক বইয়ের দোকানে। সেখানে শ্লিপটি দেখাতেই সঙ্গে সঙ্গে কানিংহামের দু' ভলিউমের প্র্যাকটিক্যাল এ্যানাটমি বার করে দিল আমাকে। বই দু'খানা হাতে পেয়ে সেদিন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এসে গেছল। পরের দিন কলেজে এসে সকলকে জানালুম সমস্ত ব্যাপারটা। তখন কথায় কথায় জানা গেল, শুধু আমিই নয়, আমার মত অজানা অভাবী আর দুর্দশা-গ্রস্ত অনেক ছাত্রকেই ডাঃ রায় তাঁর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর নামে বই কিনে দিয়ে, স্কুল-কলেজের মাইনে দিয়ে নানাভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। আজকের কৃতী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা ছাত্রাবস্থায় এমনিভাবে ডাঃ রায়ের কাছে সাহায্য পেয়েছেন।

"১৯৩৮। একটি ছাত্রের সাহায্যের জন্যে ডাঃ রায়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে একদিন হাজির হলুম তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মাখনবাবুর কাছে। মাখনবাবু কী একটা খাতা পড়ছিলেন। হঠাৎ কোন্ এক কাজে মাখনবাবু বাইরে যেতে চোখ পড়ল খাতার ওপর। দেখি, ডাঃ রায়ের কাছ থেকে মাসিক দশ টাকা থেকে দেড় শ' টাকা সাহায্য পাওয়া ব্যক্তিদের এক বিরাট তালিকা।

"এই ত সেদিনের কথা। শুভ ঠাকুর যাবে ইউরোপ-আমেরিকার নানা দেশে তার শিল্পকলার নিদর্শন দেখাতে। প্রস্তুতির জন্য কয়েক হাজার টাকার প্রয়োজন। বেচারা বহু চেষ্টার পর প্রায় হতাশ হয়েই একদিন আমার বাড়ীতে এসে হাজির হল। শেষে শ্রীসারদা দাস আর আমি তাকে পরামর্শ দিলুম—তুমি আর এখানে সেখানে সময় নষ্ট না করে একবার ডাঃ রায়ের কাছে যাও, দেখবে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সে ত শুনেই চমকে উঠল। এও কি সম্ভব? তা ছাড়া শুধু আমার কথার ওপর বিশ্বাস করে এত টাকা দেবেনই বা কেন? সবচেয়ে বড় কথা—তাঁর মত রাশভারী লোকের কাছে গিয়ে একথা বলব কি ক'রে। এইটেই আসল কথা। আমার বহুদিন আগের নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ল। তাকে বললুম—"দেখ একথা বহু কাল আগে আমারও একদিন মনে হয়েছিল। আজও তোমরা ঐ মানুষটিকে চিনলে না।

"দিনপাঁচেক পরে হঠাৎ শুভ এসে হাজির। দেখা হ'তেই মহানন্দে আমাকে জানাল যে, ডাঃ রায় দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সমস্ত চিন্তা দূর ক'রে দিয়েছেন।"

আরও দুইটি ঘটনা ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জির প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) প্রতিষ্ঠার পর বহুদিন পর্যন্ত সেই কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হইত কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাইয়া। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহারা পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকেও কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাইতে হইত পরীক্ষা নিতে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল কি করিয়া সে সম্বন্ধে ডাঃ মুখার্জি লিখিয়াছেন:—

"ডাঃ রায় একবার হঠাৎ বলে বসলেন, পরীক্ষা দু' কলেজেই হবে। যতদূর মনে পড়ে এই ব্যাপারে আর একটি লোক তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ প্রমথ নন্দী। আই.এম.এস.-রা গেলেন ক্ষেপে, বললেন, এ অসম্ভব। ডাঃ রায়ও বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, 'ওঁরা যদি আমাদের কলেজে এসে পরীক্ষা নিতে রাজী না হন, তাহলে

আমরাও তাঁদের কলেজে যাব না। অবশেষে ডাঃ রায়েরই জয় হল। ব্রিটিশ আই. এম. এস.-রা বাধ্য হয়ে কারমাইকেল কলেজে গিয়ে পরীক্ষা নিতে রাজী হলেন।

"আমার বন্ধু হুগলীর সিভিল সার্জন ডাঃ ভূপেন মুখার্জি তখন School of Tropical Medicine-এর ডেপুটি ডাইরেক্টর। ডাইরেক্টর আর ডাঃ ভূপেন দুজনে মিলে বহু পরিশ্রমে প্রায় তিন মাস ধরে হাসপাতালের বাজেট তৈরি ক'রে ফেললেন। আত্মপ্রসাদ হোল, বাজেট তাঁদের নির্ভুল। এতে গোলমালের আর কোন অবকাশ নেই। যাই হোক, একদিন সন্ধ্যায় বিধানচন্দ্রের কাছে হাজির হ'লেন ওঁরা। বিধানচন্দ্র তখন সবেমাত্র ফিরেছেন ক্লান্তদেহে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে মনও শ্রান্ত। প্রথমে ত বাজেট দেখতেই চাইলেন না। পরে বহু পীড়াপীড়িতে বসে গেলেন বাজেট পরীক্ষায়। সে কী অখণ্ড মনোযোগ! পাঁচ মিনিট পরেই বিধানচন্দ্র আবিষ্কার করলেন এক বিরাট গণ্ডগোল। ওঁরা ত অবাক! যে বাজেট ওঁরা তৈরি করলেন তিন মাস ধ'রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে, তার ভুল তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিধানচন্দ্রের চোখে পড়ল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।"

ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জি বর্ণনা করিয়াছেন আর একটি ঘটনা—যাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, এক দল ছাত্রের আত্মমর্যাদাবোধের অভাব দেখিতে পাইয়া ডাঃ রায় কিরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন ; তবে বিরক্তি সত্ত্বেও ছাত্রদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত জানিয়া প্রতিকার করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই :—

"চিরদিনই ডাঃ রায় ছাত্রদের দরদী বন্ধু। আমরা তখন ছাত্র। একবার হোল কি, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ মনস্থ করলেন ছ'মাসের ছুটি নিয়ে বিলেত যাবেন। আমাদের পরীক্ষা সেজন্য নিদিষ্ট সময়ের ছ' মাস এগিয়ে এল। ছেলেদের মাথায় অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। এখন যে লেকচার, ডিসেকসন অর্ধেক বাকী। দলের পাণ্ডা বর্তমানে সিউড়ির ডাক্তার কালীগতি ব্যানার্জী বাৎলালেন, একবার যদি ডাঃ রায়ের পা জড়িয়ে সব কথা নিবেদন করা যায় তা হ'লেই এই বিপদ থেকে মুক্তি। পরের দিন দল বেঁধে হাজির হলুম ডাঃ রায়ের বাড়ীতে। দলে ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান ডেপুটি মেয়র ডাঃ অমরনাথ মুখার্জী, পি. জি. হাসপাতালের কর্ণেল এন. সি. চ্যাটার্জি, আরও অনেকে। সবাই ভিড় না ক'রে জনকয়েক তাঁর ঘরে

ঢুকে তাঁর পায়ে পড়লুম। তাঁর পায়ে পড়তেই মহা চটে গেলেন। কয়েক হাত দূরে পিছিয়ে গিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "উঠে দাঁড়িয়ে মানুষের মত কথা বল, তোমাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেখাও।" আমরা ত ভয়ে যা বলবার ছিল কোন রকমে সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। এত জল্পনা-কল্পনা সব মাটি। এক রকম নিরাশ হয়েই ফিরলুম সেদিন। তারপর হঠাৎ খবর এল যে, পরীক্ষার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যথা সময়েই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেদিন ডাঃ রায়ের কাছ থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষার শিক্ষাই নিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু আজ আরও বুঝেছি যে, ন্যায়নিষ্ঠ বিধানচন্দ্র যখনই বুঝলেন, নিরীহ ছাত্রদের ওপর একজন কর্তৃপক্ষের খেয়ালের জন্যে অন্যায় অবিচার হচ্ছে তখনই তিনি তার প্রতিকার করেছিলেন ন্যায় আর সত্যের খাতিরে।"

রাজনীতিক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্রতি বিধানচন্দ্র ব্যবহারের মধ্য দিয়াও মানুষ বিধানচন্দ্রের বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। পীড়িত রাজনীতিক কর্মীদের নিকট হইতে তিনি চিকিৎসার জন্য ফী নিতেন না। দরিদ্র কিংবা দুর্দশাগ্রস্ত বুঝিতে পারিলে রুগ্‌ণ দেশকর্মীকে বিনা-পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করা ব্যতীতও তিনি নানাভাবে সাহায্য করিতেন। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশসেবকদের প্রয়োজন যে কত বেশী, তাহা ডাঃ রায়ের অজানা ছিল না। যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্যাতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার তুলনা নাই। সেই মনোভাব সহকর্মীদের সহিত তাঁহার সাধারণ ব্যবহারেও প্রকাশ পাইত। এই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। ঊনবিংশ অধ্যায়ে ("ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনঃ-প্রবর্তন প্রসঙ্গ") লিখিয়াছি যে, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন উপলক্ষে আমি ডাঃ রায়ের সঙ্গে রাজসাহী বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি জেলায় পরিভ্রমণ করিয়াছি। প্রতিযোগিতা ছিল নব-গঠিত ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে। রাজসাহী বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আত্মীয় ও সতীর্থ বিপ্লবী নেতা স্বর্গত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্ত। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে আমি ডাঃ রায়ের সহিত রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর এবং জলপাইগুড়ি শহরে প্রচারকার্যে যাই। একই গাড়ীতে আমরা যাতায়াত করিয়াছি এবং অবস্থানকালে একই গৃহে বাস করিয়াছি। তখন ডাঃ

রায়ের বয়স ৫২ বৎসর, আমার বয়স ৪৫ বৎসর। আমি তাঁহার সাত বৎসরের ছোট হইলেও তিনি আমাব সুখ-সুবিধা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাঁহার ওই সজাগতায় আমি অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিতাম। তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণে বা ব্যবহারে মনে হইত—যেন আমি তাঁহার অতিথি হইয়া সঙ্গে চলিয়াছি। সহকর্মীর প্রতি এমনই তাঁহার আচরণ বা ব্যবহার।

জলপাইগুড়ি শহরে আমরা পৌছিলাম ৭ই অক্টোবর (১৯৩৪ খ্রীঃ) সন্ধ্যায়। স্থানীয় আর্য নাট্য-সমাজ হলে এক জনসভায় ডাঃ রায় কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কিত প্রস্তাবের সমর্থনে এক ঘণ্টার অধিক কাল বক্তৃতা দিলেন। আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল স্থানীয় কংগ্রেসনেতা ও যশস্বী চিকিৎসক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের বাড়ীতে। সভার কার্য সমাপ্ত হইতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের চারুবাবুর বাড়ীতে যাইয়া আহার করার সময় ছিল না। দুইজন ভৃত্য আহার্য দ্রব্যাদি স্টেশনে আনিয়া আমাদের প্রথম শ্রেণীর নির্দিষ্ট গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। তাহারা বাসনগুলি লইয়া যাইবার জন্য অন্য গাড়ীতে উঠিল এবং কয়েকটি স্টেশনের পরে গাড়ী থামিলে ওইগুলি লইয়া যাইবে বলিয়া গেল। ডাঃ রায় বাথ-রুমে যাইয়া হাত-মুখ ধুইয়া আসিলেন। আমাকে য়্যান্টিসেপ্‌টিক লোশনের শিশিটা দেখাইয়া বলিলেন—"যাও হাত-মুখ ধুয়ে এসো, লোশন দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিও।" আমি বাথ-রুম হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, একটি ছোট টেবিলের উপর তিনি খাবার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুইজনের পৃথকভাবে খাইবার বাসনাদি থাকা সত্বেও তিনি ব্যবস্থা করিলেন একই থালায় একই সঙ্গে খাইবার। বলিলেন—"এসো, খেতে বসে যাও।" দেখিলাম খাওয়ার বেলায়ও ডাঃ রায়ের লক্ষ্য আমার খাওয়ার দিকেই। ভাত, ডাল, মাছ, ভাজি, মাছের ঝোল, তিন-চার রকমের তরকারি, টক, দই, মিষ্টি—এইগুলি ছিল আহার্য। দুইজনই আমরা পরিশ্রান্ত, তৃপ্তির সঙ্গে খাইলাম। খাইতে খাইতে যে পদ তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, সেইটির দিকে তৎক্ষণাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তখনকার দিনে আহারকালে তাঁহার বাচবিচার দেখি নাই। আহারে বসিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত আমি অনুভব করিলাম অতিথির সমাদর আমি পাইতেছি। বিধানচন্দ্র ভারত-বিশ্রুত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিক নেতা, কলিকাতার অভিজাতশ্রেণীর সম্মানিত ব্যক্তি। রাজনীতিক-ক্ষেত্রে আমি তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ একজন সহকর্মী—বড় জোর

মফঃস্বলের একটি ছোট জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং কংগ্রেসের প্রচার-কার্য উপলক্ষে যাতায়াত এবং আহারাদি ব্যাপারে নেতার সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা তো আমারই প্রাথমিক কর্তব্য। সেই বোধ থাকা সত্ত্বেও আমার নেতার সস্নেহ আচরণ বা ব্যবহার আমাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল।

বিধানচন্দ্রের সঙ্গে যাতায়াত কালে কিংবা কোন কাজ করার সময়ে আমার মতো অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য হয় তো আরও অনেকের হইয়া থাকিবে। সেই শ্রেণীর অন্ততঃ একজনের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি হইলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ইউনাইটেড্ প্রেস অব্ ইণ্ডিয়ার পরিচালক-সম্পাদক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত। তাঁহার একটা প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"একদিন গল্প করেছিলেন বিধানচন্দ্র। দিল্লী যাবার পথে রেলে তাঁর কামরায় আমাকে সহযাত্রী করে নিয়েছিলেন। তাঁকে সেবার নিবিড়-ভাবে দেখবার ও একান্তভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁর পথ-যাত্রার শ্রান্তি দূর করে দেবো। কিন্তু সারা পথ তিনিই আমার যত্ন নিলেন, কামরাটি পরিষ্কার করে রাখলেন।"

এই স্থলে উল্লেখ করিব ডাঃ রায়ের জীবনের একটি ছোট ঘটনা—যাহার মধ্য দিয়াও মানুষ বিধানচন্দ্রের সাক্ষাৎ মিলিবে। বিলাত হইতে শিক্ষা-সমাপনান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুকাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডের বাড়ীতে বাস করিতেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার দাদা দেখিতে পাইলেন যে, বিধান ঘরে নাই। অত রাত্রিতে সে কোথায় গেল ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন এবং তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রিতে বিধান ফিরিয়া আসিলে দাদার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে,—ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে একটি রোগীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে একটা ঔষধের মাত্রা ঠিকমতো দিয়াছিলেন কিনা দেখিতে। ঔষধটার মাত্রা খুব কম না হইলে রোগীর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে হঠাৎ সে কথা বিধানের মনে জাগায় তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হইলেন রোগীর বাড়ীর দিকে। সৌভাগ্যক্রমে ব্যবস্থাপত্রে ভুল হয় নাই। ৪৭।৪৮ বৎসর পূর্বের কলিকাতা শহর—ট্যাক্সি, রিক্সা কিছুই ছিল না; তারপর অত রাত্রিতে ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডের মতো অঞ্চলে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীও দুষ্প্রাপ্য ছিল। যাওয়া-আসায় প্রায় ছয় মাইল পথ তাঁহাকে

হাঁটিতে হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে শুধু বিধানচন্দ্রের তীক্ষ্ণ কর্তব্য-বোধের পরিচয় মিলিবে তাহা নহে, একটি দরদী অন্তঃকরণেরও সন্ধান পাওয়া যাইবে।

মানুষ বিধানচন্দ্র সম্বন্ধে একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সাহিত্যিক শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দরদী অন্তঃকরণের পরিচয় দিতে হলে বহুদিন পূর্বের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২২৮ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, ১২ নং ফ্ল্যাটে এক সময় ভাড়াটে ছিলেন মনোরঞ্জন চৌধুরী। স্ত্রী ও দুটি মেয়ে নিয়ে তিনি সেখানে বাস করতেন।

তাঁর হলো কঠিন ব্যারাম। জ্বর ও খুশ্‌খুশে কাশি। অনেক বড় বড় ডাক্তাব দিয়ে তাঁর চিকিৎসা হলো। প্রথমে হলো জ্বরের চিকিৎসা, তারপর হলো নিউমোনিয়া।

দীর্ঘকাল চিকিৎসা হলো, কিন্তু 'কেস্‌' ক্রমশঃ খারাপ হয়ে চললো। অবশেষে স্থির হলো ডাক্তার রায়কে 'কল্‌' দেওয়া হবে। কিন্তু সমগ্র পরিবার তখন দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে নেমে এসেছে। উপার্জনকারী ছিলেন মনোরঞ্জনবাবু একা। দীর্ঘকাল তিনি শয্যাগত, তার ওপর চিকিৎসার খরচ। কাজেই ডাক্তার রায়কে 'কল্‌' দেওয়ার মত সামর্থ্য তাঁদের ছিল না বললেই চলে। তবু স্ত্রী ইন্দুলেখা চৌধুরীর একান্ত আগ্রহ—ডাঃ রায়কে 'কল্‌' দিবেনই, তবু যদি স্বামীকে বাঁচানো যায়!

অবশেষে অনেক-কিছু বিক্রি করে ডাঃ রায়কে কল্‌ দেওয়া হলো। ডাঃ রায় এলেনও যথাসময়ে।

ছোট্ট ফ্ল্যাট, তেতলার ওপর। ডাঃ রায় তাঁর স্বাভাবিক হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন। মনে হলো, রোগীর অর্ধেক জ্বালা-যন্ত্রণা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেলো! মনোরঞ্জন বাবু শুয়ে শুয়েই হাত তুলে তাঁকে স্বাগত নমস্কার করলেন।

ডাঃ রায়ের সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি সারা ঘরখানির ওপর দিয়ে বিদ্যুতের মত চলে গেল, সম্ভবতঃ রোগীর রুচি ও আর্থিক অবস্থা বুঝতে তাঁর কিছুমাত্র দেরী হলো না।

মনোরঞ্জনবাবু শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র; তাঁর পত্নীও ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল খুবই সুখের।

মনোরঞ্জনবাবু নিজেও ছিলেন মার্জিতরুচি ও সুপুরুষ। এতদিন ব্যারামে ভুগেও তাঁর স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ডাঃ রায় রোগীকে পরীক্ষা করলেন, তাঁর যেসব চিকিৎসা হয়েছে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার সবকিছু জেনে নিলেন ও প্রেসক্রিপশন্‌গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রীকে, আপনাদের পুরুষ-আত্মীয় আশেপাশে কেউ নেই কি?

"আছেন, তিনি আমার দেবর, শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চৌধুরী। কালীঘাটে থাকেন। মাঝে মাঝে এখানে আসেন ও দেখেশুনে যান।"

ঐ সামান্য দুটি কথাতেই বোধ হয় ডাঃ রায় অনেক কিছু বুঝে নিলেন। সম্ভবতঃ বুঝে নিলেন যে, মনোরঞ্জনবাবু বড্ড বেশী অসহায়। তিনি বললেন, তাঁকে একবার এখানে ডাকিয়ে আনুন না! আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, আপনার মেয়েদের একটিকে নিয়ে সে সরোজ-বাবুর বাড়ীতে চলে যাক্, ও তার কাকাকে ডেকে নিয়ে আসুক। আমি ততক্ষণ রোগীর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি।

ইন্দুলেখা দেবী বিস্ময়ে অবাক্! এত বড় ডাক্তার, বিধান রায়, তিনি তাঁর নিজের গাড়ী দিচ্ছেন রোগীর ভাইকে আনানোর জন্য? যাহোক্, সেই ব্যবস্থাই হলো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সরোজবাবু এসে উপস্থিত হলেন।

পরস্পর সম্ভাষণের পর, ডাঃ রায় তাঁকে বললেন, সরোজবাবু! আপনি রোগীর ছোট ভাই। আপনার দাদা দীর্ঘকাল ব্যারামে ভুগছেন। আপনার অসুবিধা হলেও, এমন সময় একটু ঘন ঘন তাঁর খোঁজখবর নেওয়াই আপনার পক্ষে সঙ্গত হবে। কারণ, আমি দেখছি, এঁরা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

আপনাকে ডাকিয়েছি এইজন্য যে, রোগীর সঙ্গে গুটিকয়েক কথা আপনাকে —মানে, কোন male member-কে বলব বলে।

আমি বুঝতে পারছি যে, মনেরেঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ভক্ত। এত দুর্যোগেও তাঁরা এলিয়ে পড়েন নি। শেষকালে আমায় 'কল্' দিয়েছেন, আমি যদি কোন সুরাহা করতে পারি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি কোন আশাই দিতে পারছি না। রোগীকে আমি পরীক্ষা করেছি, তাঁর যা চিকিৎসা হয়েছে, তারও সব-কিছুই দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আগাগোড়া এঁর একটা ভুল চিকিৎসাই হয়েছে!

রোগীর চিকিৎসা হয়েছে নিউমোনিয়ার। কিন্তু রোগীর হয়েছে 'গ্যাংগ্রীণ', ও তা হয়েছে lungs-এর ওপরে। রোগী কাশছে, আপনারা

দেখছেন দুর্গন্ধ গয়ের বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এ জিনিস গয়ের নয়, এ পুঁজ, ফুস্‌ফুসে যে গ্যাংগ্রীণ হয়েছে তারই pus, কাজেই এত দুর্গন্ধ।

আমার মতে, অপারেশন্‌ ছাড়া এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের আর কিছু করবার নেই। অপারেশন্‌ হলেও বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। সে অবস্থায় এখন অন্য কোন চিকিৎসা করাতে পারেন, যাতে একটু শান্তিতে থাকতে পারেন।

আর দিন পনেরো আগে পেলে আমি হয়তো এঁর কোন উপকার করতে পারতাম, কিন্তু এখন একেবারে অসাধ্য।

ডাঃ রায় ক্লান্ত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, কিছুকাল নীরব থেকে আবার তিনি বলতে স্বরু করলেন, আপনায় লুকিয়ে কোন লাভ নেই। কাজেই মর্মান্তিক হলেও আমাকে বলতে হচ্ছে। কিন্তু এতে ঘাবড়ানো আপনাদের সাজে না। যাঁরা বিশ্বকবির সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা অনেক উন্নতি বলেই আমি বিশ্বাস করি।

বিশেষতঃ মরতে আমরা সকলেই বাধ্য। আমি ডাক্তার বিধান রায়, মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য লোকে আমায় ডেকে আনে। কিন্তু আমি কি নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? আমাকেও যে একদিন যেতে হবে নিশ্চয়।

কাজেই মৃত্যু আমাদের অবধারিত। আমরা কেউ তা এড়াতে পারি না। মনোরঞ্জনবাবুরও সে সময় এসে গেছে। এতে আর দুঃখু করে কোন লাভ নেই। বিশেষতঃ মনোরঞ্জনবাবু ভাগ্যবান পুরুষ। আমি এ বাড়ীর প্রতিটি আসবাবপত্র, প্রতিটি পুঁথি-পত্তর ও ছবি দেখেই বুঝতে পারছি, রুচি এঁদের কত মার্জিত! মুষ্টিমেয় আসবাবপত্র দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি কি কঠিন দৈন্য-দশা এঁদের ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে গেছে! সোফা আছে, তার বালিশটা নেই; সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে, তার আয়নাটা নেই। এসব সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরিচায়ক। ভাগ্যবান্‌ তিনি এই হিসেবে, তিলে তিলে এমন ভাবে দারিদ্র্যবরণ করেও তাঁর স্ত্রী তাঁকে বাঁচানোর জন্য কত চেষ্টাই না করেছন। তাঁর ও বাচ্চা মেয়ে দুটির মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়, কি কঠোর সেবাই না এঁরা মনোরঞ্জনবাবুর করেছেন!

কাজেই মনোরঞ্জনবাবু ভাগ্যবান্‌! দরিদ্র হলেও, এঁর সমগ্র পরিবার মনের দিক্‌ দিয়ে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী!

যাহোক্‌, এখন আমার উপদেশ হচ্ছে, এলোপাথিক মতে আর কিছু না করাই ভালো। আপনারা এখন এঁকে শান্তিতে কাটাতে দিন। আর এ ক'টা দিন আপনি দু' বেলা এসে এঁদের তদারক করুন, এই হচ্ছে আমার অনুরোধ।"

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ডাঃ রায় সেখান থেকে চলে এলেন, আর সমস্ত ফী তিনি দিয়ে এলেন মনোরঞ্জনবাবুর মেয়েটিকে। বল্লেন, "এ তোমাদের কাজে লাগবে মা। এ টাকা রেখে দাও। টাকা নিংড়ে নেবার party আমার যথেষ্ট আছে মা, তোমাদের কাছ থেকে পারি না।"

ডাঃ রায়ের সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের অন্তরালেও যে এমন এক মরুনদী লুকিয়ে আছে, সে খবর রাখে ক'জনা ?

মানুষ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"গত প্রায় দশ বৎসর কাল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা তাঁহাদের রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে তাঁহাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরূপে পাইয়া তাঁহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ কার্যধারা দেখিয়া এবং তাঁহার বিভিন্নরূপ কর্মপ্রতিভার সহিত পরিচিত হইয়া বিস্ময়াভিভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মুখ্যমন্ত্রীরূপে তিনি বিভিন্ন বিভাগের কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকটি কাজ সুষ্ঠুভাবে পালনের দ্বারা দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। বিধানসভা ও বিধান-পরিষদের অধিবেশনে তিনি যে বাগ্মিতা ও বাচন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যেক শ্রোতাকে অভিভূত করে। তিনি এমনই ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্ন যে, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কার্যধারার আলোচনার সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বাক্যে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিধানচন্দ্র তখনই তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহুদিন সকাল ও বিকালে—দুই বেলাতে তাঁহাকে ৭।৮ ঘণ্টা কাজে বিধানসভা-গৃহে অতিবাহিত করিতে হয় ; তিনি কখনও প্রায় অনুপস্থিত থাকেন না, সভাগৃহে অনুপস্থিত থাকিলেও সেই সৌধের একাংশে নিজ নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়া তিনি সকল কথা শ্রবণ করেন এবং উত্তর প্রদানের প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক কথার ঠিকমত উত্তর দিয়া থাকেন। বহু সময়ে আমরা তাঁহাকে একসঙ্গে দুইটি কাজ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। তিনি বক্তৃতা শুনার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্রাদি পাঠ বা সরকারী কাগজপত্র পরিদর্শন করিয়া থাকেন—সে সময়ে বক্তৃতার যে অংশ উত্তরদানযোগ্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে অংশগুলিও নোট করিয়া থাকেন।

১৩৬২ সালের শ্রাবণ মাসের 'জনশিক্ষা' পত্রিকায় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"তিনি যখন একই সময়ে ২টা কাজ করে যান, তখন আমরা আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারি না। একদিন যখন তাঁর কাছে একটা দরকারী বিষয় অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে বুঝিয়ে বলছিলাম, তখন দেখি তিনি আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাগজও পড়ছেন এবং তাতে দাগ দিচ্ছেন। আমার হঠাৎ মনে হল, তিনি হয়তো আমার কথা ঠিকমত শুনছেন না। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য যখন আমি কতকগুলো এলোমেলো কথা বলতে সুরু করলাম, তখন তিনি তা বুঝতে পেরে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি এসব বাজে কথা বলছ কেন, কাজের কথা বলে যাও। একদিকে যেমন তাঁর এই ক্ষমতা দেখে আমার মনে আনন্দ হল, আর একদিকে তেমনই নিজে ভুল বুঝেছিলাম বলে অত্যন্ত দুঃখ হল।"

এই বয়সে তাঁর স্মরণশক্তি কত প্রখর, তাহা ভাবিয়া সকল সময়েই অবাক হইয়া যাই। বিধানসভার সদস্য হইয়া প্রায়ই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইত এবং আমার কেন্দ্রের নানা সমস্যা লইয়া তাঁহার কাছে দরবার করিতে যাইতে হইত। তাহা ছাড়া হঠাৎ এমনই দেখা হইয়া গেলে, তিনি আমায় কোন সমস্যা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন ঐ রকম হঠাৎ দেখা হইলে আমি তাঁহাকে একটা হাসপাতাল-সমস্যার কথা বলেছিলাম। তারপর মাস-খানেকের মধ্যে আর একদিন হঠাৎ দেখা হইলে—অন্য কোন সমস্যার কথা মনে না পড়ায়—সেই হাসপাতালের কথাই আবার উত্থাপন করি, সেদিন তিনি আমার কথায় ভাল করে কর্ণপাত করেন নাই। তখন কারণটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, হয়তো কোন অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, তাই আমার কথা ভাল করিয়া শুনিবার সুযোগ পান নাই। তাহার প্রায় ২ মাস পরে একটি দরকারী কাজে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। সেদিন ঘরে বিশেষ ভিড় ছিল না—কাজেই অনেকক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল। দরকারী কথা ছাড়াও অন্য দুই-চারিটা কথা বলিবার সুবিধা হইয়াছিল। যখন সব কথা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন তিনি জিগির দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কিছু বলবার নেই? আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলে তিনি বলিলেন—হাসপাতালটার কথা ভুলিয়া গিয়াছি কি না, তা তো পরীক্ষা করিয়া দেখিলে না? আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করিলাম। তাঁহার যে স্মরণ-শক্তি কত প্রখর, তা জানা না থাকায় সেদিন তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছিলাম; তিনি সে কথা মনে রাখিয়াছেন—আমাকে সে দিন তাহা বুঝাইয়াও দিয়াছিলেন।

তাঁহাকে কোন দরকারী কাজের কথা একবারের বেশী দুই বার বলার প্রয়োজন হয় না—তাহা গত ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়েও দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখন তিনি নিজের নির্বাচন ও সারা পশ্চিম-বঙ্গের নির্বাচন লইয়া সর্বদা ব্যস্ত। আমি একটি ব্যক্তিগত অভিযোগের কথা একদিন সকালে যাইয়া বলিয়া আসি। দুই-তিন দিন পরেই ঠিক জায়গা হইতে আমার আহ্বান আসে। গিয়া শুনিলাম—বিধানচন্দ্র আমার অভিযোগের কথা যথাস্থানে জানাইয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিধানচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া যাইল।

আমরা যৌবনেই বিধানচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশা করার সৌভাগ্য লাভ করি। আমাদের ব্যারাকপুর অঞ্চল হইতে নির্বাচনে দাঁড়াইয়া ১৯২৩ সালে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আমি ত ছাত্রাবস্থাতেই সাংবাদিকের কাজ আরম্ভ করি এবং 'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা' হই। অর্থাৎ গ্রামের সকল প্রয়োজনেই আমার উপস্থিতি ও সহযোগিতার দরকার হইত। কাজেই ১৯২৩ সালে বিধানচন্দ্র রায় ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়াই পাড়ায় পাড়ায় ভোট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। সেটা বড কথা নয়—তার কয়েক বৎসর পরেই একজন ছাত্রের প্রয়োজনে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিধানচন্দ্রের গৃহে যাইয়া হাজির হই। বিধানচন্দ্র সব কথা শুনিয়া তখনই ছাত্রটিকে সাহায্য করার জন্য তাঁহার এক বন্ধুকে এক পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ও সঙ্কোচের সঙ্গে ছাত্রবন্ধুকে বিধানবাবুর বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম। বিধানবাবু যে আমাদের মত লোককে মনে রাখিবেন এবং আমাদের কথা শুনিয়া আমাদের বন্ধুকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তা তখন ধারণা ছিল না। সেজন্য সেদিন তাঁহার সহৃদয়তা ও উদারতা আমাদের মনকে উল্লসিত ও গৌরবান্বিত করিয়া দিয়াছিল। সাল ঠিক মনে নাই—তবে ১৯২৫—২৬ সাল হইবে।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ১৯নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট হইতে 'ফরোয়ার্ড' ইংরাজী দৈনিকের সঙ্গে 'বাংলার কথা' বাংলা দৈনিক প্রকাশিত হয়। সে সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে দৈনিক বসুমতীর কাজ ছাড়িয়া 'বাংলার কথা'র বার্তা-সম্পাদকের কাজ করিতে যাই। ঐ 'বাংলার কথা' নাম ডানকুনি রেল দুর্ঘটনার মামলার সময়ে 'বঙ্গবাণী' হইয়াছিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখন কলিকাতার রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত—পাঁচ জন প্রধানের একজন। পাঁচ জন ছিলেন—(১) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (২) নলিনীরঞ্জন সরকার (৩) নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (৪) শরৎ-

চন্দ্র বসু ও (৫) তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। পাঁচজনের মধ্যে আজ মাত্র একজন জীবিত আছেন—তাঁহার কথাই আজ লিখিতেছি। 'বাংলার কথা'র কর্মী বলিয়া সে সময়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছিল। সে সময়ের একদিনের ঘটনা হইতে মানুষ বিধানচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৯৩০ সাল—আমার অগ্রজ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রথম অবস্থাতেই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় মহাশয়ের পরামর্শমত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে রোগী দেখানো হইয়াছে। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর আমার কনিষ্ঠ সহোদর নৃপেন্দ্রনাথকে ও আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন—তাঁহাদের গৃহে সেইজন্য আমাদের সর্বদা যাতায়াত ছিল—নৃপেন্দ্রনাথ প্রায়ই সে গৃহে বাস করিতেন। সেজন্য প্রথম দিনই ডাক্তার কুমুদশঙ্কর নিজে আমার দাদাকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই হইতে তিন মাস কাল রোগী ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চিকিৎসাধীন ছিল—ডাক্তার কুমুদশঙ্কর প্রায়ই আমাদের আগড়পাড়ার বাড়ীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্রের নিকট রিপোর্ট দিতেন—সে সময়েই একদিন শ্রদ্ধেয় (বর্তমান মন্ত্রী) শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় ডাক্তার কুমুদশঙ্করের সহিত আগড়পাড়ায় আসিয়াছিলেন—কয়েকবার তিনি সে কথা গল্প করিয়াছেন। সে যাহা হউক—ঐ সময়ের এক দিনের ঘটনা এইরূপ—

প্রত্যহ বেলা ২টার সময় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে যাইয়া রোগীর অবস্থার কথা জানানো আমার কর্তব্য ছিল—সব কথা শুনিয়া ডাক্তার রায় প্রয়োজনবোধে ঔষধ পরিবর্তন করিয়া দিতেন। সে সময়ে জ্যৈষ্ঠ মাস—দারুণ গ্রীষ্ম। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ঐটুকু পথ—ট্রামে পয়সা দিতে মন যায় না—রোদে হাঁটিয়া যাইতেও কষ্ট হয়। তবু হাঁটিয়া যাই। পর পর ২।৩ দিন রোগীর অবস্থা একই রকম আছে ডাক্তার রায়কে খবর দিয়া আসিয়াছি। রোগীর উন্নতি বা অবনতি হইতেছে না। বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে প্রায় একশত লোক আসিয়া ডাক্তার রায়ের সহিত দেখা করিয়া যায়। আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমি ত ডাক্তার রায়কে টাকা দিই না—বিনা টাকায় রোগীর চিকিৎসা করাইতেছি। একদিন রৌদ্রের তেজ বেশী দেখিয়া মনে করিলাম—আজ আর যাইব না—কাল যাইয়া খবর দিব—সেদিন কোন নূতন খবরও ছিল না। কাজেই যাইলাম না। পরদিন যথাসময়ে ডাক্তার রায়ের কাছে

যাইয়া হাজির হইলাম—আমাকে দেখিয়াই ডাক্তার রায় রোগী কেমন আছে জানিয়া লইলেন। তাহার পর ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া বলিলেন—"কাল তুমি না আসায় আমি রোগীর সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তুমি আজ না আসিলে আমি কুমুদশঙ্করকে টেলিফোন করিতাম।" আমি ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ডাক্তার রায় যে আমার অনুপস্থিতির কথা মনে রাখিয়াছেন—ইহাতে শুধু বিস্মিত হইলাম না—একজন দরিদ্র রোগীর সম্বন্ধে তাঁহার দরদ দেখিয়া এই মহাপুরুষের মহত্ত্বে অভিভূত হইয়া গেলাম। কত উদারতা, কত সহৃদয়তা থাকিলে তবে মানুষ এই ব্যবহার করিতে পারে। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে—ডাক্তার রায়ের স্মৃতিশক্তি এখনও একটুও কমে নাই। কিছুকাল পূর্বে বিধানসভায় একদিন স্বর্গত শিক্ষামন্ত্রী বক্তৃতা করার সময় একটি হিসাব পাঠ করিবার সময় অসাবধানতাবশতঃ একটা ভুল অঙ্ক বলিয়াছিলেন—নিকটেই ডাক্তার রায় বসিয়াছিলেন—তিনি সেই অঙ্কটি যে ভুল তাহা দেখাইয়া দিলে তখনই শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু মহাশয় নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী হইবার পূর্বেও তাঁহার কর্মক্ষেত্র ক্ষুদ্র ছিল না। তিনি দীর্ঘকাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (বর্তমান আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের (বর্তমান কুমুদশঙ্কর যক্ষ্মা হাসপাতাল) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সহিত তাহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই ডাক্তার রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—পরিচালক। তাহা ছাড়া প্রায় আজীবন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন—হিসাব সমিতির সভাপতিরূপে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবপত্র নিখুঁতভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সময় হইতে এ কার্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজও করিতে হইয়াছে। যাদবপুরস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিতও তিনি দীর্ঘকাল নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়া আজ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ রূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়ররূপেও তাঁহাকে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিতে দেখা গিয়াছে। যে সময়

তিনি মেয়রের কাজ করিতেন, সে সময়ে সভায় যোগদান করা ছাড়াও তিনি প্রত্যহ কিছু সময় কর্পোরেশন অফিসে মেয়রের ঘরে বসিয়া সকল অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। সে সময়ে আমাকে পর পর কয়েকদিন তাঁহার কাছে যাইতে হইয়াছিল। এক এক দিন কিছু সময় করিয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া থাকিয়াছি ও দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে সূক্ষ্ম হিসাবপত্র দেখিতেন ও প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে কর্তব্য সম্পাদনের সময় তাহার অতীত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ খবর লইতেন। সে সময়েও কোন কর্মচারী তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকাইতে পারিত না—তিনি এত বেশী স্মরণ-শক্তি রাখিতেন যে মিথ্যা কথা বলিলেই তাহা ধরা পড়িয়া যাইত।

প্রায় সাত বৎসর পূর্বের আর একটি ঘটনা এখানে বিবৃত করিব।

বিধানচন্দ্রকে এমনই দেখিলে অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আসলে তিনি তাহা নহেন। আমাদের অঞ্চলে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এক খণ্ড জমি এক ধনী কারখানার মালিক জমিসংগ্রহ আইন অনুসারে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করে। পণ্ডিত মহাশয়ের জমিটুকু এক পাশে ছিল—সেটুকু বাদ দিলে কারখানা বিস্তারের কোন অসুবিধা হইবে না বলিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া একদিন তদানীন্তন রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কাছে গেলাম। বিমলবাবু বলিলেন—সে বিষয়ে বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার নির্দেশ লিখিয়া দিয়াছেন—এখন আর কিছু করা সম্ভব নহে। তবে আমি অন্য কাজে ডাক্তার রায়ের কাছে যাইব—আপনি সঙ্গে গিয়া নিজে তাঁহাকে এ বিষয়ে বলিতে পারেন। কাজেও তাহাই হইল। বিমলবাবু অন্য ফাইল হাতে লইয়া তাহা দেখাইবার জন্য বিধানচন্দ্রের ঘরে ঢুকিলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম। জমির কথা বলিতেই তিনি স্বভাবসুলভ জোর গলায় উত্তর দিলেন—সে জমি কোম্পানি গ্রহণ করিয়াছে—এখন আর সে বিষয়ে কিছু করা যাইবে না। আমি তাঁহার পাশে বহুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম—খুব নীচু গলায় তাঁহাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলাম—আপনি যদি গরীবের স্বার্থ না দেখেন, তবে কে তাহা দেখিবে। ধনীর কোন অসুবিধা হইবে না—অথচ গরীব ব্যক্তি জমিটুকু ফিরাইয়া পাইবে। আপনি গরীবের বন্ধু—তাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ও বারবার একটা কথা বলার পর তিনি বিমলবাবুকে বলিলেন—ফণী, অনেক কথা বলিয়াছে, তাহার কি করা যায় একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।

আমার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল; নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার পর অবশ্য বিমলবাবুই জমি সম্বন্ধে যাহা করিবার করিয়া দিয়াছিলেন। ঠিকভাবে তাঁহার নিকট আবেদন করিতে পারিলে যে ফল পাওয়া যায়, সেদিন তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। বাহির হইতে হয়তো তাঁহাকে কঠোর প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে তিনি কত নরম প্রকৃতির লোক তাহা এই সামান্য একটি ঘটনা হইতে বুঝা যায়।

গত জানুআরি মাসে একদিন সকালে কামারহাটি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেলা ৮টার পরে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাসগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, ঢুকিয়া শুনিলাম, তিনি বাহির হইয়া যাইতেছেন, ভিতরের উঠানে মোটরে চড়িয়া বসিয়াছেন। চালককে ইঙ্গিত করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলাম ও আমার নিবেদন তাঁহাকে জানাইলাম। একটি সভায় তাঁহাকে যাইতে হইবে। তিনি কিছুতে রাজী হইবেন না—আমিও ছাড়িব না। গাড়ীতে বসিয়া দুই চারিবার না বলার পর শেষ পর্যন্ত আমার কথায় সম্মত হইলেন ও ডায়েরীতে তাহা লিখিয়া লইলেন। তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। বহু সময়ে আমরা বহুবার উহা লক্ষ্য করিয়াছি। অনুগতের প্রতি কৃপা করা মানুষের ধর্ম—তাঁহার মধ্যেও সে ধর্মের অভাব নাই। সে দিন অসময়ে যাইয়া—তাঁহাকে আটকাইয়াও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই—ইহাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

ডাক্তার রায়ের সম্বন্ধে গল্প বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার মত লোককে আমরা আমাদের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, নেতারূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, সে কথা বারবার শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এবং তাঁহার ৭৬ তম জন্মদিনে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দুঃস্থ পশ্চিমবঙ্গকে সুপথে পরিচালিত করুন—আমরা এই দিনে তাঁহাকে শ্রদ্ধাপ্রণাম জানাইয়া ধন্য হই।"

ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"...ডাঃ রায়ের মতো পরিশ্রমী ও সময়নিষ্ঠ মানুষ আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর দেখি না। বিশ্রাম, অবকাশ বা আলস্য তাঁর ধাতে নেই। অতি প্রত্যূষে তিনি ওঠেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত রকমারি ছোট-বড় কাজে

ব্যাপৃত থাকেন। বয়স তাঁর সত্তর পার হয়ে গেছে—এ বয়সে এ দেশের বেশির ভাগ লোকই হয়ে যান অকর্মণ্য এবং কেউ কেউ পূজা-আহ্নিক ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। অনেকেই আর কিছু করেন না, শুধু করেন যুগ-ধর্মের নিন্দা ও অতীত স্মৃতির রোমন্থন। এই একজন মানুষ দেখি, যিনি পুরানোকে আঁকড়ে না থেকে সাহস ও আগ্রহের সঙ্গে সবকিছু নূতনকে স্বাগত করতে জানেন। তাই চিত্তের সরসতা ও কর্মশক্তির বিচারে তিনি একজন যুবকই, পড়া তাঁর বয়স যতই হক। আর স্মৃতিশক্তিও তাঁর অসামান্য। মানুষ, ঘটনা ও দিন তারিখ, কিছুই তিনি ভুলে যান না।

কিন্তু এসবের চেয়ে বড় হল তাঁর সরস বাক্‌শক্তি। তাঁর প্রত্যেকটি কথা তিনি বলেন হাসতে হাসতে এবং অনেক ভারী কথাকেও হাস্য-পরিহাসের আবরণে সাজিয়ে পরিবেশন করেন। তাই তাঁর হুকুমও ধরে অনুরোধের চেহারা, ভর্ৎসনাও হয়ে ওঠে আদরের নামান্তর। এ জিনিসটাই হল তাঁর অন্তর-প্রকৃতির দর্পণ। বৃহৎ ব্যক্তি যাঁরা, যাঁরা বড় পদে ও বড় কাজে আছেন, সাধারণতঃ তাঁরা হন অতিশয় রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। তাই তাঁদের কাছে ক্ষুদ্র মানুষরা সর্বদাই থাকেন সঙ্কুচিত হয়ে—মনকে মুক্ত করে দিতে ভরসাই পান না। কিন্তু ডাঃ রায়ের সঙ্গে অকিঞ্চিৎকর মানুষও অবাধে গল্প করতে পারেন। এমন কি, তর্ক করতেও ভয় পান না। আর মজা এই যে তাঁর দাক্ষিণ্যের দরজা বিরুদ্ধ-কথা বললেও বন্ধ হয় না কোন দিন কারুর মুখের ওপর।

রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র, বিশেষতঃ শাসকের আসন কোন দিন সমালেচনা-অতীত নয়। ডাঃ রায়েরও সমালোচনা করেন অনেকে। কিন্তু কোলাহলময় রাজনীতিক জীবনের আড়ালে প্রতিদিনের মানুষটি যদি হন কর্মনিষ্ঠ, সহৃদয়, সদাজাগ্রত কৌতুকের আধার, তাহলে তাঁকে ভালো না বেসে পারেন কি কেউ? এই সর্বজনীন অনুরাগের অধিকারী হতে পেরেছেন ডাঃ রায় এবং এ তাঁর সবচেয়ে বড় সফলতা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাছাকাছি গেছি কয়েকবার এবং প্রত্যেকবারই তাঁব অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। এক যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত দরিদ্র যুবকের জন্যে একবার গিয়েছিলাম আবেদন করতে। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—শুধু তাই না, তাকে দাঁড়াবার মতো একটা জায়গাও করে দিয়েছিলেন। আর একবার গিয়েছিলাম সাহিত্যিকদের একটি দলের সঙ্গে—কোন কোন বইয়ের বিরুদ্ধে নীতি-বিরুদ্ধতার অভিযোগ উঠলো। সেবারও তিনি একই রকম উদারতা

দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সুনীতির দুর্নীতির মাঝখানের লাইনটা বড় সূক্ষ্ম, কিন্তু আইনের বিধানটা মোটা। তাই এর জন্য বিশেষজ্ঞদের একটা উপদেষ্টা সমিতি থাকা ভাল। তবে ভাবনা নেই, সাহিত্যিকদের কোমরে কেউ দড়ি পরাবে না। তাতে বাংলাদেশই লজ্জা পাবে যে!

কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন তিনি, সাহিত্য আমি বুঝি-টুঝি না। কিন্তু দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে তিনি অতিশয় যত্ন করে পড়েছেন এবং কবিতা বা গান নয়, বহু গদ্যাংশও তাঁর কণ্ঠস্থ। পেশায় যিনি ডাক্তার, কর্মক্ষেত্র যাঁর প্রসারিত রাজনীতির রাজ্যে, তাঁর এই সাহিত্যানুরাগের খবরই বা কজন রাখেন? আর একবারের কথা, এককালীন মেয়েদের প্রসঙ্গ বলতে বলতে তাঁর প্রসিদ্ধ উচ্চহাসি হেসে বললেন, মেয়েরা সত্যিই জেগেছে হে! আমাকে একজন সেদিন 'শালা' বলেছিল!

এই বিচিত্র মানুষটিকে সমগ্রভাবে জানা ও জানানোর প্রয়োজন আছে।"

কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্পর্কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"এই শালপ্রাংশু মহাকায় পুরুষটি একজন পুরুষসিংহ—এতে কোন সন্দেহ নেই। অসাধারণ মানুষদের খুব সান্নিধ্যে যেতে আমি স্বতঃই একটা কুণ্ঠা অনুভব করি। দূর থেকে ডাঃ রায়ের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করবার যেটুকু সুযোগ পেয়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে, এই মানুষটি একজন অসাধারণ কর্মবীর। ওঁর অভিধানে অলসতা কথাটি নেই। তখন চোখ কাটানো হয় নি। ডাঃ রায়ের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ভালো করে দেখতে পান না। তবু কর্তব্যে অণুমাত্র শৈথিল্য নেই। মুখ্যমন্ত্রী মোটা লেন্স্ চোখের সামনে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাইল দেখে চলেছেন। শাসন-বিভাগের সমস্ত ক্ষেত্র তাঁর নখদর্পণে। বিপক্ষের প্রশ্নের শরজালের সম্মুখে মেজাজ দেখিয়ে একটাও বেফাঁস কথা তিনি বলেন না। জবাবের মধ্যে মাঝে মাঝে খোঁচা থাকে; ব্যঙ্গোক্তি করেন না, এমন নয়। তাঁর রসবোধ প্রচুর; হাসির গানের ডি. এল. রায়ের সগোত্র। কিন্তু রুচি কি মার্জিত! সৌজন্যবোধ কি সুতীব্র! ইংরাজীতে যাকে বলে hitting below the belt —এ জিনিস ডাঃ রায়ের আচরণের মধ্যে কখনও দেখিনি। অশোভন কথা তাঁকে বলতে কখনও শুনিনি।

ভোটের ঘণ্টা বাজছে এবং ডাঃ রায় তাঁর আসনে অনুপস্থিত—এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ে না। বিধানসভার কংগ্রেসী দলের একজন সদস্য হিসাবে যা করণীয়—সেই কর্তব্য পালনে তাঁর ঔদাসীন্য কোনদিন দেখিনি। যাকে বলে beating about the bush—অনেক বক্তার বক্তৃতায় তারই অভিব্যক্তি শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। ডাঃ রায়ের ভাষণের মধ্যে বাজে কথা থাকে না। ওজন করে তিনি কথা বলেন। সেই ভাষণ আবেগে কখনও কখনও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বৈশিষ্ট্য ভাষার সংযমে, বিচারবুদ্ধির প্রতি অনুরাগে। তাঁর বক্তৃতা বন্যাবেগে শ্রোতাকে ভাসিয়ে দেয় না, যুক্তির ঘা মেরে মেরে বক্তব্যকে মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়। তার আবেদন সকল সময়ে শ্রোতার বুদ্ধির কাছে, তার হৃদয়াবেগের কাছে নয়।

আমরা যখন ছাত্রজীবনে স্কাউট ছিলাম, তখন আমাদের প্রত্যেককে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটা ছিল Be prepared. ডাঃ রায় এই অমূল্য আদর্শকে জীবনে সত্য ক'রে তুলেছেন। সব সময়েই তিনি প্রস্তুত। কোন কাজ ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখেন না। এইজন্যে বিপক্ষ পার্টির প্রশ্নবাণের সম্মুখে ডাঃ রায়কে কখনো অপ্রস্তুত হতে দেখিনি।

ডাঃ রায়ের অনেক ভাষণের মধ্যে মুমূর্ষু রাবণের সেই বিখ্যাত উপদেশ-বাক্যের বারংবার উল্লেখ দেখতে পাই। রাবণ রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—'আগামী কালের কাজ আজ করো; আজ সন্ধ্যায় যা করবে বলে মনে করেছ, তা কর আজকের অপরাহ্ণে। কর্তব্য কাজ কখনো ফেলে রাখতে নেই। কে জানে, কার জীবনে কখন সন্ধ্যা হয়।' আমার মনে হয় মুমূর্ষু রাবণরাজার এই অমূল্য উপদেশ-বাক্যটি ডাঃ রায়ের জীবনের উপরে গভীর রেখাপাত করেছে। আমাদের জীবন রাঙিয়ে যায় আমাদের আদর্শের রঙে। কর্তব্যকাজ কখনো ফেলে রাখতে নেই—এই আদর্শের বীজ কোন দূর অতীতে ডাঃ রায়ের চিত্ত-ভূমিতে উপ্ত হয়েছিল জানিনে। কিন্তু বীজ ব্যর্থ হয় নি। আদর্শকে তিনি জীবনে ফলবান করেছেন। এরকম কর্মী-পুরুষ যথার্থই দুর্লভ।

আমরা বেশীর ভাগ মানুষই জড়তার কাছে হার মানি। এ কাজ করবো, সেকাজ করবো—এ রকমের সংকল্প ভাবাবেগে আমরা অনেকেই গ্রহণ করি—কিন্তু সেই সব সংকল্পকে কাজে পরিণত করি কয়জন? সদিচ্ছা মনের মধ্যে সদিচ্ছাই থেকে যায়,—আচরণে আর মূর্ত হয়ে ওঠে না।

একটা গয়ংগচ্ছভাব আমাদের জাতীয় চরিত্রের যেন বৈশিষ্ট্য। হচ্ছে, হবে—এই রকমের একটা দীর্ঘসূত্রতার জন্যেই আমরা কোন কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারিনে। ঠাকুর বলতেন, 'ঢিমে তেতালা হলে হবে না।' অধিকাংশ নরনারীর কাজকর্মে, চালচলনে ঐ ঢিমে তেতালা ভাব। ঠাকুরের ভাষায়: 'যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাদ্‌ভ্যাদ্‌ করছে।' ডাঃ স্বতন্ত্র জগতের মানুষ, জীবনে কোথাও শৈথিল্য নেই।

ডাঃ রায়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু বার্ধক্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। কে বলে বয়স তাঁর সত্তরের সীমা পেরিয়ে গেছে? যেন সাতাশ বছরের যুবক। কোথাও একটু আড়ষ্টতা নেই। যাকে বলে Dynamic personality.

যৌবনের গরিমাকে এইভাবে ধরে রাখতে পারা নিশ্চয়ই যে সে লোকের কর্ম নয়। এজন্যে discipline-এর, সংযমের প্রয়োজন আছে। ডাঃ রায় আহারে বিহারে সংযমী। পার্টি-মিটিং-এ মুখরোচক আহার্যের ব্যবস্থা থাকে। ডাঃ রায়ের টেবিলে খাবারের প্লেট পূর্ণই থাকতে দেখি। কেবল চা খান। জিহ্বার উপরে কী কন্‌ট্রোল? প্রজ্ঞার আলোতে জীবন নিয়ন্ত্রিত! বুদ্ধির লাগামে ইন্দ্রিয় সংযত!

সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর বলিষ্ঠ আশাবাদ। একটা আদর্শকে যদি তিনি দেশের ও দশের পক্ষে শুভ বলে একবার মনে করেন, তাকে ফলবান করবার জন্যে মরিয়া হতে তিনি ভয় পান না। জয়-পরাজয় তাঁর কাছে তখন তুচ্ছ। কারণ a courageous effort consecrates an unhappy end. সাহসের সঙ্গে কাজ করে যাব—ফল যাই হোক না। নিয়তং কুরু-কর্মত্বম্—গীতার এই শিক্ষা ডাঃ রায়ের জীবনে ফলবতী হয়েছে। তিনি যথার্থই কর্মবীর।"

ডাঃ রায় একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং কর্মব্যস্ত নেতা। তিনি রাষ্ট্র-পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যে দিবারাত্রি ব্যাপৃত থাকেন। সেজন্য কাহারও কাহারও ধারণা যে, তাঁহার প্রাণে সরসতা নাই। কিন্তু ওই ধারণা একে-বারেই ভুল। তিনি ক্রীড়ামোদী, সঙ্গীতানুরাগী এবং রহস্যপ্রিয়। ব্রীজ খেলিতে তিনি খুবই ভালোবাসেন এবং সেই খেলায় তিনি এত দক্ষ যে, তাঁহাকে কেহ হারাইতে পারে না। শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে যাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে,—ডাঃ রায় এমন ভাগ্য নিয়া জন্মিয়াছেন যে, জীবনে কোন ক্ষেত্রেই তাঁহার অদ্যাবধি পরাজয় হয় নাই। তিনি রহস্যালাপে কিরূপ পটু: সেই বিষয়ে স্বনামখ্যাত সাংবাদিক মিঃ কে. পি.

টমাস তাঁহার প্রণীত জীবনী ('Dr. B. C. Roy') গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এলাহাবাদে আনন্দভবনে স্বর্গত মতিলাল নেহরুর বাসভবনে গান্ধীজীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন ডাঃ রায়, ডাঃ আন্সারি এবং আরও জনকয়েক। স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুও তখন সেখানে ছিলেন। তিনি রহস্যালাপ করিতে খুব ভালোবাসিতেন। হঠাৎ মিসেস্ নাইডু ডাঃ রায়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ডাঃ রায়, আপনার বয়স তো পঞ্চাশের কাছে এসে পৌছল, কিন্তু তা হলে কি হবে; আপনার গালে দেখি এখনও টোল খায়। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন ডাঃ রায়—আর আপনি ত পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন; এও আপনার চোখে পড়ে দেখছি। জবাব শুনিয়া গান্ধীজী প্রাণখোলা হাসি হাসিলেন। ডাঃ রায় যে একজন দক্ষ ও নিপুণ ব্যবস্থাপক বা পার্লামেণ্টারিয়ান-রূপে খ্যাতি ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন, ইহার অন্যতম কারণ তাঁহার রহস্যপ্রিয়তা। তিনি আইন-সভায় কার্যরত থাকাকালে বিপক্ষদলের উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও ধৈর্যচ্যুত হন না এবং নিজে সুযোগমতে রহস্য করিতে এবং অপরের রহস্য উপভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সম্প্রতি ওইরূপ একটা ঘটনার উপভোগ্য বর্ণনা আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০শে জুন বৃহস্পতিবার (১৯৫৭ খ্রীঃ) ংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মন্ত্রীরা কি কচ্ছপ ?

গতকল্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের জনৈক সদস্য রাজ্যের মন্ত্রীদের কচ্ছপের সহিত তুলনা করিলে সভাকক্ষে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

ঐদিন সাধারণ শাসনখাতে ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে শ্রীযতীন চক্রবর্তী (আর. এস. পি.) পূর্বতন মন্ত্রিসভার কোন এক মন্ত্রীর উক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মন্ত্রীরা প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় গুটগুট করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আসেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় আসিয়া উঁহাদের চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখেন। তাঁহারাও চুপচাপ থাকেন। বেলা ৫টা বাজিলে মুখ্যমন্ত্রী আবার তাঁহাদের উল্টাইয়া দেন এবং তাঁহারা গুটগুট করিয়া চলিয়া যান। মন্ত্রীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বলিয়া কিছুই নাই—মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠেন, বসেন—ইহাই বক্তা বলিতে চাহেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিতর্কের উত্তরদানকালে এক সময় বলেন যে, তিনি যখন রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ প্রবেশ করেন, তখন কোন মন্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না। শুধু ঝাড়ুদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে তখন ঘর ঝাঁট দিতে থাকে। রাইটার্স

বিল্ডিংস্ ত্যাগ করার সময়ও ঐ ঝাড়ুদারের সঙ্গেই দেখা হয়। তখনও তাহাকে তিনি ঝাঁট দিতে দেখেন। মন্ত্রীরা তখন থাকেন না। শ্রীচক্রবর্তী তাঁহার বক্তৃতায় এক সময়ে যখন বলেন যে, রাজ্যসরকারের দুইজন ক্রীড়ামোদী মন্ত্রীর (শ্রীসিদ্ধার্থ রায় ও শ্রীভূপতি মজুমদার) ন্যায় তাঁহারও ক্রীড়ার প্রতি বিশেষ উৎসাহ আছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, দেখিবেন, আপনিও তাহা হইলে কচ্ছপ বনিয়া যাইবেন (হাস্য)।

১লা জুলাই ৭৬তম ১৯৫৭ খ্রীঃ জন্মদিনে বিধানচন্দ্রের বাড়ীতে "একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একখানি জীবনী-গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় ডাঃ রায়কে মালা-চন্দনে ভূষিত করা হয়। জীবনী-গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ও প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক 'ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত' গ্রন্থখানি ডাঃ রায়ের হাতে অর্পণ করেন।" (যুগান্তর)

জীবন-চরিত গ্রন্থখানি ডাঃ রায়ের হাতে অর্পণ করিলে তিনি প্রচ্ছদপট দেখিয়া তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে মন্তব্য করেন—'বেশ ত দেখতে!' গ্রন্থকার বলেন—'বাইরে ত দেখতে বেশই।' ডাঃ রায় কহিলেন—'ভেতরের বিচার করবেন—পাঠক-পাঠিকারা।' ঠিক ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিলেন বিধানসভার সদস্য আরামবাগের ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এবং রাধা সিনেমার স্বত্বাধিকারী কিছু উপহার লইয়া। দুইজনই স্থূলকায়। ডাঃ রায় মৃদু হাসিয়া বলেন—'কি হে! সব রাধাই দেখছি যে একই রকমের।' শুনিয়া উপস্থিত দর্শনার্থী নরনারী সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জীবন-সন্ধ্যায়

জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে বিধানচন্দ্র পঁচাত্তর বৎসর শেষ করিলেন। আজ ১লা জুলাই (১৯৫৭ খ্রীঃ) তাঁহার ৭৬তম জন্মদিন। এই বয়সেও তিনি দেহে-মনে অদ্যাবধি সুস্থ ও সবল আছেন। তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন দেখিলে মনে হইবে যে, তিনি জীবন-মধ্যাহ্ন অতিক্রম করেন নাই। যুবকের মত উৎসাহ-উদ্যম, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি-সামর্থ্য লইয়া তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন। সেই কর্মপ্রেরণাই বয়োবৃদ্ধ বিধানচন্দ্রের মধ্যে আনিয়াছে যৌবনের জোয়ার। বার্ধক্য তাঁহার প্রবহমান কর্মস্রোতের দুর্বার গতি রোধ করিতে পারে নাই। সাধারণ মানুষ জীবনের সায়াহ্নবেলায় নিশিদিন শুনিতে পাইয়া থাকে পরপারের ডাক—মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া ক্ষণে-ক্ষণে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। কিন্তু বিধানচন্দ্র ত সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি অসাধারণ মানুষ; তাই সে ডাক তাঁহার কানে পৌঁছে না, সে আশঙ্কা তাঁহার মনে জাগে না। তিনি জীবনসন্ধ্যায় দেশ ও দশের সেবাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত। পরমেশ্বরের নিকট ওই নিষ্ঠাবান সেবকের প্রার্থনা—যেন সেবাব্রত পালনের মধ্য দিয়াই তাঁহার জীবনাবসান হয়।

বিধানচন্দ্র খাঁটি বাঙালী। বাংলা ও বাঙালীকে তিনি অন্তরের সহিত ভালোবাসেন। বাংলা এবং বাঙালী তাঁহার প্রিয় বলিয়াই ভারত এবং ভারতবাসীও তাঁহার প্রিয়। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গকে শ্রী, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শক্তির আকর করিয়া তোলা এবং বাঙালীকে একটা আদর্শ জাতিরূপে গঠন করা তাঁহার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন। সেই চিন্তাকে রূপায়িত করা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা,—জীবন-সন্ধ্যায় বিধানচন্দ্রের ঐকান্তিক কামনা। বিগত তিন বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে—বিশেষ করিয়া জন্মদিনের সংবর্ধনা-সভায় সেই কামনা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের লোকপ্রিয় নেতা, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক, কর্ম-শক্তির মূর্ত প্রতীক বিধানচন্দ্রের ৭৩তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে (১৯৫৪ খ্রীঃ ১লা জুলাই) কলিকাতায় কংগ্রেস-ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"জীবন কর্ম-সমষ্টি মাত্র। আজিকার কর্ম-সমষ্টি ও কালকের কর্ম-সমষ্টি এক নহে। নিত্য নূতন নূতন কর্ম-সমষ্টি আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। আমার জন্মদিনে সকলে একত্র হইয়া নূতন নূতন উদ্ভাবনা করিতে যদি না পারি, তাহা হইলে এ দিনের তাৎপর্য উপলব্ধি হইবে না। এই জন্মদিনে সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করিব। কবি গাহিয়াছেন—

"নীচুর কাছে নীচু হতে
শিখ্‌লি না রে মন,
সুখী জনের করিস্ পূজা
দুঃখীর অযতন।"

কবির ঐ কথাটি আমি সংসারের তীর্থযাত্রায় পাথেয় বলিয়া মনে করিয়াছি। এই তীর্থযাত্রায় যাঁহারা আমার সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহারা নূতন জীবনের সন্ধান পাইবেন।

"সেবাই মানুষের পরম সাধন। আমি দীনের সেবার তীর্থযাত্রী। যে প্রতিষ্ঠান এই সেবাকে মূর্ত করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানে আমার স্থান আছে—ইহা অস্বাভাবিক নহে। যদি তাঁহারা আমাকে কংগ্রেস-সদস্য না করিতেন, তবে কে আমার সেবার কাজ বন্ধ করিতে পারিবে? অশান্তির অবস্থায় সে কাজ চলিতে পারে না। একটা নূতন কথা আসিয়াছে—peaceful co-existence অর্থাৎ তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি। কেহ স্বীকার করুন বা না করুন ভাবরাজ্যে ইহা নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। আপনিও বাঁচুন, আমিও বাঁচিব—দুইটিকে মানিয়া নিয়া সেবাকার্য করিতে হইবে।…সেবার কাজ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা আমার আছে, ইহা আমি স্বীকার করি না; আমার যথাসাধ্য আমি করিব, জগতের উদ্ধার যদি করিতে হয় আমাকে দিয়া হইবে, আর কাহাকেও দিয়া হইতে পারিবে না—এ ধারণা সাংঘাতিক। সেবা যদি আমাদের প্রধান সাধন হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডী আলাদা করিয়া দিতে হইবে। সেজন্য দরকার peaceful co-existence.

"আমার দৃঢ় ধারণা, শান্তির পথ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে উক্ত নীতি সার্থক হইতে পারে না। ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক—সকলেই যদি বলে আমি বড়, আর সকলে কিছু নয়, তাহা হইলে শরীর হয় রোগের আকর। ফুল, ফল, পত্র, কাণ্ড কিংবা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র প্রত্যেকেই যদি বলে আমি বড়, তুমি ছোট—তাহা হইলে সৃষ্টিতে বিপর্যয় ঘটে। **সব ভাবের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য সাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে বিপদ**

হয় অনিবার্য। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ বিষয়ে গুরুত্ব সমধিক। সেবার কাজে যদি সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শান্তির প্রয়োজন। আমরা যে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহাকে যদি গভীর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে চাই, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। আমি ছাড়া আর একজনও আছে—এ কথা ভাবিতে পারিব না? **সকলের কষ্টকে আমার কষ্ট বলিয়া যদি না ভাবি, তাহা হইলে আমি সার্থক চিকিৎসা করিতে পারিব না; জীবনে যত সমস্যা যত প্রশ্ন আসে, আমাকে ভাবিতে হইবে আমি যদি অনুরূপ অবস্থায় পড়িতাম তাহা হইলে কি করিতাম—ইহা যদি ভাবি, সকল সমস্যার মীমাংসা হয়।** উচ্চাভিলাষ থাকিলে ঝগড়া-বিবাদ না হইয়া পারে না। **দীনের শ্রীচরণ পরম তীর্থ**—এ ভাব যদি মনে থাকে, তাহা হইলে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া আমরা কাজ করিতে পারি, ঘৃণা বিদ্বেষ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হইতে পারে না।

"পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে আমি সংসারারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই বনে যদি কাজ করিতে না পারি, কালিমা যদি দূর করিতে না পারি—অবশ্য সব জঙ্গল সাফ করিতে পারি—এ আশা আমি করি না, তবে দেশের অকল্যাণের জন্য দায়ী হইব। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহযাত্রী হউন। পরের অভাব ও দুঃস্থের দুঃখ যদি দূর করিতে পারি, তাহা হইলে বাংলা দেশের মুখোজ্জ্বল হইবে। আমি যদি করিয়া থাকি সে আপনাদেরই কৃতিত্ব। আজ সমবেত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। প্রত্যেক দিন নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করুন—ভগবানের আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হইবে।"

এই সেবাব্রতী মহান কর্মযোগীর জীবনের সায়াহ্ন-বেলায় তাঁহার চিন্তা-ধারা এবং কর্মের গতি কোন্ দিকে যাইতেছে, জন্মদিনের ভাষণাবলীর মাধ্যমে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিধানচন্দ্র তাঁহার ৭৪তম (১৯৫৫ খ্রীঃ ১লা জুলাই) জন্মদিনে সংবর্ধনার উত্তরে বলিয়াছেন—

"...যিনি যেখানেই থাকুন না কেন এবং যে কোন সংস্থারই অন্তর্ভুক্ত থাকুন, **সেবার দ্বারা দেশকে বড় করার ইচ্ছা যদি আমাদের থাকে, তাহা দেশকে মঙ্গল ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবে।** এই সেবার আদর্শের দিক হইতেই আমি কংগ্রেস-সংস্থার উপর এত বেশী আস্থাশীল। এখানে কোন ব্যক্তি নহে, দেশের সমৃদ্ধির জন্য কংগ্রেসের প্রচেষ্টাই তাহার প্রকৃত পরিচয়। কংগ্রেসের জনসেবার আদর্শ পঞ্চশীল-নীতিরই অনুকূলে।

"গত ডিসেম্বর মাসে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার চিকিৎসকের গম্ভীর মুখ দেখিয়া দুই-তিন দিনের জন্য আমার মধ্যে কিছু হতাশা জাগিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরেই আমার এই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে যে, যতদিন আমার প্রয়োজন আছে, কেহই আমাকে নিষ্কর্মা করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমার কর্মানুরাগের জন্য সম্ভবতঃ বহু লোক বহু কথা ভাবিয়া থাকেন; কিন্তু জীবন যখন অনিশ্চিত, তখন আমাদের এ কথা মনে রাখা দরকার যে, পূর্বাহ্ণেই কাজ সম্পূর্ণ না করিলে আমাদের কর্তব্য কার্য অসম্পূর্ণ থাকারই সম্ভাবনা।" •

বিধানচন্দ্র একজন বিজ্ঞানী—বহুদর্শী প্রবীণ বিজ্ঞানী। তাঁহার মধ্যে ভাবের অভাব না থাকিলেও কোন অবস্থায়ই ভাবাবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় না বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিধানচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হইলেও খাঁটি বাঙালী। সুতরাং বাঙালীর প্রকৃতিগত ভাবাবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাস হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন কি করিয়া? তাঁহার জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত-বক্তারূপে তিনি যে সকল ভাষণ দিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। সেদিনকার সংবর্ধনা-সভায় বিধানচন্দ্র ভাবোদ্বেল-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—**"আমার সাধ্যমত আমি দেশের সেবা করিয়া যাইতেছি। যখন আমি থাকিব না তখনও আমার বিদেহী আত্মা দেশেরই জন্য চিন্তা করিবে।"**

সেদিন সেবাব্রতী দেশনায়কের অন্তরের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত ওই বাণী উপস্থিত নরনারী সকলের প্রাণকেই স্পর্শ করিয়াছিল।

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও লোকসভার সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ ডাঃ রায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে বাংলা ও বাঙালীর পক্ষ হইতে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়া যে সারগর্ভ ভাষণ দিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্য দিয়াও জীবনসন্ধ্যায় দেশসেবা-নিরত কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের একটা বাস্তব রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ রায়ের ৭৩তম জন্মদিনের (১৯৫৪ খ্রীঃ) অনুষ্ঠানে বলিয়াছেন :—

"উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ডাঃ রায় সমস্যা-সঙ্কুল বাংলাদেশের সেবার কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। জনসাধারণের সেবক—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য এই সেবাব্রতী মনীষীর জন্মদিনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ১৯৩৭ সাল হইতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার লইয়া দেশের যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ-

কংগ্রেস ১৯৪৭ সালে দেশশাসনের ভার লইয়া তাহা অপেক্ষা কোন অংশে দেশের কম উন্নতি সাধন করে নাই।”……

পরবর্তী জন্মদিবসের (১৯৫৫ খ্রীঃ) অতুল্যবাবু যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়াও ডাঃ রায়ের একখানা নিখুঁত চিত্র আমরা দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন :—

“ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। ৭৪ বৎসর বয়সে কিভাবে কাজ করা যায়, কিরূপে কর্মজীবনের মাঝে মানুষ নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, সেই কথা এই দিনে আমরা স্মরণ করি। ডাঃ রায়ের মাঝে একদিকে পুরাতন ভারতের ঐতিহ্য এবং অন্যদিকে নূতন ভারত গঠনের স্বপ্ন রূপায়িত হইয়াছে। ডাঃ রায় দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরুর সহযোগী ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশগঠনের কাজও করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বহু জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান আজ ডাঃ রায়ের সৃজনী-শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।”…

পশ্চিমবঙ্গের লোকপ্রিয় রাজ্যপাল স্বর্গত ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি রাজনীতিক্ষেত্রে ডাঃ বিধান রায়ের দীর্ঘকালের সহকর্মী ছিলেন। বিধান-চন্দ্রের ৭৫তম জন্মদিনে (১৯৫৬ খ্রীঃ) উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কলিকাতায় ‘কংগ্রেস ভবনে’ আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল মুখ্য-মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে যাইয়া ঈশ্বরের নিকট ডাঃ রায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। তিনি বলেন—ডাঃ রায় বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা ত্রিশ কিংবা চল্লিশ ভাগের একাংশও উপার্জন করেন কিনা সন্দেহ। এক সময়ে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে জনতার ভিড় সারাক্ষণই লাগিয়া থাকিত। জনসাধারণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। আজ তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে বন্দুক-ধারী পুলিস। নানা সমালোচনা সত্ত্বেও ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন কেবলমাত্র দেশসেবার নিমিত্ত। দেশের ডাকে, দেশবাসীর সেবায় তিনি সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন। তিনি দেশকে ভালোবাসিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি—তিনি যেন আরও অধিক দিন জীবিত থাকিয়া দেশের কল্যাণকার্যে নিয়োজিত থাকেন।”

সেই অনুষ্ঠানে (৭৫তম জন্মদিনে) ডাঃ রায় অভিনন্দনের মধ্য দিয়া দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভে মুগ্ধ হইয়া ভাবাবেগে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করেন যে—তিনি যেন তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। তাঁহার

অন্তরের কামনা—'জয়-পরাজয়ের নিস্পৃহ হইয়া দেশসেবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে চাই।' ডাঃ রায় বলেন :—

"প্রতি বৎসর জন্মদিনে আমি বহু উপহার, অসংখ্য শুভেচ্ছা পাইয়া থাকি। এবৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এইবার সকালে বছর আট নয়ের একটি ছেলে আমার নিকট আসিয়া পঁচিশটি টাকা দান করিয়াছে। ছেলেটিকে প্রশ্ন করিলে সে জানায় যে, প্রতিদিনের হাতখরচ হইতে বাঁচাইয়া সে এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। টাকা কিভাবে ব্যয় করিতে হইবে প্রশ্ন করিলে ছেলেটি অনুরোধ জানায় যে, গরীবের জন্য তিনি যেন কিছু করেন। এইরূপ নানা প্রকার দান আমি প্রতি বছর জন্মদিনে পাইয়া থাকি। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে—এই দানের কি অর্থ? এই দানের কি প্রতিদান আমি দিতে পারি?

"এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—'আমি কে?' নানা বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। দার্শনিকেরা 'আমি কে' সম্পর্কে গবেষণাও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গবেষণার সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নাই। আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি বিবেচনা করিতেছি। আমার কি শক্তি, কতখানি দুর্বলতা—সেই বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে। কর্ম-জীবনে আমি প্রশংসা পাইয়াছি, আবার সমালোচনাও পাইয়াছি। সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া যে সমালোচনা করা হয়, তাহা আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকি। কারণ এই সমালোচনার মধ্যেই নিজের দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়। নিজের দুর্বলতাকে দূর করিতে পারিলেই মানুষ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া ওঠে। তাঁহার মাতা-পিতা একটি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেছে—'পারিব না বলিও না।' শাস্ত্রেও আছে ফলাফলের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কোন কাজ করিতে যাইয়া যদি ব্যর্থ হইতে হয়, তবু তাহা ব্যর্থ নয়। কারণ, চেষ্টার মূল্য আছে। মানুষ যখন কাজ করিতে সক্ষম হয়, তখনি তাঁহার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অনেকের অনেক ক্ষমতা আছে। কিন্তু ব্যর্থ হইবার ভয়ে তাঁহারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চান না। এক বামপন্থী বন্ধু কিছুদিন আগে আমি কোন্ কোন্ জায়গায় পরাজিত হইয়াছি, তাহার তালিকা পেশ করেন। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, মানুষকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

"যতক্ষণ আমার শক্তি আছে, ততক্ষণ আমি কাজ করিয়া যাইব। জয়-পরাজয়ে কিছু আসে-যায় না। দেশবাসীর নিকটেও আমার আবেদন যে, দেশের উপকার হইবে কিনা—চিন্তা করিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

"বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে, অনেক বিষয়ে দেশ পিছাইয়া আছে। সেই দেশের কাজকে সামনে রাখিয়া কাজ করিলে দেশ বড় হইবে। কংগ্রেসকে আমি ছোট একটি গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে চাই না। কংগ্রেস দেশের জন্য কাজ করিয়া যাইবে—ইহাই আমার স্বপ্ন। যদি কোন কংগ্রেস-কর্মী দেশের কাজ না করেন, তবে তিনি কংগ্রেসে থাকিতে পারেন না। যতদিন কংগ্রেস দেশের সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবে, ততদিন কংগ্রেসের ধ্বংস হইবার কোন কারণ নাই।

"আজকের দিনে আমার প্রতিদান দেবার কিছুই নেই। আপনারা বলেছেন—আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকুন, যাতে দেশের কাজ করতে পারেন। আমিও স্বীকার করি, বেঁচে থাকার পক্ষে আমার কোন দাবি নেই। শুধু যেন দেশের কাজের জন্য বেঁচে থাকি। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' দেশের কাজেই আমি যেন বেঁচে থাকি।"

দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তান তাঁহার ওই অনবদ্য ভাষণের উপসংহারে গানের যে কলিটি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত স্বদেশ-সঙ্গীতের প্রথম কলি। বিধানচন্দ্রের ওই প্রিয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধন-রতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

ডাঃ রায়ের জন্মদিন পালন উপলক্ষে প্রতি বৎসর প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেন। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করেন এবং সংবাদপত্রে উহার তালিকা প্রকাশিত হয়। ৭৬তম জন্মদিনে (১৯৫৭ খ্রীঃ) সেই কর্মসূচী পালনের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই জন্মদিনে তিনি ৭৭ বৎসরে পদার্পণ করিলে কলিকাতার সাংবাদিকগণের কয়েকটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁহার এই মহৎ বিশ্বাস আছে যে বাঙালীরাই এই দেশের নেতৃত্ব করিবে।

জাতির ভাগ্য সম্পর্কে বাঙালীদের এই আত্মবিশ্বাসের ভাব ফিরিয়া পাইতে হইবে।

একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, আজ এই জন্মদিনে কি চিন্তা তাঁহার মনে সর্বাধিক উদয় হইতেছে। উত্তরে তিনি জানান—"ঈশ্বর আমার জীবনের মেয়াদ আরও এক ধাপ বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি এই কামনা করি যে তাঁহার দেওয়া কর্তব্যভার যেন উপযুক্তভাবে পালন করিতে পারি।"

তিনি বাঙালী সম্পর্কে এই মন্তব্যও করেন—একটি প্রধান অন্তরায় এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের উদ্যম, আত্মপ্রত্যয় এবং চিন্তাশক্তিতে ঘাটতি দেখা দিয়াছে। অথচ এইগুলি যদি থাকে কেবল তাহা হইলেই নববঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব।

কি গুণাবলী থাকিলে সার্থক মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়?—এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় বলেন "আমি যখন থাকিব না তখন আশা করি আর একজন প্রতিভাবান যুবক আগাইয়া আসিবেন এবং বাংলা দেশের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন।"

তিনি বলেন যে, সেই ব্যক্তিই মুখ্যমন্ত্রী রূপে সফলকাম হইতে পারেন, যিনি নিজের মন্ত্রিমণ্ডলীকে কখনোই ইহা স্মরণ করাইয়া দিবেন না যে, তিনিই মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই সহকর্মীদের সহযোগিতা লাভ করিবেন। যতদিন তিনি এইভাবে চলিবেন ততদিন তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী যুক্তদায়িত্বের নীতি সম্পর্কে সচেতন থাকিবেন।

ডাঃ রায়ের কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মনিষ্ঠা আমাদের জাতীয় জীবনে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অবিস্মরণীয়। মহাপ্রয়াণের প্রায় চারদিন পূর্বে ২৮শে জুন বৃহস্পতিবার তিনি রোগ-শয্যা হইতে রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের উপদেষ্টার (State Electricity Board's Adviser-এর) সঙ্গে ফোনে নয়া দিল্লীতে যোগাযোগ করিয়া তাঁহাকে আদেশ দিলেন যে,—তিনি (ডাঃ রায়) পর্ষদের কাটোয়া তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইবেন; তদনুযায়ী ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করা হয়। উপদেষ্টা মহাশয় তখন সরকারী কার্যোপলক্ষে রাজধানীতে ছিলেন।

পূর্বোক্ত আদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে উপদেষ্টা মহাশয়কে আরও একটি আদেশ দিলেন, —যেন কাটোয়া প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য সত্বর প্রয়োজনীয় ভূমিগ্রহের (Land Acquisition-এর) ব্যবস্থা করা হয়।

খুব সম্ভবতঃ মৃত্যুপথযাত্রী কর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের ইহাই সর্বশেষ আদেশ।

উনত্রিংশ অধ্যায়

দীপ-নির্বাণ

দেশ ও জনগণের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতসরকার ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাতন্ত্র দিবসে ডাঃ রায়কে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ওই বৎসরের ১লা জুলাই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় রওনা হইয়া যান; এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া কয়েক সপ্তাহ পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। মহানগরীর উন্নয়নকল্পে গঠিত সংস্থার মাধ্যমে সেই বৃহৎ জটিল ও কঠিন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একটি প্রকাণ্ড লবণ-হ্রদের পুনরুদ্ধার করিয়া দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসতি নির্মাণের ব্যবস্থাও বিধান-মন্ত্রিসভার আমলে কার্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মহানগরীর কয়েক মাইলের মধ্যে কয়েকটি শহরতলি গড়িয়া বৃহত্তর কলিকাতার বাসস্থান-সমস্যা সমাধানের কার্যও আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতার অনতিদূরে দুর্গাপুরে যে বৃহৎ শিল্পনগরী গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতেও 'নবীন বাংলার রূপকার' বিধানের প্রভাব ও প্রয়াসের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়াছে। দুর্গাপুর প্রকল্পই বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম বড় উদ্যোগ। কয়লাভিত্তিক শিল্পের সূচনা হিসাবে পরিকল্পিত এই উদ্যোগের প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, ইহা হইতে ভাবীকালে নানাবিধ শিল্পের সৃষ্টি হইবে।

১৯৬২ সনের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ রায় কলিকাতার চৌরঙ্গী নির্বাচন-কেন্দ্র ও বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে রাজ্য বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হইলেন। পরে শেষোক্ত কেন্দ্রের সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। সর্বসম্মতি-ক্রমে কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া ১১ই মার্চ চতুর্থ বারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। নির্বাচন-অভিযানে তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে কংগ্রেসের পক্ষে জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। নিজের নির্বাচন-কেন্দ্রে তাঁহার প্রচারকার্য সীমাবদ্ধ ছিল না। নির্বাচনী অভিযান পরিচালনায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর যে প্রতিক্রিয়া হইতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আর পারিলেও তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি যে, ১৯৬১ সনের ১লা জুলাই ডাঃ রায় তাঁহার অশীতিতম জন্মদিনে ৩৬ নং নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটের চার লক্ষ টাকা মূল্যের ঐতিহাসিক বাসভবনটি একটি সেবাসদন স্থাপনের জন্য দান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এমন দান অনেক ছিল, যাহা অপরের অজ্ঞাত। নাম-যশের জন্য তিনি দান করিতেন না, করিতেন অন্তরের প্রেরণায়।

১৯৬২ সালের মার্চমাসে তাঁহার নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পরে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। তাঁহার শারীরিক অবস্থা যে অবনতির দিকে, তাহা বুঝিয়াও তিনি কর্মে বিরতি দেন নাই। ২৩শে জুন হইতে তিনি মহাকরণে যাওয়া বন্ধ করেন। বাড়িতে বসিয়া কাজ করিতে থাকেন। তাঁহার চিকিৎসক হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগেশ গুপ্ত, তাঁহার দীর্ঘকালের বন্ধু প্রখ্যাত সার্জন ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জি, স্বনামখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ শৈলেন সেন প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ডাঃ রায় হৃদরোগে ভুগিতেছেন বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়। তিনি সেই অভিমতের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কার্ডিওগ্রাফ করা হইল। তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসকদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

কিন্তু কার্যতঃ তিনি তাঁহার চিকিৎসকদের উপদেশ মানিয়া চলেন নাই। ২৯শে জুন তাঁহার বাসভবনে মন্ত্রিসভার অধিবেশনে কর্মসূচী অনুসারে সভার কার্য নিষ্পন্ন হইল। ডাঃ রায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ৩০শে জুন শনিবার সকালবেলা হাওড়া স্টেশন হইতে সোজাসুজি আসিলেন ডাঃ রায়ের বাসভবনে। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি পরিহাস করিয়া ডাঃ রায়কে বলেন যে, অন্যকে তিনি বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজের বেলায় কেন সে উপদেশ মানিয়া চলিতেছেন না। দশ মিনিট পরে নামিয়া আসিবার কালে সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি ডাঃ রায়কে বেশ প্রফুল্লই দেখিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই রাত্রিতে তাঁহার ভালো ঘুম হয় নাই। সারারাত্রি তিনি অস্বস্তিতে ছটফট করিয়াছেন।

পরদিন ১লা জুলাই রবিবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের একাশীতিতম জন্ম-দিবস। একতলার বসিবার ঘরে তাঁহার স্বাক্ষরিত বাংলায় টাইপ-করা বিজ্ঞপ্তি টাঙাইয়া দিয়া জানানো হইল যে, আগন্তুকদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখিত। অবস্থা দ্রুতবেগে অবনতির দিকে যাইতেছিল। জরুরী ফোন পাইয়া ছুটিয়া গেলেন তাঁহার চিকিৎসক ডাঃ যোগেশ গুপ্ত। অন্যান্য চিকিৎসকরাও উপস্থিত ছিলেন। যন্ত্রণায় তিনি শয্যার উপরে এপাশ

ওপাশ করিয়া ছটফট করিতেছিলেন। মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দেওয়া হইল, অক্‌সিজেন সিলিণ্ডারেরও ব্যবস্থা হইল। এশিয়া-খ্যাত ডাক্তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন, প্রাণ-প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ। কাতরস্বরে কহিলেন—যোগেশ, তোমরা সবই ত করলে, কিন্তু রাখতে ত পারলে না, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! বলিতে বলিতে এশিয়া-খ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় চক্ষু মুদিলেন। তখন বেলা বারোটা তিন মিনিট।

বিদ্যুদ্‌বেগে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল দেশ-বিদেশে আকাশ-বাণীর মাধ্যমে। শেষ দর্শনের জন্য হিন্দু মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ, পারসী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নাগরিক ৩৬ নং নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটের বাসভবনের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জনতাকে পুলিস নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিল না। মুখ্যমন্ত্রীর শবদেহ সচন্দন পুষ্পমাল্যভূষিত হইয়া স্থানান্তরিত হইল বিধান-সভার বিরাট ভবনে। সারা রাত্রি সেখানেও স্রোতের মতো জনতার প্রবেশ।

১লা জুলাই কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের ৮১তম জন্মদিবসে হইল তাঁহার মৃত্যু।

পরদিবস ২রা জুলাই সোমবার অপরাহ্ণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে তাঁহার শবদাহ করা হয় কালীঘাটে কেওড়াতলা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চিতাচুল্লীতে। শবানুগমনের শোকমিছিলে যোগ দিয়াছিলেন দশ লক্ষাধিক নরনারী। রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয় সাত দিন।

কলিকাতা মহানগরীর ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু ইত্যাদি নানা ভাষার সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা ২রা জুলাই প্রকাশিত হয়। ১লা জুলাই তারিখেও কোন কোন সংবাদপত্র ছোট আকারে ওই শোকসংবাদ বহন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

"ডাঃ রায়ের মৃত্যু শুধু আমার ও আমার বন্ধুদের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি নয়, ইহা সমগ্র জাতির পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সারা দেশ আজ শোকাভিভূত। কারণ বাংলা দেশের আকাশে, শুধু বাংলা কেন সারা ভারতের আকাশে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, তাহা সহসা নিভিয়া গেল। পথের দিশারী হারাইয়া গেলেন। কিন্তু কর্ম-দীপ্ত জীবনের যে স্মৃতির দীপ্তি তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা পথ দেখাইবে—আলো জ্বালিবে।

শ্রীসেন বলেন, নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আসিয়া মৃত্যু তাঁহাকে হরণ করিয়া গেল। আমরা হারাইলাম নেতা, দিশারী, বন্ধু, সখা। বর্তমান বাংলা দেশ তাহার নির্মাতাকে হারাইল। ভারত হারাইল এক মহান সন্তানকে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ এতই মর্মাহত হইয়া ছিলেন যে, তিনি কিছুই বলিতে পারেন না।

ডাঃ রায়ের দীর্ঘকালের সুহৃৎ ও মন্ত্রিসভার অন্যতম সহকর্মী শোকাভিভূত রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরীও কিছু বলিতে পারেন না।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ডাঃ রায়ের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাইয়া ১লা জুলাই তারিখে নয়া দিল্লী হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর নাই, ইহা মনে করা কষ্টকর। পরিণত বয়সে এবং নানা কীর্তির অধিকারী হইয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

কিন্তু কার্যতঃ ডাঃ রায় ছিলেন একজন যুবক; শক্তি, উদ্যম এবং যুবজনোচিত উৎসাহে ভরপুর। কলিকাতা, বাংলা এবং ভারতের সম্পর্কে তাঁহার নানারূপ স্বপ্ন ছিল।

একজন মহান ব্যক্তি, একজন পুরুষসিংহের লোকান্তর ঘটিল। আমরা দুঃখিত এবং শোকাভিভূত! আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিব এবং তাঁহার জন্য আমরা দুঃখও করিব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের তাঁহার মহান সাফল্যের কথাও স্মরণ করিতে হইবে—দেশবিভাগের পর তিনি কিভাবে বাংলার দুরূহ সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং ক্রমে সেগুলি অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

তিনি সত্য-সত্যই আধুনিক বাংলার এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন।

একজন প্রিয় বন্ধু এবং সহকর্মী পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা নিঃসহায় হইয়া পড়িলাম।"

বিধানচন্দ্রের রাজনীতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত যে বাণী আনিয়াছিলেন, আমরা সেই বাণী দিয় ভক্ত শিষ্যের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিতেছি—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

ডাঃ রায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ ঃ	১লা জুলাই বেলা ১০টা ২০ মিনিটে পাটনা শহরে জন্ম।
১৮৯৬ ”	১৫ই জুন পাটনা শহরে মাতৃদেবী অঘোরকামিনীর
১৮৯৭ ”	পরলোক গমন। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৮৯১ ”	পাটনা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; পাটনা
১৯০১ ”	কলেজ হইতে গণিত-শাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি; পিতৃদেব প্রকাশচন্দ্র রায়ের সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ; সর্ব-জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসারবাসিনীর মৃত্যু।
১৯০৫ ”	৭ই আগস্ট তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন (স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ)।
১৯০৯ ”	কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হইলেন; বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে সহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন রূপে কার্য আরম্ভ; কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ।
১৯০৮ ”	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ।
১৯০৯ ”	২২শে ফেব্রুয়ারি উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য বিলাতযাত্রা; মার্চ মাসের শেষভাগে লণ্ডনে পৌছেন; তথায় মে মাসে বিশ্ববিখ্যাত সেণ্ট্ বার্থোলোমিউজ্ শিক্ষায়তনে ভর্তি।
১৯১১ ”	এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন) এবং এফ. আর. সি. এস. (ইংলণ্ড) ডিগ্রি লাভ; প্রথমোক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন; কাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন ও শিক্ষকের পদ গ্রহণ; ৭ই ডিসেম্বর পিতৃদেব প্রকাশচন্দ্রের পরলোক গমন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদের (Senate) সদস্য নির্বাচিত ; ৩৬ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ বাসভবন ক্রয়।

১৯১৯ " সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ ; বেঙ্গল ইমিউনিটির গোড়া-পত্তন।

১৯২১ " রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইয়া ফ্যাকালটি অব্ মেডিসিনের সহিত সংযুক্ত।

১৯২২ " রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ।

১৯২৩ " ৩০শে নভেম্বর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া উত্তর ২৪ পরগনা মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক স্বতন্ত্রপ্রার্থী (স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক সমর্থিত) রূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯২৪ " ৩২শে ফেব্রুআরি ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে সর্বপ্রথম বক্তৃতা প্রদান ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত।

১·২৫ " স্বরাজ্য দলে যোগদান ; বাজেট অধিবেশনে (মার্চ মাসে) রোগশয্যায় শায়িত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান ; অধিবেশনে তদানীন্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দল কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত ; ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু ; দেশবন্ধু-সম্পাদিত ট্রাস্ট-ডীডে ট্রাস্টী মনোনীত ; চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৬ " তৃতীয়বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত।

১৯২৭ " আগস্ট মাসে স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন এবং উহা সভায় গৃহীত।

১৯২৮ " কংগ্রেসের কলিকাতায় ৪৩তম অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯ " নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (৪৪ তম) যোগদান।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ : কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্বপ্রথম অল্ডারম্যান নির্বাচিত; কর্পোরেশনের মে মাসের সভায় গান্ধীজীর কারাবরণে অভিনন্দন জ্ঞাপন; কর্পোরেশনের ফিনান্স স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত; লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে বে-আইনী ঘোষিত নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগস্ট অধিবেশনে যোগদান, গ্রেফতার ও ৬ মাসের জন্য কারাবরণ; সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত।

১৯৩১ " মেয়র নির্বাচিত; কর্পোরেশনের বাজেট স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান এবং সার্ভিসেস স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত; বিপ্লবী দধীচি দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসিতে কর্পোরেশনের সভায় অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কর্পোরেশনের পক্ষে সম্বর্ধনা।

১৯৩২ " দ্বিতীয়বার কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে কর্পোরেশনের পক্ষে সম্বর্ধনা; কর্পোরেশনের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বেতন বৃদ্ধি; কুখ্যাত স্যার চার্লস টেগার্ট বিলাতে এক বক্তৃতায় কর্পোরেশন বিপ্লবীদের পালক বলিয়া আক্রমণ করায় কর্পোরেশনের সভায় মেয়রের বিবৃতি দান; গান্ধীজীর নির্দেশে কলিকাতায় 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী সঙ্ঘ'-এর প্রাদেশিক পর্ষদ গঠন এবং সভাপতির পদ গ্রহণ; ১৮ই ডিসেম্বর নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতায় টাউনহলের জনসভায় পৌরোহিত্যকরণ।

১৯৩৩-৩৪ " স্বরাজ্য দলের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী এবং আন্সারীর সহযোগিতায় কার্যারম্ভ। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলোচনান্তে সেই প্রচেষ্টায় তাঁহার সম্মতি দান; নয়া দিল্লীতে ডাঃ আন্সারীর বাসভবনে সেই নীতির সমর্থক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্গের এক ঘরোয়া সম্মেলন এবং সকলে একমত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নীতি সমর্থন; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ: বিগ-ফাইভ-এর (বৃহৎ পঞ্চকের) মধ্যে ভাঙ্গন; প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের ইলেক্‌শন কমিটি গঠন ও সভাপতি নির্বাচিত; মনোনয়ন সম্পর্কে শরৎবাবুর সঙ্গে মতানৈক্য এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্তের দরুন সভাপতির পদত্যাগ; পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত।

১৯৩৮ „ পুনরায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত।

১৯৩৯ „ গান্ধীজীর অনুরোধে পুনরায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ; ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল-এর প্রথম বেসরকারী সভাপতি নির্বাচিত; দ্বিতীয় মহা বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ এবং কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন, আইন সভাগুলি বর্জনের নীতি গ্রহণে মতভেদ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা; আবার কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত।

১৯৪১ „ বার্মা প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল সিভিল প্রটেকশন কমিটি গঠন এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রস্তাবে সভাপতির পদ গ্রহণ; পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও কর্পোরেশনের অল্‌ডারম্যান নির্বাচিত।

১৯৪২ „ গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে যুদ্ধ উপলক্ষে ভারত সরকারের অনুরোধে সামরিক চিকিৎসক-বাহিনী গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা; ওই বাহিনীর কর্মচারীদের কতকগুলি ন্যায্য দাবি পুরণের ব্যবস্থা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার পদে নিযুক্ত।

১৯৪৩ „ ফেব্রুআরি মাসে গান্ধীজীর ২১ দিন অনশনের সময় উপস্থিতি; মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে প্রথম অভিভাষণ; বেঙ্গল রিলিফ কমিটি স্থাপন ও উহার কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি দান।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মতে মালয়ের দুর্গত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য মেডিকেল মিশন প্রেরণ ও পরিচালনাদির ভার গ্রহণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুর্গত কলিকাতাবাসীগণের ত্রাণে সহকর্মীগণসহ সেবা-কার্য।

১৯৪৭ " গান্ধীজীর অনুমতি লইয়া চক্ষু চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় গমন; ১৫ই আগস্ট ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর সংযুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপাল নিয়োগ; অনুপস্থিতিতে স্বর্গতা সরোজিনী নাইডুকে সাময়িকভাবে নিয়োগ; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যপালের পদত্যাগ; ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচকমণ্ডলী হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৮ " জানুআরি মাসে গান্ধীজী নয়া দিল্লীতে অনশন আরম্ভ করায় কলিকাতা হইতে তথায় গমন; ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার পতনের পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত ও নূতন মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫২ " স্বাধীন ভারতের নয়া শাসন-তন্ত্রের বিধান-মতে ভারতের প্রথম নির্বাচনে কলিকাতার বৌবাজার কেন্দ্র হইতে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত; দ্বিতীয়বার সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্বাচিত এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নানাবিধ উন্নতি সাধন।

১৯৫৪ " ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দান।

১৯৫৫ " ১৫ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ-দান।

১৯৫৭ " ১৪ই জানুআরি কলিকাতা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে সভাপতি; দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (মার্চ মাসে) বৌবাজার নির্বাচকমণ্ডলী হইতে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত; এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দলের নেতা নির্বাচিত এবং পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ।

১৯৫৮-৬০ খ্রীঃ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসরকার কর্তৃক দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা গৃহীত। ১৯৫৮—৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর কলিকাতায় লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা, মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরবর্তী দীঘার উন্নয়ন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পরিকল্পনা।

১৯৬১ খ্রীঃ ১লা জুলাই ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়ন সম্পর্কে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। প্রজাতন্ত্র দিবসে 'ভারতরত্ন' উপাধি প্রাপ্তি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ভারতসরকার দুই শত পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দে সম্মত হন এবং ডাঃ রায় অতিরিক্ত পঞ্চাশ কোটি টাকার পরিকল্পনা করেন। কলিকাতা মহানগরী উন্নয়ন সংস্থা গঠন।

১৯৬২ খ্রীঃ তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং কংগ্রেসের সাফল্য লাভ। চৌরঙ্গী ও বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া কেন্দ্র হইতে রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত। শেষোক্ত কেন্দ্রের সদস্যপদে ইস্তফা। সর্বসম্মতি ক্রমে কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত এবং মার্চমাসে মন্ত্রিসভা গঠন। ১লা জুলাই বেলা বারোটা তিন মিনিটে কলিকাতা ৩৬নং নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটে নিজবাসভবনে লোকান্তর গমন।

গ্রন্থপঞ্জী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনী

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত

অঘোর-প্রকাশ—প্রকাশচন্দ্র রায়

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত—সত্যচরণ শাস্ত্রী

প্রতাপাদিত্য—নিখিলনাথ রায়

যশোহর-খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র

গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস

আমাদের গান্ধীজী—ধীরেন্দ্রলাল ধর

মানুষ চিত্তরঞ্জন—অপর্ণা দেবী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুকুমাররঞ্জন দাশ

সাংবাদিকের স্মৃতি-কথা—বিধুভূষণ সেনগুপ্ত

A Nation In Making—Surendranath Banerjea

Dr. B. C. Roy—K. P. Thomas

The Bengal Legislative Council Proceedings—1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929

Amrita Bazar Patrika

Hindusthan Standard

আনন্দবাজার পত্রিকা

যুগান্তর

দৈনিক বসুমতী

জনসেবক

The Calcutta Municipal Gazette—July 7, 1962

॥ এই গ্রন্থরচনায় যাঁরা সাহায্য করেছেন ॥

১। ৺সুবোধচন্দ্র রায় (ডাঃ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)
২। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি
৩। শ্রীঅশোক সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ)
৪। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ
৫। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য, কলানবগ্রাম, বর্ধমান
৬। ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী
৭। শ্রীঅনিলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ী, বীরভূম
৯। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১০। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, ভারতবর্ষ
১১। ৺সজনীকান্ত দাস, সম্পাদক শনিবারের চিঠি
১২। শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর
১৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী
১৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক
১৫। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক
১৬। কুমুদশঙ্কর রায়, যক্ষ্মা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ
১৭। চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের কর্তৃপক্ষ
১৮। বেঙ্গল ইমিউনিটির কর্তৃপক্ষ
১৯। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ
২০। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ
২১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ
২২। ৺ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জি
২৩। শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য
২৪। শ্রীভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী
২৫। শ্রীআলোকনাথ চক্রবর্তী
২৬। শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
২৭। শ্রীমান সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৮। শ্রীকিশোরচন্দ্র সামন্ত